৩০ বর্ষ ৩-৭, ১০-১২ সংখ্যা
আষাঢ়-কার্তিক, মাঘ-চৈত্র ১৩৩০

হিন্দু-পত্রিকা।

সূচীপত্র—সন ১৩৩০ সাল।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩০শ বর্ষ, ৩০শ খণ্ড
৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩৩০ সাল।
১৮৪৫ শকাব্দাঃ

আমিত্বের প্রসার।

লেখক—স্বামী শ্রীদীনানন্দ (কাশীধাম)

আমাতে যে আমি, সকলি সে আমি,
সে সকল সকলি আমারি।
আমি নিরাকার, নিত্য নির্ব্বিকার,
আমার আমিত্বে জগত প্রচার।
আমি জনক হইয়া, জন্মাই সন্তান,
জননী হইয়া করি স্তন দান,
শিশুরূপে আমি করি স্তন পান,
এ সব নিমিত্ত কারণ আমারি।
কতরূপ আমি করেছি ধারণ,
কত রূপে করি ভবে আগমন,
এ সব রঙ্গ সাঙ্গ হইবে যখন
যাইব সেখানে, আমি যথাকারী।

আধার আধেয় আমি মূলাধারে,
স্থূল সূক্ষ্মরূপে বিদিত সংসারে।
রূপ রস গন্ধ আমি অনুবন্ধ
সৃষ্টি স্থিতি লয় আমাতে সবারি।
সৃষ্টি স্থিতি লয় বারে বারে হয়,
রবি শশী গ্রহ আসে পুনরায়,
সোঽহং কিন্তু আমি অচ্যুত অব্যয়,
চরমে তুরীয় আমি মাত্র সার।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

লোকলজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিয়া যাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে, হরে মুরারে, মধুকৈটভারে, বলিয়া তোমার নাম গান করেন, নৃত্য করেন, কখন বা হাস্য করেন, প্রভো! সেই তীর্থীভূত ভক্তের চরণরজঃ স্পর্শে পৃথিবী পূতা হন। জাহ্নবী-জলের মহিমা বর্ণন করিতে শাস্ত্রকারগণও অক্ষম, জাহ্নবীর তাদৃশ পবিত্রতা কিসে? তোমার চরণ-সম্ভূতা বলিয়াই জাহ্নবী স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রা। তোমার চরণ-স্পর্শে ভক্তহৃদয় তীর্থতুল্য। তোমার লীলাস্থলগুলি মহাতীর্থরূপে গণ্য। তোমার প্রাপ্তির এমনই মাহাত্ম্য যে, তোমার দর্শনমাত্রেই, আর সমস্ত কামনা পলায়ন করে। শারদ পূর্ণিমা শশীর উদয়ে খদ্যোৎগণ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আমি সদাই তোমায় চাই, কিন্তু কিসে পাই? কি সাধনবলে তোমায় হৃদয়কমলে বসাইব? তবে তুমি দীনবন্ধু, আমি দীনাতিদীন, আমার দুরবস্থা দেখে যদি রাজীব চরণতলে স্থান দাও তবেই আমি সার্থক জীবন মনে করিতে পারি। আমার সাধন সম্বল নাই, হৃদয়ে বল নাই, সতী মতি নাই, সুতরাং তোমায় পাবার কোনই আশা নাই। তবে আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি হৃষীকেশ, তুমি আমার মনঃ প্রাণে ইন্দ্রিয় মাঝারে প্রবল তৃষ্ণা, তীব্র বিরহ জন্মাইয়া দাও, যাহাতে তোমার প্রতি আমার মনোমর্কট ধাবিত হয়। এই

বাসনা যদি পূর্ণ কর নাথ! তবেই জানিব তুমি অন্তর্যামী কৃপাসিন্ধু। তন্ন তন্ন করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজে দেখেছি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা হৃদয়ে পুরিয়া দেখিয়াছি, কিছুতেই সুখ নাই, শান্তি নাই, বরং অপার দুঃখ আছে। অসারে আর মন উঠে না, তুমি সারাৎসার, তাই তোমাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া নয়ন-সলিলে চরণ ধৌত করিয়া শ্রদ্ধাচন্দনে ভক্তিকুসুমে তোমার অভয় চরণ যুগল সদাই পূজা করি, এই বাসনা তোমায় জানাইতেছি। যদি বাসনা পূর্ণ কর, তবে জানিব তুমি সত্যই দীন-বৎসল।

আমরা তোমায় কি দিতে পারি, আমার বলিতে জগতে কিছুই নাই। যাহা কিছু সবই তোমার। আমরা সর্ব্বস্ব তোমায় দিতে চাই, কিন্তু সর্ব্বস্বের মধ্যে আমার মনটাই তোমায় দিতে পারি, আর আমার কিছুই নাই। যখন মানুষ এই-রূপ ধারণা-সম্পন্ন হয়, তখন তাহার আদর্শ পূর্ণ প্রেমের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। উহা প্রেমজনিত পূর্ণ নির্ভীকতার আদর্শে পরিণত হয়। এইরূপ পুরুষের সর্ব্বোচ্চ আদর্শে কোনপ্রকার বিশেষস্বরূপ সঙ্কীর্ণতা থাকে না। উহা সার্ব্বভৌমিক প্রেম, অনন্ত ও অসীম প্রেম; প্রেম, প্রেমস্বরূপ বা পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রেমের আকার ধারণ করে! প্রেমধর্ম্মের এই মহান্ আদর্শকে তখন সর্ব্বপ্রকার অবলম্বন-নির-পেক্ষ হইয়া উপাসনা করা হয়। ইহাই উৎকৃষ্ট পরা ভক্তি—একটী সার্ব্বভৌমিক আদর্শকে আদর্শ বলিয়া উপাসনা করা। অন্য সকল প্রকার ভক্তি কেবল ঐ ভক্তিলাভের সোপান মাত্র। ভক্তিই ভগবদ্বশীকারিণী শক্তি, ঐ ভক্তির উদয়ে একটীর পর একটী সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। অবশেষে আমরা বুঝিতে পারি যে, বাহ্য বস্তুতে আদর্শকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা বৃথা। আদর্শের সহিত তুলনায় এই সকল বাহ্য বস্তু অতি তুচ্ছ। কালক্রমে সাধক, সর্ব্ব-সারভূত আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরেই জীবন্ত ও সত্যভাবে অনুভব করিবার সামর্থ্যলাভ করেন। যখন ভক্ত এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন ভগবানকে প্রমাণ করা যায় কিনা, ভগবান সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান কিনা, এই সকল প্রশ্ন তাঁর মনে উদয়ই হয় না। তাঁহার নিকট ভগবান প্রেমময়, তিনি প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। এবং এই ভাবই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি প্রেমরূপ বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ অন্য-প্রমাণ-নিরপেক্ষ। প্রেমিকের নিকট প্রেমময়ের অস্তিত্ব-প্রমাণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। অন্যান্য ধর্ম্মের বিচারক স্বরূপ ভগবান প্রমাণ করিতে অনেক প্রমাণের আবশ্যকতা হয় বটে, ভক্তের এইরূপ ভগবানে কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। তাঁহার নিকট ভগবান প্রেমরূপ পূর্ণস্বরূপে বিদ্যমান। কেহই পতিকে

পতির জন্য ভাল বাসে না, পতির অন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মার জন্যই লোকে পতিকে ভাল বাসে।

কেহ কেহ বলেন মানুষের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের মূল স্বার্থপরতা। উহাও প্রেম, তবে বিশিষ্টতাহেতু নিম্নভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। যখন আমি আমাকে সর্ব্বব্যাপী ভাবি, তখন নিশ্চয় আমাতে স্বার্থপরতা থাকিতে পারে না। কিন্তু, যখন আমি ভ্রমবশতঃ নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করি তখন আমার প্রেম সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ ভাব ধারণ করে। প্রেমের বিষয়কে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ মনে করাই আমাদের ভ্রম। এই জগতের সকল বস্তুই ভগবৎপ্রসূত সুতরাং প্রেমের যোগ্য। কিন্তু ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, সমষ্টিকে ভালবাসা বলিলে অংশকেও ভালবাসা বুঝায়। এই সমষ্টিই ভক্তের ভগবান। আর অন্যান্য প্রকারের ঈশ্বর, স্বর্গস্থ পিতা, শাস্তা, স্রষ্টা প্রভৃতি ভক্তের নিকট নিরর্থক, তাঁহার নিকট ইহার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। যখন অন্তর শুদ্ধ, পবিত্র এবং স্বর্গীয় প্রেমামৃতে পূর্ণ হয়—তখন অন্য সকল প্রকার ঈশ্বরভাব অনুপযুক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বাস্তবিক পরা ভক্তির প্রভাবই এইরূপ। তখন সেই উচ্চাবস্থাপন্ন ভক্ত, তাঁহার ভগবানকে মন্দিরাদিতে অন্বেষণ করিতে যান না। তিনি এমন স্থানই দেখিতে পান না, যেখানে তিনি নাই। তিনি তাঁহাকে মন্দিরের ভিতরে বাহিরে দেখিতে পান। তিনি তাঁহাকে সাধুর সাধুতায়, পাপীর পাপে, দেখিতে পান। ইহার কারণ, তিনিই পূর্ব্বে প্রেমজ্যোতিরূপে নিজ হৃদয়ে দেখিতে পাইয়াছেন। মানবীয় ভাষায় প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। খুব উচ্চ মানবকল্পনাও অনন্তপূর্ণতা ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে অক্ষম। তথাপি সর্ব্বদেশের উপাসকগণকে তাহাদের প্রেমের আদর্শ অনুভব করিতে ও উহার নামকরণ করিতে চিরকালই এই অনুপযোগী মানবীয় ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। মানব, ভাগবত বিষয়সমূহ নিজের মানবীয় ভাষাতেই প্রকাশ করিয়া থাকে। পূর্ণ কেবলমাত্র আমাদের আপেক্ষিক ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে। সমুদয় জগৎ আমাদের নিকট আর কি? অনন্ত যেন সান্ত ভাষায় লিখিত মাত্র। এই কারণে ভক্তেরা ভগবান ও তাঁহার প্রেমের উপাসনা বিষয়ে লৌকিক প্রেমের লৌকিক শব্দ সমূহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই কারণে এই পরা ভক্তি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর এই পাঁচ নামে আখ্যাত হইয়াছে।

যখন মানুষের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, যখন তাহার বুদ্ধি প্রেমোন্মত্ততায়

আত্মহারা হয় নাই, এই—বাহ্যক্রিয়াকলাপ বাহ্যভক্তি হইতে একটু উচ্চ, সাসাসিদে রকম একটু প্রেম উদয় হইয়াছে মাত্র, যখন উহা তীব্র বিকাশশীল প্রেমের উন্মত্ততালক্ষণে লক্ষিত নহে, তখন উহাকে শান্ত ভাব বলে। দেখিতে পাই জগতে কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা ধীরে ধীরে সাধন-পথে অগ্রসর হন। আর কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা ঝড়ের মত বেগে চলিয়া যান। শান্ত ভক্ত ধীর, শান্ত, নম্র। তদপেক্ষা একটু উচ্চ অবস্থা দাস্য। এ অবস্থায় মানুষ নিজকে ঈশ্বরের দাস মনে করে। বিশ্বস্ত ভৃত্যের প্রভুভক্তিই ইহার আদর্শ। তাহার পর সখ্য প্রেম, তুমি আমার প্রিয়বন্ধু। যেমন মানুষ আপনার বন্ধুর নিকট হৃদয় খোলে, জানে যে, বন্ধু তাহার দোষের জন্য তিরস্কার না করিয়া যাহাতে তাহার হিত হয় তাহার চেষ্টা করিবে। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যেমন একটা সমান সমান ভাব থাকে তদ্রূপ সাধক ও তাহার সখা-রূপ ভগবানের মধ্যে যেন এক রকম সমান সমান ভাব। সুতরাং ভগবান আমাদের হৃদয়ের অতি সন্নিহিত বন্ধু হইলেন। সেই বন্ধুর নিকট আমরা জীবনের সব কথা খুলিয়া বলিতে পারি। আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গুপ্ত ভাবসকল তাঁহার নিকট জানাইতে পারি। সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে, তিনি যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় তাহাই করিবেন। এই ভাবিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এই জাগতিক ব্যাপার সমস্তই তাঁর খেলা, আমরা তাঁহার খেলার সহায় মাত্র। তিনি আমাদের অনন্তকালের খেলার সঙ্গী। প্রতি অণুতে তিনি খেলা করিতেছেন, তিনি খেলা করিতে করিতে পৃথিবী সূর্য্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছেন। তিনি মনুষ্য-হৃদয়, প্রাণী উদ্ভিদ সমূহে ক্রীড়া করিতেছেন। আমরা তাঁহার সতরঞ্চ খেলার জিনিষ। তিনি সেই গুলিকে যেন একটী সতরঞ্চ খেলার ছকে বসাইয়া তাহাদিগকে চালিত করিতেছেন! তিনি প্রথমে একদিকে, পরে অপর দিকে সাজাইতেছেন, আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতভাবে তাঁহারই ক্রীড়ার সহায়ক। কি আনন্দ! আমরা তাঁহার ক্রীড়ার সহায়ক! তার পরের অবস্থাকে বাৎসল্য. প্রেম কহে। উহাতে ভগবানকে পিতা না ভাবিয়া সন্তান ভাবিতে হয়। এটী কিছু নূতন রকমের বোধ হইতে পারে। কিন্তু উহার উদ্দেশ্য আমাদের ভগবানের ধারণা হইতে ঐশ্বর্য্যের ভাবগুলি সব দূর করা! ঐশ্বর্য্য ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভয় আসে। কিন্তু ভালবাসায় ভয় থাকা উচিত নয়। চরিত্র গঠনের জন্য ভক্তি ও

আজ্ঞাবহতা আবশ্যক বটে, কিন্তু একবার চরিত্র গঠিত হইলে, যখন প্রেমিক শান্ত প্রেমের একটু আস্বাদ করেন, আবার প্রেমের তীব্র উন্মত্ততাও কিছু আস্বাদ করেন তখন তাঁহার আর নীতি শাস্ত্র, সাধন, নিয়ম, এ সকল গুলির কিছু মাত্র প্রয়োজন থাকে না। ভয়োৎপাদক ঐশ্বর্য্যভাব তাড়াইবার জন্য তিনি ভগবানকে সন্তানরূপে ভাল বাসেন।

মা বাপ ছেলের কাছে ভয় পায় না, ছেলের প্রতি তাঁদের ভক্তিও হয় না। ছেলের কাছে তাঁদের প্রার্থনা করিবারও কিছুই থাকে না। ছেলের সর্ব্বদা পাওনার দাবী। সন্তানের প্রতি ভালবাসার জন্য বাপ, মা শত শত বার শরীর ত্যাগে প্রস্তুত। তাঁহারা এক সন্তানের জন্য সহস্র জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত। এই ভাব হইতেই ভগবানকে বাৎসল্যভাবে ভালবাসা হয়। যে সকল সম্প্রদায় ভগবান অবতার হন বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে এই বাৎসল্য ভাবে উপাসনা স্বাভাবিক। মুসলমানদের পক্ষে ভগবানকে এই রূপে সন্তানভাবে ভাবা মহা কঠিন। তাঁহারা ভয়ে এ ভাব হইতে দূরে অবস্থান করেন। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান ও হিন্দু এ ভাব সহজেই বুঝিতে পারেন। কারণ, তাঁহাদের বালক যিশু ও বালক কৃষ্ণ রহিয়াছেন। মানুষে প্রেমের এ স্বর্গীয় আদর্শকে আর একরূপে প্রকাশ করিয়াছে। উহার নাম মধুর—উহাই সর্ব্বপ্রকার প্রেমের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। জগতের সর্ব্বোচ্চ প্রেমের উপর উহা স্থাপিত,আর মানবীয় প্রেমের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। স্ত্রী পুরুষের প্রেম যেরূপ মানুষের সমুদয় প্রকৃতিটাকে ওলট্ পালট্ করিয়া দেয়, আর কোন্ প্রেম সেরূপ করিতে পারে? কোন্ প্রেম লোকের প্রতি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলে? নিজের প্রকৃতি ভুলাইয়া দেয়? মানুষকে হয় দেবতা, নয় পশু করিয়া দেয়? এই মধুর প্রেমে ভগবানকে আমাদের পতিরূপে চিন্তা করা হয়। আমরা সকলে স্ত্রী। জগতে আর পুরুষ নাই। কেবল একমাত্র পুরুষ আছেন, তিনিই আমাদের সেই প্রেমাস্পদ একমাত্র পুরুষ। স্ত্রী পুরুষের অনির্ব্বচনীয় ভালবাসা ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। জগতে যত প্রকার প্রেম দেখিতে পাই, তাহার একমাত্র লক্ষ্যই ভগবান। তবে হতভাগ্য লোকে, যে অনন্ত সমুদ্রে মহান্ প্রেমের নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে জানে না, সুতরাং নির্ব্বোধের ন্যায় মানুষরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুলের প্রতি উহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। উহা নিশ্চিতই অশান্তি আনয়ন করিবে। সুতরাং আমাদের প্রেম পুরুষোত্তমের প্রতি প্রয়োগ

করিতেই হইবে; যাঁহার বিনাশ নাই, যাঁহার কখনও পরিবর্ত্তন নাই, যাঁহার প্রেমসমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা নাই। প্রেম যেন তাহার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছে, যেন উহা সেই প্রেমের অনন্ত সমুদ্রে পৌঁছে। সকল নদীই সমুদ্রে পৌঁছে। একটু জলবিন্দু পর্য্যন্ত পর্ব্বত গাত্র হইতে পতিত হইয়া কেবল একটী নদীতে থামিতে পারে না। অবশেষে সেই জলবিন্দু কোন না কোনরূপে সমুদ্রে প্রবেশ করে। ভগবান আমাদের সর্ব্বপ্রকার ভাবের একমাত্র লক্ষ্য। যদি রাগিতে চাও, ভগবানের প্রতি রাগ কর। ছোট ছোট সংসারের পুতুলে কি সুখ আছে? অনন্ত আনন্দের জমাট সারকেই আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে হইবে। ভগবানই সেই আনন্দের জমাট বাঁধা। আমাদের প্রবৃত্তি ভাবাদি সবই যেন তাঁহার সমীপে যায়। উহা তাঁহারই জন্য অভিপ্রেত। উহারা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে উহারা কুৎসিত ভাব ধারণ করিবে। যখন তাহারা তাহাদের ঠিক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছায়, তখন অতি নিম্নতম বৃত্তি পর্য্যন্ত অন্যরূপ ধারণ করে। মানুষের মন ও শরীরের সমুদয় শক্তি, তাহারা যে ভাবেই প্রকাশিত থাকুক না কেন, ভগবানই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, একায়ন। মনুষ্যহৃদয়ের সব ভালবাসা, সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকে যায়। তিনিই প্রেমের যোগ্য। এই মনুষ্যহৃদয় আর কাহাকে ভাল বাসিবে? তিনি পরম সুন্দর, পরম মহৎ সৌন্দর্য্যস্বরূপ, মহত্বস্বরূপ। তাঁহা অপেক্ষা জগতে আর সুন্দর কে আছে? তিনি ব্যতীত জগতে স্বামী হইবার আর উপযুক্ত কে? জগতে ভালবাসার উপযুক্ত আর কে আছেন? অতএব তিনিই যেন আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ হন্। অনেক সময় এমত ঘটে, যে, ভগবদ্ভক্তগণ এই ভগবৎ প্রেমের বিষয় বলিতে গিয়া সর্ব্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষা ব্যবহার করেন। মূর্খেরা ইহা বুঝে না, তাহারা কখনও ইহা বুঝিবে না। তাহারা উহা কেবল জড়দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্ততা বুঝিতে পারে না। কেমন করিয়া বুঝিবে? হে প্রিয়তম! তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন, যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, তাহার তোমার জন্য পিপাসা বর্দ্ধিত হয়। তাহার সব দুঃখ চলিয়া যায়। তিনি তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যান্। ভগবান যাহাকে একবার তাঁহার অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহারা সমুদয় প্রকৃতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহার পক্ষে জগৎ এক অনন্ত প্রেম-সমুদ্রে পরিণত হইয়া যায়। ইহাই প্রেমোন্মত্ততার চরমাবস্থা। প্রকৃত ভগবৎ প্রেমিক আবার ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। ভক্তেরা অবৈধ

পরকীয় প্রেমের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। কারণ, উহা অতিশয় প্রবল। উহার অবৈধতা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। এই প্রেমের প্রকৃতিই এই যে, যতই উহা বাধা পায়, ততই উহা উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা অবাধ, উহাতে কোনও বাধা বিঘ্ন নাই। সেই জন্যই ভক্তেরা কল্পনা করেন, যেন কোন বালিকা তাহার প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত, আর তাহার পিতামাতা বা স্বামী ঐ প্রেমের বিরোধী। যতই ঐ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয় ততই উহা প্রবল ভাব ধারণ করে। ঐশ্বরিক প্রেমের বিষয় বর্ণনা করিতে মানবীয় ভাষা প্রকৃত অনুপযুক্ত। আর যাহারা উহা সাধারণ নায়ক নায়িকার প্রেম মনে করেন, তাহারা বাতুল মাত্র। যাহা সুরজন-দুর্লভ, তাহা কিরূপে মানব কল্পনা করিবে? বিশ্ব প্রপঞ্চ যে প্রেম-সমুদ্রে মিলিতে প্রয়াসী, তুচ্ছ মানব-কল্পনা তাহার কি পরিচয় দিতে পারে? সামান্য নায়ক নায়িকার অনুরাগজাত প্রেম শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমের সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করাও মহা পাতক। যিনি জিত-মন্মথ, সর্ব্বথা পূর্ণ, তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে জগতে এমন কিছু নাই। তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তি জীবদেহে আনন্দানুভব করাইয়া থাকে। তিনি যেন আনন্দস্বরূপ, তাঁহাকে বাদ দিয়া আমরা পৃথকরূপে আর কিছুই ভাবিতে পারি না। অনুরাগময় চক্ষে যাহাই কিছু দেখি, সে সমুদয়ই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। আমরা ভালবাসিতে তাঁহাকেই ভাল বাসি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাকেই ভাল বাসি। তিনিই আমাদের প্রেমাস্পদ, একমাত্র ভালবাসার লক্ষ্য। নশ্বর পুতুলের প্রতি ভালবাসা অর্পণ করিয়াই আমরা অপার দুঃখপ্রাপ্ত হই। সে প্রেমে হাসি কান্না নাই, বিনিময় নাই, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। আমরা তাঁহাকে, সেই প্রেমময়কে দেখিতে চেষ্টা করি না তাই দেখিতে পাই না, যে ধরতে পারে সেই তাঁরে ধরে। অগাধ জলে ডুব না দিলে মুক্তা মিলে না। আমরা শুধু ভাসিয়া বেড়াই, তাই রত্ন পাই না। যত্ন করিলে রত্ন অবশ্যই মিলিবে, নচেৎ ভগবান মিথ্যা, তাঁর বাক্য মিথ্যা, সমস্তই মিথ্যা।

(ক্রমশঃ)



হিন্দু-শুদ্ধি-সভা।

লেখক—সম্পাদক।

সাধারণের সংস্কার এই যে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোককে হিন্দু সমাজভুক্ত করা যায় না। একথা সত্য যে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোককে বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা হয় না, কিন্তু একথা সত্য নহে যে আদৌ এরূপ করা যায় না, এবং কখনও এরূপ করা হইত না।

হিন্দু শব্দটী আধুনিক হইলেও হিন্দুধর্ম্ম আধুনিক নহে, আর্য্য শাস্ত্রোক্ত সনাতন ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। হিন্দু শব্দটী সিন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং সিন্ধু নদী এবং সিন্ধু-নদী-প্রদেশস্থ লোককে প্রাচীন পারসিকেরা 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করিয়া হিন্দু নামে অভিহিত করিতেন, এবং ঐ হিন্দু নাম কেবল যে পঞ্চনদ-দেশবাসী সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত তাহা নহে, উহা সমস্ত ভারতবাসী সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এইরূপে ভারতবাসী হিন্দু নাম পাইলেন এবং তাহার বাসস্থানের নাম হইল হিন্দুস্থান। প্রাচীন পারসিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ "ভেন্দিদাদে" (Vendidad) "হপ্ত হিন্দুর" (Hapta Hindu) নাম দৃষ্ট হয়। বেদে "সপ্তসিন্ধবঃ" নাম দৃষ্ট হয়। এই সপ্তসিন্ধু বা সপ্ত নদীর নাম—বিতস্তা (Jhelum), অশিক্নী (Chenub), পরুশ্নী (Irabati or Ravi), বিপাশা (Beas), শুতুদ্রী (Sutlej)। বেদের এই সপ্তসিন্ধুই পারসিক-দিগের হপ্ত হিন্দু।

এমন একদিন ছিল যখন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশ অর্থাৎ পঞ্জাব এবং আফগানিস্থান লইয়া প্রাচীন পারসিকদিগের সহিত এবং ভারতবাসীদিগের সহিত মধ্যে মধ্যে বিবাদ হইত। প্রাচীন আর্য্যদিগের প্রথম নিবাস যে এই উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

কোন কোন সময়ে পঞ্জাব প্রদেশ যে পারসিকদিগের হস্তগত হইত, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। প্রাচীন পারসিকেরা এই পঞ্জাব প্রদেশকে সমগ্র হিন্দুস্থান বলিয়া মনে করিতেন। এই প্রদেশটিই ভেন্দিদাদে বর্ণিত ১৬টী রাজ্যের অন্যতম একটী রাজ্য স্বরূপে "হপ্ত হিন্দু" নামে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু নামটী প্রাচীন আর্য্যদিগের নামান্তর মাত্র, এবং তাঁহাদের "সনাতন ধর্ম্ম"ই হিন্দু ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্ম যদি চ আর্য্যদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম তথাপি উহা হইতে তাঁহারা অন্য কাহাকেও কখনও বঞ্চিত করিতেন না। যে কোন ব্যক্তি এই ধর্ম্ম গ্রহণ

করিতে পারিতেন, এমন কি যবন বা গ্রীকেরা পর্য্যন্ত হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং তাহাতে সমাজে কোন বাধা ছিল না। শক, হূন, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি সকল জাতিই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে আসিতে পারিতেন।

অনার্য্য শব্দ দ্বারা আর্য্যেতর সমস্ত জাতিকেই বুঝায়। চীন প্রভৃতি জাতি অনার্য্য, কিন্তু অনার্য্য শব্দ দ্বারা কোন হীনতা সূচিত হয় না। শ্রেষ্ঠার্থে আর্য্যশব্দ প্রযুক্ত হইলে, অনার্য্য শব্দ দ্বারা হীনতা সূচিত হয়, নতুবা নহে। ভারতবর্ষের মধ্যে ও বাহিরে আর্য্য এবং অনার্য্য উভয় জাতিই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন। এই প্রথার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কুষাণ নামক শক জাতীয় রাজার নাম কুজুলকদফিশ। তাহার পুত্র ভীম কদফিশ, তাহার পুত্র কণিষ্ক, তাহার পুত্র হুবিষ্ক, তাহার পুত্রের নাম হইল বসুদেব। ইহারা সকলেই প্রথমে বৌদ্ধ ও তৎপরে হিন্দু ধর্ম্ম মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন। অনেক জাতি বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্য দিয়া হিন্দু ধর্ম্মে আসিয়াছিলেন, এবং অনেক জাতি একেবারেই হিন্দুধর্ম্মে আসিয়াছিলেন। মঙ্গোলীয় অহম্ রাজার নাম শুক্লেমুং, তাঁহার পুত্রের নাম সুরাং ফা, তাহার পুত্রের নাম সুতিং ফা, তাহার পুত্রের নাম হইল জয়ধ্বজ, তস্য পুত্র চক্রধ্বজ, তস্য পুত্র রামধ্বজ। অহিন্দু ক্রমে হিন্দু হইয়া গেল। অহম্‌দিগের রাজা যে কেবল হিন্দু হইলেন তাহা নহে, অহম্ জাতিই এইরূপ ক্রমে ক্রমে হিন্দু হইয়া গেল। উজ্জয়িনীর শক রাজা যজামোটিক, তাহার পুত্র চষ্টন, তাহার পুত্র জয়দমন, তাহার পুত্র রুদ্রদমন।

গ্রীকেরাও যে হিন্দু হইত তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। মিয়ান্দের (Meander) বৌদ্ধ হওয়ার কথা অনেকেই জানেন। নিম্নে হেলিওডোরের হিন্দু হওয়ার কথা বর্ণিত হইতেছে—গোয়ালিয়র রাজ্যে বোধনগরের প্রস্তর স্তম্ভের উপর ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে—

"দেব-দেবস্য বাসুদেবস্য গরুড়ধ্বজোঽয়মহংকারিতঃ ইহ হেলিদোরেণ ভাগবতেন দিয়ন পুত্রেণ তক্ষশিলাকেণ যোনদূতেন আগতেন মহারাজস্য অন্তলিকিতস্য উপেত্য সকাশম্, রাজ্ঞ কাশীপুত্রস্য ভাগভদ্রস্য"—অর্থাৎ মহারাজ আন্তিআলকিদের (Ante Alcidas) নিকট হইতে রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের সকাশে আগত যবনদূত দিয়ন (Dion)-পুত্র হেলিওডোর (Heliödoor) যিনি তক্ষশীলাবাসী, ও ভাগবত অর্থাৎ বিষ্ণুপাসক—এখানে এই গরুড়ধ্বজ দেবদেব বাসুদেবের উদ্দেশ্যে স্থাপিত করিলেন। তখন যবন (গ্রীক)ও হিন্দু হইতে পারিত, বিষ্ণুপূজা করিত, ভাগবত উপাধি লইত। হিন্দু শাস্ত্রমতে সমস্ত মানবই মনুর

পুত্র। যাহারা ভারতের বাহিরে তাহারাও ঐ মনুর পুত্র। শাস্ত্রানুসারে সকলেই পূর্ব্বে এক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং পরে কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন।

সনাতন ধর্ম্মের কেহ কোন প্রবর্ত্তক নাই, এ ধর্ম্ম চিরকালই আছে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের এক একজন প্রবর্ত্তক আছেন যথা—মোসেস্ বা মুসা, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি। অন্য ধর্ম্মের লোকের হিন্দু ধর্ম্মে আসিবার বিরুদ্ধে শাস্ত্রে কোন বাধা নাই। পূর্ব্বে হিন্দুরা অন্য ধর্ম্মের লোককে স্বধর্ম্মে গ্রহণ করিতেন, এখন করিবেন কিনা তাহা তাঁহাদের চিন্তার বিষয়।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের শাখা মাত্র এবং ভগবান বুদ্ধ তাঁহার জীবনকালে এই ধর্ম্মের বহুল প্রচারে চেষ্টা পাইয়াছেন; মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে এই ধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

১৯০৭ সালে জার্ম্মাণ অধ্যাপক হিউগো উইনক্লার (Hugo Winckler) উত্তর পূর্ব্ব এসিয়া মাইনর প্রদেশে বোঘজকইতে (Boghoz koi) যে শিলালিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে সূর্য্যবংশের রাজারা রাজত্ব করিতেন। এই দেশে কুশবংশের রাজারা রাজত্ব করিতেন এবং তাহাদিগকে কাশবংশীয় বলা হইত। কাশ ও কুশ এক কথা। ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদিগের নামও ঐ দেশে অবিকৃতভাবে প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান প্রভৃতি দেশও ভারতবর্ষের অন্তর্গত ও হিন্দুদিগের বাসস্থান ছিল।

মুসলমানদিগের এক সম্প্রদায়ের নাম পাঠান। পাঠান শব্দটী "প্রাকৃতান্" শব্দ হইতে উৎপন্ন, প্রাকৃতান শব্দের অর্থ যাহাদের ভাষা প্রাকৃত। "প্রাকৃতান্" হইতে পাক্তান এবং পাক্তান হইতে পাঠান শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

বাহ্লীক (Balkh, Bactria) প্রদেশেও হিন্দুধর্ম্ম ছিল। মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল বাহ্লীকরাজ দরদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। যখন সেকেন্দর বাদ্‌শা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য বাহ্লীক প্রদেশে আসেন, তখনও বাহ্লীক প্রদেশে জোরেষ্টার ধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত হইলেও হিন্দুধর্ম্ম ছিল। প্রাচীন পারসিকরাও সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

পৌরাণিক দেবাসুর-সংগ্রামের বৃত্তান্ত দ্বারা ইরানীয় বা পারসিক জাতির সহিত হিন্দুদিগের সাম্প্রদায়িক বিবাদ সূচিত হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়রাও সনাতন-ধর্ম্মভুক্ত ছিলেন। ইহার বহুল প্রমাণ আছে।

নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজ বিদেশীয়দিগকে নিজের অঙ্গ করিয়া লইতে পারিত, কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় ভারতে উপস্থিত হইলে হিন্দু সমাজ তাহাকে নিজ সমাজভুক্ত করিতে পারিল না, পরন্তু বহু হিন্দু ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এই সম্বন্ধে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন—

The permanent establishment of Muhammadan Governments at Delhi and many other cities, combined with the steady growth of a settled resident Muslim population forming a ruling class in the midst of a vastly more numerous Hindu population, necessarily produced immense changes in India. The Muhammadan element increased continually in three ways, namely, by immigration from beyond the north-western frontier, by conversions, whether forcible or purchased and by birth. In modern times statistics prove that Muhammadans in India tend to multiply more rapidly than Hindus, and the same ratio probably held good in the days of the Sultanate. We do not possess any statistics concerning the growth of the Muhammadan population in any of the three ways mentioned. but we know that it occurred in all the ways, It was impossible that the presence of a strange element so large should not bring about the important modification of Indian life.

The Muhammadans were not absorbed into the Indian caste system of Hinduism as their foreign predecessors, the Sakas. Huns, and others had been absorbed in the course of a generation or two, The definiteness of the religion of Islam, founded on a written revelation of known date, preserved its votaries from the fate which befell the adherents of Shammanism and other vague religions of Central Asia. When the Sakas, Huns & the rest of the early immigrants settled in India & married Hindu women they merged in the Hindu caste system with extra-ordinary rapidity, chiefly because they possessed no religion sufficiently definite to protect them against the power of Brahmans. The Muslim with his Koran & his prophet was in a different position. He believed in his intelligible religion with all his heart, maintained against all comers the noble droctrine of the unity of God, and heartily despised the worshippers of many gods, with their idols & ceremonies. But in course of time, the barrier was partially broken down. One cause which promoted a certain degree of intercourse was the necessity of continuing the employment of unconverted Hindus in clerkships and a host of minor official posts which the Musalmans could not fill themselves. Another was the large number of conversions effected either by fear of the sword or by

purchase. The Hindus, thus nominally converted, retained most of their old habits and connections. Even now their descendants are often half-Hindu in their mode of life.

অপর ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার করা কিংবা অপর ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে স্বধর্ম্মে বলপুর্ব্বক আনয়ন করা মুসলমান শাস্ত্রের অভিপ্রেত না হইলেও এরূপ কার্য্য যে বহুল পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। খৃষ্টীয় ৯৮৬-৮৭ সালে গজনীর আমীর সবক্তগীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই হইল যবন রাজ্যের সূত্রপাত। এই সময় পঞ্জাবের রাজধানী ছিল ভাটিণ্ডা যাহা এখন পাটিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত। রাজা ছিলেন জয়পাল। গজনীর আমীরের ভারতবর্ষ আক্রমণের দুই বৎসর পরে প্রতিশোধ লইবার জন্য জয়পাল আমীরের রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সিন্ধু নদীর পশ্চিম পারে চারিটী দুর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন এবং বহু হস্তী উপহার দিয়া আমিরের সহিত সন্ধি করেন। জয়পাল সন্ধিভঙ্গ করিয়া পুনর্ব্বার আমীরের রাজ্য আক্রমণ করিলে পুনর্ব্বার পরাভূত হন এবং জালালাবাদ জেলা আমীরকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন!

জয়পালের এই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্যের ফল হইতে এখনও ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ধর্ম্ম অধর্ম্মের ফল এক জীবনে সব সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বহু পুরুষ পুরুষানুক্রমে ঐ ফলভোগ করিতে হয়। ভগবান্ মনু বলেন

"যদি নাত্মনি পুত্রেষু নচেৎপুত্রেষু নপ্তৃষু।
ন ত্বেব তু কৃতোঽধর্ম্মঃ কর্ত্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ।"

আমীর যে কোন অধর্ম্মের কার্য্য করেন নাই এমন কথা আমি বলিতে চাহি না, কিন্তু অন্যে অধর্ম্ম করিলে যে আমাকেও অধর্ম্ম করিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই।

এই সময়ে ভারতে কোন চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ ছিলেন না। বিভিন্ন প্রদেশে সেই সেই প্রদেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন। মুসলমান আক্রমণের ভয়ে জয়পাল কান্যকুব্জ প্রভৃতি রাজার সহিত সম্মিলিত হইয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু কুর্ম্ম বা করম উপত্যকার (Karam Valley) যুদ্ধে পরাভূত হন এবং পেশোয়ার প্রদেশ মুসলমান রাজ্যভুক্ত হয়।

সবক্তগীনের পুত্র সুলতান মামুদের ইতিবৃত্ত সকলেই জানেন। এবং তিনি যেরূপ ভারতের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার অধীনস্থ ঐতিহাসিক আলবরুণী বলেন:—

Another circumstance which increased the already existing antagonism between Hindus & foreigners is that the so-called Shamaniyya (Budhists), though they cordially hate the Bramhans, still are nearer akin to them than to others. In former times, Khurasan, Persia, Irak, Mosul, the country up to the frontier of Syria, was Buddhistic, but then Zorothustra went forth from Adharabaijan & preached Magism in Balkh (Baktrea) His doctrine came into favour with King Gushtasp, and his son Isfendiyad spread the new faith both in east & west, both by force and by treaties. He founded fire temples through his whole empire, from the frontiers of China to those of the Greek Empire. The succeeding Kings made their religion (i, e, Zoroastrianism) the obligatory state religion for Persia and Irak. In consequence the Budhists were banished from these countries, and had to emigrate to the countries east of Balkh. There are some Magians up to the present time in India, where they are called "Maga." From that time dates their aversion towards the countries of Khurasan. But then came Islam; the Persian empire perished, and the repugnance of the Hindus against foreigners increased more and more when the Muslims began to make their inroads into their country, for Muhammad Ibn Elkasim Ibn Elmunalbih entered Sindh from the side of Sijistan (Sakastene) and conquered the cities of Bahmaniva and Mulosthana, the former of which he called Almandura, the latter Al-mamura. He entered India proper and penetrated even as far as Kanauj, marched through the country of Gandhara and on his way back through the confines of Kashmir, sometimes fighting sword in hand, sometimes gaining his ends by treaties, leaving to the people their ancient belief, except in the case of those who wanted to become Muslims. All these events planted a deeply rooted hatred in their hearts,

Now in the following times no Muslim conqueror passed beyond the frontier of Kabul and the river Sindh until the days of Turks, when they seized the power in Ghazna under the Samani dynasty and the supreme power fell to the lot of Nasir-ad-doula Sabuktagin, This prince chose the holy war as his calling and therefore called himself Al-ghazi (I. e. warring on the road of Allah). In the interest of his successors he constructed, in order to weaken the Indian frontier, those roads on which afterwards his son Yamin Ad-doula Mahmud marched into India during a period of thirty years and more. God be merciful to both father and son! Mahmud utterly ruined the prosperity of the country and performed there wonderful

exploits, by which the Hindus became like atoms of dust scattered in all directions, and like a tale of old in the mouth of the people. Their scattered remains cherish, of course, the most inveterate aversion towards all Muslims. This is the reason, too, why Hindu sciences have retired far away from those parts of the country conquered by us, and have fled to places where our hand can not yet reach, to Kashmir, Benares, & other places. And there the antagonism between them and all foreigners receives more and more nourishment both from political and religious sources.

এই সময়েই ভারতবর্ষের যে কারণেই হউক, যে অধঃপতন হইতেছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। আলবরুণী নিজে হিন্দু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং হিন্দু সভ্যতার পর তাঁর যথেষ্ট ভক্তি ছিল কিন্তু তিনিও তৎকালীন হিন্দুদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন :—

In the fifth place there are other causes, the mentioning of which sounds like a satire—peculiarities of their national character deeply rooted in them, but manifest to every body. We can only say, folly is an illness for which there is no medicine and the Hindus believe that there is no country like theirs, no religion like theirs, no Science like theirs. They are haughty, foolishly vain, self-concieted and stolid. They are by nature niggardly in communicating that which they know and they take the greatest possible care to withhold it from men of another caste among their own people, still such more, of course, from any foreigner. According to their belief, there is no other country on earth but theirs, no other race of man but theirs and no created being besides them have any knowledge or science whatsoever. Their haughtiness is such that. if you tell them of any Science or scholar in Khurasan or Persia, they will think you to be both an ignoramus and a liar. If they travelled and mixed with other nations, they would soon change their mind, for their ancestors were not as narrow-minded as the present generation is. One of their scholars, Varahamihira, in passage where he calls on the people to honour the Brahamans says, "The Greeks, though impure, must be honoured, since they were trained in Sciences, and therein excelled others; what, then, are we to say of a Brahaman, if he combines with his purity, the height of his Science." In former times the Hindus used to acknowledge that the progress of Science due to the Greeks is much more important than that which is due to themselves. But from the passage of Varaha-Mihir alone

you see what a self-lauding man he is, whilst he gives himself airs as doing justice to others.

সুলতান মামুদ সপ্তদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সহস্র সহস্র লোককে হত্যা করেন, ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন, সহস্র সহস্র হিন্দুদিগকে ক্রীতদাস করিয়া মুসলমান করেন। কোন যুদ্ধেই হিন্দুরা তাহাকে পরাভূত করিতে পারে না। ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পেশোয়ারের নিকটে জয়পালকে পরাভূত করেন এবং তাঁহাকে সপরিবারে বন্দী করিয়া লইয়া যান। জয়পাল অধীনতা স্বীকার করিয়া মুক্তিলাভ করেন বটে, কিন্তু তিনি মুক্তিলাভ করিয়াই আত্মহত্যা করেন। তাঁহার পুত্র আনন্দ পাল উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কান্যকুব্জ, দিল্লী ও আজমীরের রাজাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া মুসলমানদিগের সহিত সংগ্রাম করেন কিন্তু পরাভূত হন। যখন জয় হিন্দুদিগের করতলস্থ-প্রায়, তখন কোন কারণে উত্তেজিত হইয়া আনন্দ পালের বাহন হস্তীটী আনন্দ পালকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করে। তাঁহাকে পলায়নপর দেখিয়া হিন্দু সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয় এবং সহস্র সহস্র পলায়নকারী হিন্দু সৈন্য মুসলমানদিগের দ্বারা নিহত হয়। কাঙ্গড়া, মথুরা, কান্যকুব্জ, সোমনাথ প্রভৃতি সমস্তই মুসলমান হস্তে বিধ্বস্ত হয়, বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, ভারতের ধন রত্ন সমস্তই লুণ্ঠিত হয়। বরণ বা বুলোন্দ সহরের রাজা হর দত্ত ও দশ হাজার হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। মথুরায় যে সর্ব্বপ্রধান মন্দির ছিল তাহা প্রস্তুত করিতে সুলতান মামুদের মতেও ২০০ বৎসর লাগে। এই মন্দিরও তিনি অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ১০ হাত উচ্চ এরূপ ৫টী স্বর্ণ বিগ্রহ ছিল এবং বহু মূল্যবান রত্নাদির দ্বারা উহার এক একটী চক্ষু নির্ম্মিত ছিল। সোমনাথ মন্দির আক্রমণের সময় পঞ্চাশ হাজার লোক হত হয়। সুলতানের সৈন্য সংখ্যা ৩০০০০ হাজারের অধিক ছিল না, কিন্তু এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়াই তিনি লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল তাহা ইহার দ্বারাই বুঝা যায়। বহু-সংখ্যক হিন্দু অল্প-সংখ্যক মুসলমানের নিকট কেন পরাভূত হয় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন—

The Mahammadan invaders undoubtedly were superior to their Hindu opponents in fighting power and so long as they remained uncorrupted by wealth and luxury, were practically invincible. The explanation of their success, already briefly discussed in relation

to the earliest campaigns, is not far to seek. The men came from a cool climate in hilly regions, and were for the most part heavier and physically stronger than their opponents. Their flesh diet as compared with the vegetarian habits prevalent in India, combined with their freedom from the restrictions of caste rules concerning food, tended to develop the kind of energy required by an invading force. Their fierce fanaticism which regarded the destruction of millions of non-muslims as a service eminently pleasing to God, made them absolutely pitiless and consequently far more terrifying than the ordinary enemies met in India. While they employed every kind of frightfulness to terrify the Indians, they were themselves ordinarily saved from fear by their deep conviction that a Gazi—a slayer of an infidel—if he should happen to be killed himself, went straight to all the joys of an easily intelligible paradise, winning at the same time uudying fame as a martyr. The courage of the invaders was further stimulated by their conciousness that no retreat was open to them. They must either subdue utterly by sheer force the millions confronting their thousands or be completely destroyed. No middle course is available. The enormous wealth in gold, silver and jewels, not to mention more commonplace valuables, accumulated in the temples, places and towns of India fired their imagination and offered the most splendid conceivable rewards for valour. The Hindu strategy and tactics were old fashioned, based on ancient text books, which took no account of foreign methods ; the unity of command on the Indian side was always more or less hampered by tribal, sectarian and caste divisions. Each horde of the foreigners on the contrary, obeyed a single leader in the field, and the commanders knew how to make use of shock tactics, that is to say, well directed cavalry charges, which rarely failed to scatter the Hindu hosts. Elephants, on which Hindu tradition placed excessive reliance, proved to be useless or worse than useless, when pitted against well equipped, active cavalry. The Hindu cavalry does not seem to have attained a high standard of efficiency in most parts of the country.

Thus it happened that the Muslims, although insignificant in numbers when compared with the vast Indian population usually secured easy victories, and were able to keep in subjection for centuries enormous multitudes of Hindus.

সুলতান মহম্মদ ঘোরী সুলতান মামুদের বংশ পরাভূত করেন এবং পঞ্জাব দখল করিয়া ভারতের পূর্ব্বাংশ আক্রমণ করেন। তৎকালীন

হিন্দু রাজারা পুনর্ব্বার সম্মিলিত হন এবং তাহাদিগের সহিত ঘোরীর এক যুদ্ধ হয় ; এই সময় হিন্দুদিগের নেতা হইয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজ। থানেশ্বর এবং কর্ণালের মধ্যবর্ত্তী তরাইন নামক স্থানে এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী পরাভূত হন, এবং নিজেও অত্যন্ত আহত হন। হিন্দুরা কিন্তু তাঁহাকে বন্দী না করিয়া মুক্তি দান করেন এবং বিজিত সৈন্য ধ্বংস না করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিয়াছিলেন। এই অদূরদর্শিতার জন্য পরবর্ষে অর্থাৎ ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে ঘোরী দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে হিন্দুদিগের পরাভব হয়, পৃথ্বীরাজ ধৃত হন এবং তাহাকে হত্যা করা হয়। ভিনসেণ্ট স্মিথ এই সম্বন্ধে বলেন :—

In the following year the Sultan returned, met the Hindu confederates on the same ground, and in his turn defeated them utterly (1192, A H, 588). Rai Prithiraj, when his cumbrous host had been broken by the onset of ten thousand mountain archers, fled from the field, but was captured and killed. His brother fell in the battle. Raja Jai chand of Kanouj fell in another fight. Ajmeer, with much other territory, was at once occupied by the victor. In fact, the second battle of Tarain in 1192 may be regarded as the decisive contest which ensured the ultimate success of the Muhammadan attack on Hindustan. All the numerous subsequent victories were merely consequences of the overwhelming defeat of the Hindu league on the historic plain to the North of Delhi.

এই যুদ্ধের পর ঘোরী ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন বটে কিন্তু কুতুবুদ্দিনের হস্তে রাজভার রাখেন এবং কুতুবের সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গ বিহার দুই প্রদেশ জয় করেন। তিনি ২০০ সৈন্য লইয়া বিহারের দুর্গ অধিকার করেন, হিন্দু, বৌদ্ধ কেহই আক্রমণকারীর হস্তে নিস্তার পান নাই, মন্দির, পুস্তকালয় প্রভৃতি সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মণ সেনের কথা আর কিছু বলিব না। এই যে মুসলমান রাজ্য বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত একরূপই ছিল। বুন্দেলখণ্ড জয় করিবার পর জেতার স্বীয় ঐতিহাসিক যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

"The temples were converted into mosques and abodes of goodness, and the ejaculations of the bead-counters (worshippers using rosaries) and the voices of the summoners to prayer ascended to the highest heaven and the very name of idolatry was annihilated. Fifty thousand men came under the

collar of slavery and the plane became black as pitch with Hindus.

মাঝে মাঝে দুই একজন মুসলমান রাজা ব্যতীত আর সকলেই হিন্দুদিগের উপর খড়গহস্ত ছিলেন। দাসবংশীয় বুলবনের একটী বৃত্তান্ত দেওয়া গেল।

By royal command many of the rebels were cast under the feet of elephants and the fierce Turks cut the bodies of the Hindus in two. About a hundred met their death at the hands of the flayers, being skinned from head to foot. Their skins were hung over every gate of the city. The plain of Hauz-Rani & the gates of Delhi remembered no punishment like this, not had one ever heard such a tale of horror.

আলাউদ্দিন খিলিজী হিন্দুদিগের সহিত যে ব্যবহার করিতেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Alauddin's policy in relation to the Hindus, the bulk of his subjects, was not peculiar to himself being practised by many of the earlier Mahammadan rulers. But it was defined by him with unusual precision without any regard to the rules laid down by ecclecias-tical lawyers. Ziauddin states the Sultan's principles in the clearest possible language.

He required his advisers to draw up rules and regulations for grinding down the Hindus, and for depriving them of that wealth and property which fosters disaffection and rebellion. The cultivated land was directed to be all measured and the Government took half of the gross produce instead of one-sixth as provided by immemorial rule. Akbar ventured to claim one-third, which was exhorbitant, but Alauddin's demand of one-half was monstrous. "No Hindu can hold up his head and in their houses no sign of gold or silver……or any superfluity was to be seen. These things, which nourish insubordination and rebellion, were no longer to be found. Blows, confinement in the stocks, imprisonment and chains, were all employed to enforce payment." Replying to a learned lawyer whom he had consulted, the Sultan said :—

Oh, doctor, thou art a learned man, but thou hast no experience ; I am an unlettered man, but I have seen a great deal ; he assured then that the Hindus will never become submissive and obedient till they are reduced to poverty, I have therefore, given orders that just sufficient shall be left to them from year to year, of corn, milk

and [curds, but that they shall not be allowed to accumulate hoards and property.

ফিরোজ তোগলক কয়েকটী হিন্দুমন্দির নির্ম্মাণের কথা শুনিয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

"Under divine guidānce I destroyed these edifices & I killed these leaders of infidelity who seduced others into terror and the lower orders I subjected to stripes & chastisement. until this abuse was entirely abolished.

কোন গ্রামে ধর্ম্মোৎসব হইতেছিল, সেস্থানে যাইয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও নিম্নে দেওয়া গেল "I ordered that the leaders of these people & the promoters of this abomination should be put to death. I forbade the infliction of any severe punisment on the Hindus in general, but I destroyed their idol temples & instead thereof raised mosques.

কিরূপ করিয়া তিনি হিন্দুদিগকে মুসলমান করিতেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

I encouraged my infidel subjects to embrace the religion of the Prophet, and I proclaimed that everyone who repeated the creed and became a Musalman, should be exempt from the Jiziya or poll-tax. Information of this came to the ears of the people at large, and great numbers of Hindus presented themselves and were admitted to the honour of Islam. Thus they came forward day by day from every quarter, and adopting the faith, were exonerated from the Jiziya, and were favoured with presents and honours.

তোগলকের ন্যায় অন্যান্য মুসলমান রাজাও হিন্দুদিগকে মুসলমান করিতেন। সেকেন্দর লোদীও অনেক হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়াছেন। দক্ষিণাত্যের বাহামণী বংশের আহম্মদ শা বিজয়নগর আক্রমণকালে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

Ahmad Shah, without waiting to besiege the Hindu capital over-ran the open country; and where-ever he went, put death to men, women and children without mercy, contrary to the compact made by his uncle and predecessor, Muhammad Shah and the Raja of Vijaynagar, Whenever

the number of slain amounted to 20,000, he halted three days, and made a festival in celebration of the bloody event. He broke down also the idolatrous temples and destroyed the colleges of the Brahmans.

ঐ বংশের তৃতীয় মহম্মদ শা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

The King, Firista relates, "having gone to view the fort, broke down an idolatrous temple and killed some Brahmans who officiated at it, with his own hands, as a point of religion. He then gave orders for a mosque to be created on the foundations of the temple, and ascending the pulpit repeated a few prayers, distributed alms and commanded the khutba to be read in his name. Khaja Muhammad Gawan now represented that as his Majesty had slain some infidels with his own hand, he might fairly assume the title of Ghazi, an appellation of which he was very proud. Mahammad Shah was the first of his race who had slain a Brahaman; and it was the belief of the Deccanees that this act was inauspicious and led to the troubles which soon after perplexed the affairs of himself and his family, and ended in the dissolution of the Dynasty."

কাঞ্চি মন্দির তিনি কিরূপভাবে ধ্বংস করিয়াছিলেন তাহা ফেরিস্তা নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

On his (Muhammad Shah's) arrival at Kondapalli (Condapilley) he was informed by the country people that at the distance of ten days' journey was the temple of Kanchi, the walls and roof of which were covered with plates of gold and ornamented with precious stones, but that no Mahummadan monarch had as yet seen or even heard of its name, Muhammad Shah accordingly selected 6000 of his best cavalry and leaving the rest of his army at Kondapalli, proceeded by forced marches to Kanchi. He moved so rapidly on the last day, according to the historians of the time, that only forty troopers kept up with him, among which number were Nizamal Mulk Bahri and Yurish Khan Turk. On approaching the temple, some Hindus came forth, one of whom, a man of gigantic stature, mounted on horseback and brandishing a drawn sabre by way of defiance, rushed full speed at the king and aimed a blow which the latter parried and with one stroke of his sword cleaved him in twain. Another infidel then attacked the king whose little band was shortly engaged man to man with enemy but Mahammad Shah had again the good fortune to slay his opponent upon which the rest of the Hindus retired into the temple. Swarms of people, like bees, now issued from within and ranged themselves

under its walls to defend it. At length the rest of the king's force coming up, the temple was attacked and carried by storm with great slaughter. An immense booty fell to the share of the victors, who took away nothing but gold, jewels, and silver which were abundant. The king then (March 12 ; 1481) sacked the city of Kanchi and after remaining there for a week, he returned to his army,

আউরংজেব সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য। হিন্দুদিগের দুর্দ্দশা দেখুন।

In 1669, when he had been firmly seated on the throne for some ten years and Raja Tai Singh was dead, he felt himself at liberty to act on his theory of Government more thoroughly than he had been able to do at first. We are informed by a credible author that on April 18, 1669, the emperor was shocked by the receipt of reports that in the province of Thathat, Multan and Benares, but more especially in the last named, Brahmans dared to give public lectures on their scriptures which even attracted Muhammadan students from distant places. Such open propaganda of Hindu idolatry seemed to Aurangzeb a scandal. Accordingly commands were issued :—

"To all the governors of provinces to destroy with a willing hand the schools and temples of the infidels ; and they were strictly enjoined to put an entire stop to the teaching and practice of idolatrous forms of worship."

Five months later the local officers reported that in accordance with the imperial command the temple of Bishwanath at Benares had been destroyed.

After a short interval Aurangzeb had the satisfaction of learning that the magnificent temple of Kesava Deva at Mathura had been levelled with the ground. It was one of the noblest buildings in India and had been crected in the reign of Jahangir by Raja Bir singh Bandela, the murderer of Abul. Fazl, at a cost of 33 lakhs of Rupees, The foundation of a large and costly mosque was laid on the site.

"Glory be to God" exclaims the historian "who had given us the faith of Islam, that in the reign of the destroyer of false gods, an undertaking so difficult of accomplishment has been brought to a successful termination. The vigorous support given to the true faith was a severe blow to the arrogance of the Rajas and like idols they turned their faces awe-struck to the wall. The richly-jewelled idols taken from the pagan temples were transferred to Agra and there placed beneath the steps leading to the Nawab Begum Sahib's mosque,

in order that they might be pressed under foot by the true believers. Mathura changed its name into Islamabad and was thus called in all official documents, as well as by the people."

আরংজীবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐ সময় হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে যে প্রতিবাদ করা হইয়াছিল, তাহা সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক ; উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

A nobly-worded protest. too large to quote in full, but deserving of commemoration by extracts, was sent to the Emperor about this time.

The writer having recited the tolerant conduct of Akbar, Jahangir, and Shahjahan proceeds :—

Such were the benevolent intentions of your ancestors. Whilst they pursued these great & generous principles, wheresoever they directed their steps, conquest and prosperity went before them ; and then they reduced many countries and fortresses to their obedience. During your majesty's reign, many have been alienated from the Empire, and further loss of territory must necessarily follow, since devastation and rapine now universally prevail without restraint. Your subjects are trampled under foot, and every province of your empire is impoverished, depopulation spreads, & difficulties accumulate. If your majesty places any faith in those books by distinction called divine, you will there be instructed that God is the God of all mankind, not the God of Muhammadan alone. The Pagan & Musalman are equal in his presence. Distinctions of colour are of his ordination. It is he who gives existence. In your temples, to His name the voice is raised in prayer ; in a house of images, when the bell is shaken, still He is the object of adoration. To vilify the religion or customs of other men is to set at naught the pleasure of the Almighty. When we deface a picture we naturally incur the resentment of the painter ; and justly has the poet said "Presume not to arraign or scrutinize the various works of power divine."

In fine, the tribute you demand from the Hindus is repugnant to justice ; it is equally foreign from good policy, as it must impoverish the country ; moreover it is an innovation and infringement of the lords of Hindustan.

ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন—১৬৭৯ সালে যোধপুর হইতে অনেক গাড়ী বিগ্রহ আনা হয় এবং তাহাদিগকে অপমানিত করা হয়। এক বৎসর মধ্যে উদয়পুরে ১২৩টী এবং চিতোরে ৬৩টী, জয়পুরে ৬৬টী, মোট ২৫২টী মন্দির ধ্বংস করা হয়।

যাহারা হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতেন না কিংবা বলপূর্ব্বক হিন্দুদিগকে মুসলমান ধর্ম্মভুক্ত করিতেন না কিংবা তাহাদিগের মন্দির ধ্বংস করিতেন না এরূপ মুসলমান রাজা যে ছিলেন না এমন নহে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব অল্প।

যদি কেহ মনে করেন যে শুদ্ধি-সভার কথা বলিতে গিয়া এত কথা বলিবার কি প্রয়োজন আছে, তদুত্তরে বলিতে চাই যে মুসলমান বা অন্য সম্প্রদায় হইতে হিন্দু সম্প্রদায় পুষ্ট তো হয়ই নাই পরন্তু হিন্দু সম্প্রদায় হইতে লক্ষ লক্ষ লোক কেহ বা স্বইচ্ছায়, কেহ বা কৌশলে, কেহ বা বলদ্বারা, কেহ বা লোভে, কেহ বা ভয়ে, কেহ বা স্বার্থের জন্য অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম্ম-বিশ্বাসে যে কেহ অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, এরূপ কথা বলিতে চাই না, কিন্তু এরূপ বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা খুব অল্পই থাকা সম্ভব।

যে যাহা ভাল বুঝে তাহা প্রচার করিয়া স্বমতে অন্যকে আনয়ন করার কোন বাধা নাই। কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও এক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার কোন বাধা নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বীয় রুচি অনুসারে যে কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকার আছে।

সুতরাং একজন মুসলমান কিংবা খ্রীষ্টান প্রচারক তাঁহার স্বীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া যদি অন্য কাহাকেও তাঁহার নিজ ধর্ম্মে আনয়ন করেন তাহাতে কোন বাধা নাই। এবং যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন।

ঐরূপ কোন হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক খ্রীষ্টানই হউক কিংবা মুসলমানই হউক, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন করিতে যদি চেষ্টা করেন তাহাতে কোন বাধা হইতে পারে না, কিংবা কোন খ্রীষ্টান বা মুসলমান স্বীয় ইচ্ছানুসারে যদি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। ইহাতে খ্রীষ্টান বা মুসলমান সমাজেরও আপত্তি হইবার কোন কারণ নাই। গুরুকুল-প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আগরা প্রদেশস্থ মালকানা রাজপুতদিগকে (যাহারা পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল,) পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন করিতেছেন দেখিয়া, কোন কোন মুসলমান নেতা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের এই অসন্তোষ যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দুরা যদি তাহাদের বর্ত্তমান প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করেন, কিংবা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করেন, তাহাতে তাঁহাদের কি যুক্তিসংযুক্ত আপত্তি হইতে পারে?

প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে হিন্দুরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি কোন প্রতিহিংসার ভাব দেখান না।

এই অনুষ্ঠান হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা সংস্থাপনের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইবে না বরং বিশেষ সহায়তা করিবে কারণ হিন্দুদিগের মধ্যে বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণতা হিন্দু মুসলমান মধ্যে একতা স্থাপনের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। এরূপ প্রথা প্রচলিত হইলে বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হইবে এবং ধর্ম্মমতের প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মিলনের সহায়তা করিবে। অল্প-দিনের মধ্যে অনেক মুসলমান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এদেশের মুসলমান-দিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন মুসলমানই হিন্দু, তাহাদের আচার ব্যবহার হিন্দুর ন্যায়। হিন্দুসমাজ যদি পুনর্ব্বার তাহাদিগকে স্বীয় ক্রোড়ে গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস যে বহুসংখ্যক মুসলমান পুনর্ব্বার হিধন্দুর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু হিন্দু সমাজের এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দিতে হইবে। যুক্ত-প্রদেশের আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন ভারতবর্ষে সমস্ত প্রদেশেই তাহার বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমানে কেহ কাহারও ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। যদি কোন হিন্দু মুসলমান বা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারেন না। তদ্রূপ কোন খৃষ্টান বা মুসলমান যদি হিন্দু হয়, তাহা হইলেও কেহ বাধা দিতে পারেন না।



একতা।

লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার বি, এ।

একতার সাড়া চারিদিকে পড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, দাক্ষিণাত্য-বাসী, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রায় সকলের মুখেই একতার মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। প্রত্যেকেই যে যাহার মত একতা সংস্থাপনার্থ সচেষ্ট। এ প্রচেষ্টা যে শুভেচ্ছা-প্রণোদিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নিন্দার্হ। একতার মূল্য যে সকলে বুঝিতেছেন তাহা তাঁহাদের এই সমস্ত আন্দোলন পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীয়মান হয়। সমাজ-কল্যাণার্থ এই শুভেচ্ছা-প্রণোদিত চেষ্টা প্রত্যেকের পক্ষে

বাঞ্ছনীয় এবং প্রশংসার্হ। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান বুদ্ধির অনুযায়ী সমাজ-রক্ষার্থ একতা বা মৈত্রী সংস্থাপনের অধিকারী। সকলেই জানেন "তৃণৈর্গুণত্ব মাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।" সমাজ একটী সংঘ এবং সংঘ একতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই সমাজ-জীবনের মূল ভিত্তি আদি নীতি একতা সর্ব্বাগ্রে সেবনীয় ও সংস্থাপনীয়। একতা প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজ-জীবন-রক্ষোপযোগী অন্যান্য গুণাবলীর আগমন সম্ভব। একতা—যাহা মঙ্গলপ্রসূ, জীবনপ্রদ, জ্ঞানকর্ম্ম-প্রেমের উৎস, সৃজন-শক্তিসম্পন্ন,—তাহা মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত, মৈত্রীর উদ্ভব প্রেমে। প্রেমই জীবন, প্রেমই আনন্দ ও শিব। কারণ প্রেমে জগৎ সৃষ্ট, প্রেমে অবস্থিত ও পালিত, প্রেমে চালিত, প্রেমই গতি। একতা যে মানুষের তথা জীবের এত প্রিয়, মঙ্গলপ্রদ এবং শক্তির আধার তার কারণ একতার সেবার দ্বারা আমরা সেই চরম সত্য অদ্বৈত-তত্ত্বকেই পূজা করি, যে তত্ত্ব বিশ্বের মূলে অবস্থিত। যে কোন কার্য্য একতার দিকে নিয়ে যায় তার সেবায় আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত মূল সত্যকে বরণ করি। একতা প্রত্যেকের লক্ষ্য হওয়া সৃষ্টির মূলনীতি-সম্মত। মানুষ যেমন তাহার নিজ ধারা রক্ষার্থ অন্তর্নিহিত প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া চেষ্টাশীল হয়, তদ্রূপ তাহার সমাজ বা জাতি রক্ষার্থ তাহার আত্মনিয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য। সমষ্টি-জীবন রক্ষণ ও মঙ্গলসাধনে ব্যষ্টি জীবনের সার্থকতা। সমাজ-জীবন রক্ষার্থ একতা মূলভিত্তি। একতা যখন অতীব প্রয়োজনীয় তখন তাহার স্বরূপ-নির্ণয় ও প্রতিষ্ঠার উপায় নির্দ্ধারণ সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। একতাকে তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। বাহিরের আঘাতে, নিষ্পেষণে বা ভয়হেতু যে একতা ঘটে তাহাকে তামসিক একতা বলা যেতে পারে, পরপীড়নার্থ ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে একতা উদ্ভূত তাহা রাজসিক একতা। সমাজ-জীবনে জ্ঞান কর্ম্ম ও প্রেম প্রতিষ্ঠার জন্য, লোক সংগ্রহার্থ যে একতার জন্ম তাহার প্রতিষ্ঠা আত্মায়। তদ্বিধ একতায় আসে মঙ্গল ও আনন্দ। যে একতা বাহিরের তাড়নায় উপরে প্রতিষ্ঠিত, অন্তরের প্রেরণায় নহে, সে একতা ক্ষণস্থায়ী। বাহিরের তাড়না বা বলপ্রয়োগের অভাবে তাহা অদৃশ্য হয়। এরূপ একতা জড়ীয়, তাতে জড়সুলভ, জীবনহীন, কতকগুলি জড়বস্তুর সমবায়ের মত সমবায় আনিতে পারে কিন্তু সেথায় অন্তরের যোগ না থাকায়, গভীরতম প্রদেশস্থ উৎসজাত জীবনীশক্তি ধারা প্রবাহিত হয় না বলিয়া তাহার জীবন ক্ষণস্থায়ী। সেরূপ জড়ীয় একতায় তামসিকতা বৃদ্ধি করিয়া মৃত্যু আনয়ন করে। যে

একতা ভয়ে বা হিংসায় প্রতিষ্ঠিত তাহাতে মানুষের হৃদয়কে পিশাচের লীলা-নিকেতন করিয়া তোলে। তা হতে আসে সংকীর্ণতা, আর সংকীর্ণতাই দুঃখ এবং মৃত্যু। যে একতা অন্তরতম প্রদেশ-প্রবাহিত প্রেমে প্রতিষ্ঠিত তার ভিত্তি বিস্তৃতিতে—আত্মায়, তাই তাহা আনে আনন্দ, হৃদয়ের মিলন, জীবন ও কল্যাণ। আমরা ক্ষণিক উত্তেজনার বশে যে একতার প্রতিষ্ঠার বৃথা আশায় উৎফুল্ল হই তাহাতে আমাদের নীচপ্রবৃত্তিগুলির অপসরণের অবসর ঘটে না, তখনকার মত সেগুলি সুপ্তবৎ অবস্থিত থাকে, অবসর বা সুবিধা হইলেই চরিতার্থতায় সমস্ত বল প্রযুক্ত হয়। তখন থাকে শুধু স্বার্থের উপর নজর, স্বার্থ লক্ষ্য রাখিয়াই সমস্ত কার্য্য চলিতে থাকে, হৃদয় মনের কোনও পরিবর্ত্তনের অবসর ঘটে না। মানবের দানবীয় বৃত্তির সংশোধনও হয় না। রাজনৈতিক প্রয়োজন মাত্র লক্ষ্য রাখিয়া যে একতার চেষ্টা হইতেছে তাহা একতার ছায়া মাত্র। প্রকৃত একতা প্রতিষ্ঠিত হয় শুদ্ধভাবে—পবিত্র হৃদয়ে। তাই তথা-কথিত একতা সে শুদ্ধি ও পবিত্রতার অবর্ত্তমানতায় প্রকৃত একতা নহে, অবসর পাইলেই ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয়। এ শুধু Patchwork মাত্র। মন সর্ব্বকর্ম্মের উৎস, মনের পরিবর্ত্তনে জগৎ পরিবর্ত্তিত। যতদিন মনের সে শুভ পরিবর্ত্তন না ঘটে ততদিন কলুষিত মন সর্ব্বকর্ম্মকে তার সংসর্গজাত দোষ-দুষ্ট করিবেই। মনঃ-পরিবর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য; অবশ্য, কর্ম্ম সে পরিবর্ত্তনের সহায়ক। মনকে গঠন করে কর্ম্ম, পূত করে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মই কর্ম্মের গতি ও স্বভাব-নির্দ্দেশক। সে ধর্ম্ম শুধু মতবাদ নহে, তাহা জীবন-গঠনোপযোগী কর্ম্মেরও উৎস। জগতের বিভিন্ন জাতি সমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ধর্ম্মই তাহাদিগের আলোকের পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে এবং নব সভ্যতার সৃষ্টি করে। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া যে সভ্যতা তাহা বিস্ময়োৎপাদক হতে পারে কিন্তু সয়তানের ক্রীড়াক্ষেত্র, সাময়িক স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, আত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, উহা ক্ষণস্থায়ী, অচিরধ্বংসী। যাহার প্রতিষ্ঠা যত গভীর, তাহার স্থায়িত্বও তত দীর্ঘ। ইতি-হাস প্রমাণ দেয় যে সব সভ্যতা শুধু রাজনীতি বা অন্য কোন সংকীর্ণ উদ্দেশ্য লইয়া উঠিয়াছে তাহাদের আয়ু অচিরস্থায়ী। যে সভ্যতা ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার লক্ষ্য স্থির থাকা পর্য্যন্ত উন্নতি ক্রমবর্দ্ধমান। ধর্ম্মকে রাজ-নীতির সেবক করিলেও সেরূপ সভ্যতার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। মানুষ ধর্ম্মপূত হইলে সে যাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে তাহাই সুন্দর ও শিবময় হইবে; কারণ

তাহার কর্ম্মের উৎস সতে যুক্ত। তাই রাজনৈতিক হৌক, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হৌক, তাহাকে ধর্ম্মপরায়ণ হইতে হইবে; নতুবা তাহার কার্য্য জগতের মঙ্গল না আনিয়া ধ্বংসই আনিবে। ধর্ম্মপূত সমাজনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন সমাজকে মঙ্গলের পথে চালিত করিবে। মানুষের প্রকৃত একতা এক তত্ত্বে; যতদিন মানুষ অদ্বৈতের সেবক না হইতেছে ততদিন তার প্রকৃত একতার দর্শন ঘটিতেছে না, আর সে অদ্বৈতানুভূতি ধর্ম্মে আনয়ন করে। তাই প্রত্যেককে ধার্ম্মিক ব্রহ্মজ্ঞ হতে হবে। বিভিন্ন ধর্ম্মের উদ্দেশ্যও আত্ম-সাক্ষাৎকার। এবং আত্মা এক ও জগৎ সে আত্মায় বিধৃত। বিভিন্ন ধর্ম্ম বা মত বিভিন্নভাবে আত্মসাক্ষাৎকারের পথ নির্দ্দেশক মাত্র। আত্মাই ধর্ম্ম। তাহাকে লাভ করিলে জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ—জীবন পূর্ণতা-প্রাপ্ত—সকল দ্বন্দ্বের অবসান। মানুষ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হলেই দেখতে পায় যে সকলের মধ্যে একই আত্মা এবং এক আত্মায় সকল। তখন সকল প্রশ্নের সমাধান, সব আনন্দ ও শিবময়। তাই সমাজকে, দেশকে, নিজ নিজ জীবনকে, বিনা সংঘর্ষে মঙ্গলের দিকে নিয়ে যেতে হ'লে সর্ব্বপ্রথম চাই কতকগুলি সত্যগতপ্রাণ ত্যাগী পুরুষ যাহারা নিজ জীবনে সত্যলাভ করিয়া সেপথে জগৎকে চালিত করিবে। এই অদ্বৈতের—সত্যের পথ ব্যতীত ক্ষুদ্রত্বের—স্বার্থের পথে শুধু সংঘর্ষ, তাতে আনে ধ্বংস। অতএব তাহা অবশ্য পরিত্যাজ্য। এই সত্যসেবক-গণই দেশের ভাবী নেতা। কে আছ কোথায় নিদ্রিত, উত্থিত হও, উত্থিত সত্যদ্রষ্টার নিকট অবগত হও, লোক সংগ্রহ মন্ত্রে দীক্ষিত হও। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ওঁ শান্তিঃ।

ব্রহ্মচর্য্য।

লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার বি, এ।

ব্রহ্ম বৃহৎ, "বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম।" যাঁহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই। ব্রহ্মণি চরতি ইতি ব্রহ্মচর্য্যং। ব্রহ্মে বৃহতে অবস্থান, ব্রহ্মের সেবাই ব্রহ্মচর্য্য। বিশ্বের মূল কারণ যিনি, জন্মাদ্যস্যযতঃ, তিনিই ব্রহ্ম। বৃহতের ভাব সেবায় মনের প্রসারণ, তৎফলে মানসিক-সংকীর্ণতা-জাত কামক্রোধাদির উদ্ভব অসম্ভব হইয়া

পড়ে। বীর্য্য-ধারণাদি আনুসঙ্গিক ফল। শুধু বীর্য্যধারণ হইলেই ব্রহ্মচর্য্য হয় না। বীর্য্য ধারণ করিয়া যদি মানসিক ক্ষুদ্রত্ব বর্ত্তমান থাকে, মনের বিস্তৃতি না ঘটে, তবে ঐরূপ অবস্থা ব্রহ্মচর্য্য নহে। বৃহতের সেবা এবং দেহ-ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বা যে কোনও প্রকারের মনের স্থূলতা পরস্পর বিরোধী। যে কেহ মনের স্থূলতার সেবক সে অন্য কিছু হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মচারী নহে; সে জড়োপাসক। যে কোনও উদারভাব মনের স্থূলতা নাশ করিয়া মনকে বিস্তৃতির পথে লইতে সমর্থ, তাহাই ব্রহ্মচর্যের অঙ্গীভূত। শিল্প বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্যাদিও মনের প্রসারণের সহায়ক হইলে তাহা ব্রহ্মচারীর সেবনীয়। প্রাচীন যুগের ঋষিগণের এবম্বিধ ব্রহ্মচর্য্যই লক্ষ্য ছিল। কারণ সকল উদারভাবই বিশ্বের মূল কারণাভিমুখী।

কামাদির জয় দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য লাভের প্রয়াস—destructive method—ধ্বংসমূলক নীতি। উদারভাবের সেবার দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যলাভের প্রয়াস—constructive method—গঠনমূলক নীতি। শেষোক্ত পদ্ধতিতে কামাদির জয় আনুষঙ্গিক ফল, পৃথকভাবে তজ্জন্য চেষ্টার আবশ্যকতা নাই। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থে স্ত্রী-সংসর্গ-ত্যাগ গ্রহণ করিলে সেদিকে সফলকাম হইবার উপযোগী কঠোর চেষ্টা Struggleএ জীবনের অধিকাংশ energy শক্তি নষ্ট করিতে হয়। শুধু বীর্য্যধারণ লক্ষ্য ভাবিয়া জীবনকে পরিচালিত করায় জীবন কণ্টকিত হইয়া উঠে। অনবরত বিন্দুধারণ চিন্তায় এক প্রকারে কামরিপুর সেবাই করা হয়। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এমনই ভাবে গঠিত যে মন যাহার চিন্তায় যত রত থাকে সে ভাব মনকে তত বলে আকর্ষণ করে এবং মনের উপর তত প্রভাব বিস্তার করে। যে ভাবেই যে বস্তুকে চিন্তা করা যায় সে বস্তু সেই পথ দিয়া মনকে তদাকারে আকারিত করে এবং মন দীর্ঘ সময় যে আকারে আকারিত হয় মন তদবস্থা প্রাপ্ত হয়। মানুষে মানুষে পার্থক্য মনের চিন্তারাশির দ্বারা। শুধু স্ত্রী-সংসর্গ ত্যাগের চেষ্টায় একদিকে মূললক্ষ্য বৃহতের চিন্তা হয় না—অন্যপক্ষে অনবরতঃ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চিন্তায় সেই বৃত্তি বলবান হইয়া উঠে এবং তদ্ধেতু কঠোরভাবে ইন্দ্রিয় নিরোধের চেষ্টা করিতে হয়; ফলে অনেক সময় বিবিধ ব্যাধির সৃষ্টি। অস্বাভাবিক উপায়ের অবলম্বনে অনেক পাপের পথ সুগম করা হয়। কামাদি রিপু দমনের চেষ্টায় অনবরতঃ মন সংলগ্ন থাকায় শুধু যে অন্য উচ্চবৃত্তি চর্চ্চার অবসর কম ঘটে তাহা নহে, একটু অসতর্ক হইলে বা শৈথিল্য ঘটিলে তাহা—অবসাদ জনিতই হউক বা অপারকতা জনিতই হউক—অমনি সকল কৃত্রিমতার

বান্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, এতদিনের অস্বাভাবিক চেষ্টার প্রতিক্রিয়ারূপে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করে। অনেকের জীবনে এমনও ঘটিয়াছে যে এইরূপ পন্থা লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ ঔষধাদির ব্যবহারের ফলে জীবনকে ধ্বংসের মুখে লইয়া গিয়াছে। যদি ইহাই লক্ষ্য হয় তবে ক্লীব ব্যক্তির করণীয় কিছু থাকে না। অপরপক্ষে বৈদিক ঋষিগণ, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি মহা-পুরুষগণ সন্তানের জনক হইয়াও ব্রহ্মচারী।

সংকীর্ণার্থক ব্রহ্মচর্য্যকে মহত্বজ্ঞাপক আদর্শরূপে স্থাপন করার ফলে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর শোচনীয় বীভৎস চরিত্র উৎপাদনের সহায়তা করা হইয়াছে। বিবাহাদি হেয় বিবেচিত হওয়ায় অনেক মোহান্তাদি সাধারণভাবে স্ত্রীরূপে স্ত্রীলোক গ্রহণ করিবার সাহস না থাকিলেও স্ত্রী-সংসর্গকে জীবনের একটী প্রধান অবলম্বনীয় করিয়া লইয়াছে। আবার সন্তানোৎপাদন গর্হিত কার্য্য কীর্ত্তিত হওয়ায় রসিকাদি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়াছে। তাহারা স্ত্রী-সংসর্গ অবাধ ভাবে করিয়া থাকিলেও তাহা নিন্দনীয় মনে করে না, পরন্তু সাধনার অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু বীর্য্যপাত ও গর্ভ নিবারণ-উপযোগী স্ত্রী-সংসর্গ ও ভ্রূণ-হত্যার স্রোত খরভাবে প্রবাহিত। এরূপ শিশ্নোদর-সর্ব্বস্ব কপট ব্রহ্মচারীর সংখ্যা যে কত বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা প্রত্যেক চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির পক্ষে অতি সহজ বোধ্য। মানুষের মহত্ব তাহার উদার বৃহৎভাবের পোষণের উপর স্থাপিত না করিয়া সন্তানের অনুৎপাদনের উপর স্থাপিত করায় সমাজের যে ভীষণ অনিষ্ট করা হইয়াছে তাহা প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝেন। আধু-নিক সংকীর্ণার্থক ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষ্য ক্ষুদ্র, ও অংশ লাভ এবং উহা অস্বাভাবিক। প্রাচীন যুগের উদারার্থক ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষ্য উদার মহান্ এবং বৃহতের সেবা-মূলক এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী। সংকীর্ণার্থক ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষ্য এ পথে সহজ লভ্য। প্রকৃতির নিয়মানুসারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিন্দুধারণও ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন যুগের ব্রহ্মচর্য্য নীতি মানব-মনস্তত্ব ও দেহতত্বের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্ব্বাচীন কালের সংকীর্ণার্থক ব্রহ্মচর্য্য সেবায় স্ত্রীত্যাগী বীর্য্য-ধারণক্ষম ব্যক্তি পাইতে পারি, কিন্তু প্রাচীন যুগের ব্রহ্মচর্য্যসেবীর ন্যায় নানা উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী তত্বজ্ঞের উদ্ভব কঠিন। ব্রহ্মোস্থিত ব্রহ্মচারীর স্থলে যে দিন ভারতে সংসার-ত্যাগী নারী-ত্যাগীকে সর্ব্বোচ্চ আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইদিন হইতে দলে দলে কর্ম্মত্যাগী অকর্ম্মণ্য সমাজের মলগ্রহের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং সমাজের তলদেশে গুপ্ত পাপস্রোত ধর্ম্মের

নামে বহিয়া সমাজ-জীবনকে জীবনীশক্তি-চ্যুত করিতেছে। নারী-ত্যাগী সংসার-ত্যাগী কর্ম্মত্যাগী ভোগলোলুপ তথাকথিত সাধুর আহার বসন, বাসস্থান, ইন্দ্রিয়াদির ভোগ-লালসা বর্ত্তমান থাকায় নানা প্রতারণার দ্বারা সমাজ লুণ্ঠন চলিতেছে। ইহাদের সম্মানলাভ সহজ প্রাপ্য এবং একরূপ বিনাশ্রমেই সকলরূপ ভোগ লালসার পরিতৃপ্তিও ঘটে, তাই এ পথটা অনেকের পক্ষে লোভনীয় হইয়া পড়িয়াছে। "কাণেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষুঃপীড়ৈব কেবলং।" এত কথায় কেহ যেন না বুঝেন যে আমি সংযমের নিন্দা করিতেছি। আমিও সংযমকে অবশ্য প্রশংসার্হ মনে করি। সংযম-লাভের উপায় লইয়াই আমার মত-পার্থক্য। অবশ্য যাঁহারা লোক-সংগ্রহার্থ জগদ্ধিতায় ক্ষুদ্র সংসার ছাড়িয়া বিশ্ব সংসারকে আপনার করিতে সমর্থ, তাহারা আমার ভূয়: নমস্য। কিন্তু সে সব মহনীয় চরিত্রগুলি সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত Exception মাত্র, General Law সাধারণ নিয়ম, সমাজের আদর্শ, উহা হইতে পারে না। মানুষের মহত্ত্ব তাঁহার মানসিক উচ্চতার ও উদারতার উপর প্রতিষ্ঠিত হউক। এবং এইরূপ আদর্শ যাহাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় এমন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য নিয়ম ধারণার সংস্থাপন সমাজের কর্ত্তব্য। রাম, কৃষ্ণ, বৈদিক ঋষিগণকে, জীবনের আদর্শ করিয়া যেন আমরা আমাদের জীবনে ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি এই প্রার্থনা। পরমপুরুষ মঙ্গলময় পরম পিতা আমাদের সহায় হউন। হরিঃ ওঁ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

হিমালয় পর্ব্বতে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ—

সম্প্রতি 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' নামক বোম্বাই সহরের সুবিখ্যাত সংবাদপত্রে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। তিব্বত অভিযানে যাঁহারা [illegible] ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মেজর ক্রশ একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে হিমালয় পর্ব্বতে তাঁহার সহিত এক মহাপুরু[illegible] সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মহাপুরুষের বয়স ২৪০ বৎসর। [illegible] বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। হিমালয়ে আরও অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁ[illegible]

তাঁহাদের নেতা। এই মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান বিদ্যা জানেন, নিজের ইচ্ছামত লোকচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইতে পারেন। আরও স্বেচ্ছানুসারে তিনি নিজের হস্ত পদাদি ক্ষুদ্র বা বৃহদাকারে পরিণত করিতে পারেন। মেজর সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত একটী কাচের গ্লাস ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং একটী প্রেতাবিষ্ট বালকের দেহ প্রেতমুক্ত করিলেন। তিনি বলেন যে আগামী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এক অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইবে এবং উহার পর এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—

গত ৭ই ও ৮ই আষাঢ় দিবসদ্বয় নৈহাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে বাঙ্গালা ও আসামের নানাস্থান হইতে বহু সাহিত্যিক নৈহাটীতে সমবেত হইয়াছিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে তিনি বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কয়েকটী সারবান্ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন। প্রতিনিধি-বর্গের আদর আপ্যায়নের কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই সম্মিলনের এতদূর সাফল্য ঘটিয়াছিল।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৯ই আষাঢ় রবিবার, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশ হইতে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের অন্তর্দ্ধান ঘটিল। তিনি ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে যশোহরের অন্তঃপাতী কালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রণীত 'মানবের আদি জন্মভূমি,' টীকা অনুবাদসহ ঋগ্বেদ, 'জাতিতত্ত্ব-বারিধি' প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তাঁহার নাম সাহিত্যজগতে অমর করিয়া রাখিবে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭র সালের ২৫ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩০শ বর্ষ, ৩০শ খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা।

শ্রাবণ

১৩৩০ সাল।
১৮৪৫ শকাব্দাঃ

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি।

-ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার এম. এ. পি এইচ. ডি.

জীবনের পথে অগ্রসর হইতে না হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে কত বাধা, বিপত্তি আমাদের সাম্নে মাথা উচু করে দাঁড়াইয়া আছে। জীবনের পথ যে সরল ও সহজ নয় এটা ত নিত্য অভিজ্ঞতার কথা। বাধা, বিপত্তি আছে বলিয়াই, মানব জীবনটা এত বৈচিত্র্যময় হইয়াছে; মানবের বুদ্ধি কত প্রকারে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। জীবনের পথ কণ্টকময় বলিয়াই ত বোধি-সত্বের ভিতর নির্ব্বাণের সাড়া এসেছিল, শঙ্কর অদ্বৈতে স্থিতি খুঁজিয়াছিলেন, চৈতন্য প্রেমের উদ্দীপনায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। সত্যি সত্যি মানবের অদৃষ্টটা এমনি যে ভিতরে আছে তাহার অফুরন্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাহিরে আছে তাহার সীমাহীন বাধা। এই দুই শক্তির সংঘর্ষণে কে কোথায় ছড়িয়া পড়ে, মানবের অদৃষ্টের রশ্মি যাঁহার হাতে আছে, তাহা কেবল তিনিই জানিতে পারেন।

দার্শনিকদের ভিতর যত কিছু মতভেদ থাকুক না কেন, সকলেই কিন্তু এই চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিলেন, কি করে মানুষের জীবনটাকে সুখী করিতে পারা

যায়, কোন্ পথে গেলে সহস্র ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়াও মানুষ আনন্দলাভ করিতে পারে। আমরা যে আনন্দই চাই, দুঃখ চাই না, ইহা ত জীবনের সাড়াই বলিয়া দেয়। জীবন এবং আনন্দ ইহা আমরা পৃথক্‌ভাবে দেখিতে পাই না। জীবনই আনন্দ, আনন্দই জীবন।

আনন্দ যদিও লক্ষ্য, মানুষের বুদ্ধি কিন্তু এই আনন্দকে এক পথে, একভাবে খোঁজে নাই। কাহারও আনন্দ ভোগে, কাহারও আনন্দ ত্যাগে। কাহারও আনন্দ কর্ম্মময় জীবনে, কাহারও বা আনন্দ ধ্যানের শান্তিতে। আনন্দকে পাবার পথ যতই বিভিন্ন হউক না কেন, আনন্দই যে একমাত্র বরণীয়—এ নিয়ে মনস্বীদের ভিতর কোন মতবাদ সৃষ্ট হয় নাই। পথ নানা রকম থাকিলেও সাধারণতঃ দুইটী পথই আমাদের চোখে পড়ে। একটা জড়ের উপাসনা, আর একটা চিতের উপাসনা। জড়বাদ প্রকৃতি জগতে যে শক্তি আত্ম-পরিচয় দিতেছে, যে শক্তির ভিতর একটা অন্ধ-তাণ্ডব নৃত্য ভিন্ন জ্ঞানের প্রকাশ বা যোগের কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাঁহারই পূজা করিতেছে, তাঁহাকে কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া মানবের সুখ সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে।

জড়বিজ্ঞান আমাদের নিকট যতই সুখের পথ উদ্ঘাটন করুক না কেন, এই সুখ এবং তাঁহার অনুসন্ধান আমাদের দৃষ্টিকে স্থূল জগতে বদ্ধ করিয়া যে রাখে এটা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং ইহাও অনুভূত সত্য যে জড়জগতে নানাবিধ সুখে পরিপুষ্ট হইয়াও আমাদের সত্তার পরিতৃপ্তি হইতেছে না, আনন্দ পূর্ণতালাভ করিতেছে না। জড়বিজ্ঞানের প্রশ্রয় দিয়া আমরা দেহাত্ম-বুদ্ধির প্রাধান্য স্থাপিত করি। ফলে হয়, আমরা বাহ্য কর্ম্ম ও বাহ্য শুভাশুভের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। আমাদের অন্তরদেবতা চিরকালের জন্য অবস্থার এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনার শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন। আনন্দের অন্বেষণে পাই শরীরের দাসত্ব এবং প্রকৃতির চিরপরাধীনতা। এবং ইহা অনবদ্য সত্য যে আত্মার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ যেখানে নাই, সুখও সেখানে নাই। জড়বিজ্ঞান কিছু পরিমাণ প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব আমাদের হাতে আনিয়া দিলেও, সেই কর্ত্তৃত্বের ফলে আমাদের দুঃখই বাড়িয়া যায়, সত্যের বেদীতে শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে হয় ভোগ, কিন্তু জ্ঞানের নিত্য মুক্তির বিভূতি বহুদূরে পড়িয়া থাকে।

জড়বাদের সিদ্ধান্তে তৃপ্ত না হইয়া মনীষিগণ অন্তরদেবতার ভিতর শান্ত ধ্যানে সত্যের প্রসন্ন দৃষ্টি অনুভব করিয়াছিলেন। চিৎবাদ যাঁহারা মানেন তাঁহারা

সকলেই প্রকৃতির অতীত এবং মানব জীবনের অন্তরনিহিত এক চিন্ময় সত্তা আছেন ইহা বিচারের দ্বারা বুঝাইয়া থাকেন এবং ধ্যানের দ্বারা অনুভব করিতে বলেন। সেই সত্যের স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে কিছু মতভেদ থাকিলেও সেই সত্য যে জড় নহে, তাহা যে নিজের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, অমৃতে পূর্ণ এবং আনন্দে মগ্ন এ বিষয়ে কোন বিভিন্ন মত নাই। এই সত্যকে, ধীর যাঁরা, অমৃতের বাসনায় যোগস্থ হইয়া প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করেন।

অন্তর্জীবনে ধ্যানের গভীরতায়, বুদ্ধির নির্ম্মলতায় আমাদের অন্তরাত্মার নিকট যখন জ্যোতির্ম্ময় সত্যের সহিত দিব্য মিলনের স্পন্দনে আলোকের পর আলোকের স্তর প্রকাশিত হয় তখনই আমাদের অন্তরাত্মা জড়ের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া চৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা অনুভব করে। বোধ তখন তার বেশ অনুভব করে সে প্রকৃতির দাস নয়, ইন্দ্রিয়ের দাস নয়, সে নিত্য মুক্ত চিদাকাশের অধিবাসী, বিশাল তাঁহার প্রাণ, সূক্ষ্ম তাঁহার দৃষ্টি, চিন্ময় তাঁহার স্থিতি, নাই তাঁর মৃত্যু, নাই জীবনের ক্লান্তি। অফুরন্ত জীবনের তরঙ্গরোল সীমাহীন আনন্দের শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মূক হইয়া যায়।

জ্ঞানমৌনভাব বেশী দিন স্থির হয় না। সৃষ্টির এমনি কৌশল, এমন একটা অব্যক্ত নিয়ম আছে যে জ্ঞানী সত্যের সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া মৌনী থাকিতে পারেন না। সমস্ত শক্তির আধার যিনি, তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইলে জ্ঞান ও বিজ্ঞান নানাবিধ শক্তির অতীত হইয়া শক্তিকে ধারণ করিয়া যে অনন্ত কল্যাণের সৃষ্টি বিধৃত হইয়া আছে, জ্ঞানী সেই কল্যাণের ধারা যাহাতে পুষ্ট হয়, তাহারই চেষ্টা করেন। নিজের আত্মশক্তিতে যোগস্থ হইয়া, ব্রহ্মশক্তির সহিত মিলিত করিয়া, ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যকে পরিহার করিয়া বিরাট শক্তিতে পূর্ণ হন। সত্যি তখন তাঁহার কর্ম্ম-চেষ্টা নিজ শক্তির দ্বারা স্ফুরিত হয় না, বিশ্বশক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া নিজের লীলা বৈচিত্র্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। কোন বাধাই তাঁহার সামনে দাঁড়ায় না, দাঁড়াইলেও এমন একটা অঘটন সঙ্ঘটন হয়, যাহাতে সত্যের মহিমা মানবের নিকট প্রকাশিত হয়। জগৎ রচনার এই কৌশল এমনি সুন্দর যে যোগী তাঁহার যোগ সম্পদ্, ধ্যানী তাঁহার প্রশান্ত স্থিতি, প্রেমিক তাঁহার নিত্য মিলনের নবীন অনুরাগ মানব সমাজের নিকট প্রকাশ না করিয়াই, নিজের সত্তাকে মহাশান্তিতে বিলীন করিতে পারেন না। এই কৌশলের মহত্ব অনুভব করিয়াই বোধিসত্ত্ব বলিয়াছিলেন "ধন্য তাঁহারা যাঁহারা নির্ব্বাণসুখে স্পন্দনবিহীন

ধ্যানে নিমগ্ন!" "কিন্তু, আরও উচ্চতর শ্রদ্ধার পাত্র তাঁহারা, যাঁহারা এই নির্ব্বাণের শান্তিসুখ লাভ করিয়াও মানবের কল্যাণের জন্য নির্ব্বাণ ত্যাগ করিয়াছেন।" ত্যাগের মধ্যে এত বড় ত্যাগ আর নাই। সমস্ত মানবকে নির্ব্বাণ দিবার আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবান বোধিসত্ত্ব মানবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। চৈতন্য পথের ভিখারী হইয়া দ্বারে দ্বারে প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই যে বিকর্ষণ, এই যে শক্তির কেন্দ্রচ্যুতি—ইহাই ত যুগে যুগে জ্ঞানে, প্রেমে, আনন্দে মানবসমাজকে পূর্ণতৃপ্ত এবং পরিপ্লুত করিয়াছে। মূকমৌনিতায় জ্ঞানী প্রতিষ্ঠিত হইলে এ জগৎ নীরস হইয়া উঠিত, ইহা শান্তির আগার না হইয়া, সয়তানের লীলাভূমিতে পরিণত হইত।

জ্ঞানের শিখরচূড়া হইতে নির্ঝরের ধারার ন্যায় আপনার স্বচ্ছন্দ গতিতে কূল কিনারা ভাসাইয়া প্রবাহিত হয় অমৃতের প্রস্রবণ, আনন্দের লহরী। বাধাহীন উন্মুক্তপ্রাণে এই স্রোতের ধারা অমৃত পরিবেশন করিয়া, মানুষের জীবনকে পূর্ণতার সন্ধান দিয়া, জ্ঞানে দৃষ্টি উজ্জ্বল করিয়া, দিব্য বিভূতিতে মণ্ডিত করিয়া, আলোকের পর আলোকের ঝলক্, আনন্দের পর আনন্দের উচ্ছ্বাস এসে মানব-হৃদয়কে কি এক অননুভূত রসে সিক্ত করে। এই স্বচ্ছ ধারা সমাজের অন্তরের দৈন্য, ক্লেশ বিধৌত করিয়া, মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। সংসারের সহস্র অপবিত্রতা, শত মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এমন সত্যে যুক্ত হইয়াছেন তিনি যে তাঁহার দৃষ্টি পথে পাপ দাঁড়াইতে পারে না, সঙ্কীর্ণতা আসিতে পারে না। তাঁহার পথ সর্ব্বত্র উন্মুক্ত, গতি নির্ব্বার।

এইরূপ নিত্যযুক্ত হইয়া, কর্ম্মের অধিকার সকলেরই হয় না। জ্ঞানের উচ্চতম ভূমিতে প্রথমে আরোহণ করা চাই। সত্যই যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্মের অধিকার আছে তাঁর, যিনি চিদাকাশে নিত্য বিহার করেন। এই চিদাকাশের উন্মুক্ততা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই যে জীবনে, সেখানে কর্ম্মের ধারা, জ্ঞানের ধারা, জীবনের ধারা আকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া নিজেকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে থাকে।

কর্ম্ম করিবার পুর্ব্বে যোগস্থ হওয়া চাইই চাই। সঙ্কীর্ণ জীবনের সাড়া হইতে উৎপন্ন হয় যে কর্ম্মের ধারা, সে'ত নিজের মঙ্গলের পথও খুঁজিয়া পায় না, পরের ত দূরের কথা। জীবন যাত্রার অভিজ্ঞতার ফল কতটুকু হিসাব নিকাশ করে, জীবনের ধারা বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পারে না। এই ধারাকে অবিরত গতিযুক্ত রাখিতে হইলে নির্ঝরের ঝরের সহিত মিলাইয়া দিতে হইবে। এই জন্যই ভগবানের আদেশ "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি।"

আত্ম-কথা।

গান।

(রসিকের সুর।)

লেখক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বসু।

(ক)

সদা এই ভেবে মরি,
কেমনে যে পাব হরি ;
আমি বল্‌ব কি হরি, আমি এই দুখে মরি,
আমি তোমার নাম ভুলে যাই যা কিছু করি,
আমার মন প্রাণ হয়, উচাটন,
বুঝাতে তায় নাহি পারি ॥

(খ)

আমার প্রাণে যা বলে,
করিলে তা ফল ফলে,
অতি সঙ্গোপনে, সযতনে,
হরির নাম বলে।
আমার কি বিপত্তি, মন বেটা তারে বাধা
দেয় কি করি ॥

(গ)

আবার বুদ্ধি নামে আর
একটা আছে সঙ্গে তার,
ঘুরায় ফিরায়, নাচায়, কান্দায়
তারে বোঝা বড় ভার,
সে মিট্‌ মিট্‌ ক'রে তাকায় সদা বিষম প্রহরী ॥

(ঘ)

যখন তাহারে জানাই ;
বল কি করিব ভাই,
তার অভিমানে, মরি মরমে
ব'ল্‌তে লজ্জা পাই,
সে ফাঁকি দিয়ে আমার সঙ্গে করে কত ছল চাতুরী

(ঙ)

তাহার চঞ্চলতায়,
প্রাণ অস্থির করে হায়,
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি জোটায় বোঝা বড় দায় ;
তার ছলনায় ভুলে যাই তোমার নাম জারি ॥

(চ)

বুদ্ধি আর ধারণার,
তিন রূপ ভেদ যার,
সত্ত্ব, রজ, তম গুণত্রয় কি বাহার ;
এই ত্রিগুণের শেষ গুণে বন্ধন আমারি ॥

(ছ)

হৃদে ধরি যে ধারণা,
স্বচৈতন্যে অচেতনা,
নিদ্রা, ভয়, শোকে জীব সংসার ছাড়ে না ;
আমি লাজে দুখে ম'রে যাই
বল্‌ব কি শ্রীহরি ॥

(জ)

আমি কত কালে আর,
পাব সত্ত্বগুণ তোমার,
ভক্তিমূলে তোমার নাম সর্ব্ব মূলাধার ;
আমি তোমার নামে তোমার কামে
জীবন পরিহরি ॥

(ঝ)

কেন অসার সংসারে,
আর ঘুরাও আমারে,
আমার মনের বন্ধন, চোখের বন্ধন
খুলে দেওনারে ;
আমি মন প্রাণে দিবা নিশি
বলি হরি হরি ॥

(ঐ)

ওহে ভব কর্ণধার,
তুমি কর আমায় পার,
প্রকৃতি আমার আর চায় না সংসার
পার কর বা না কর হরি,
পায়ে রেখ দয়া করি ॥

"জাতীয় জীবনে অদ্বৈত-তত্ত্ব।"

লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার বি, এ,

অদ্বৈত বিশ্বাত্মা চৈতন্য হইতে স্থূলতম পরিণতি—দূরতম সৃষ্টিসীমা জড় ক্ষিতি। আবার ঐ চৈতন্যই জড়, স্থাবর জঙ্গমাদির মধ্য দিয়া কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী অবশেষে মনুষ্যে পরিণত। জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে একই শক্তি তার স্থূলতম প্রকাশ জড়কে ভেদ করিয়া সূক্ষ্মতম প্রকাশের দিকে ধাবিত এবং যে যে medium স্তরের মধ্য দিয়া এই লীলা সংঘটিত হইতেছে তাহাদিগকেও ঐ চরম বিকাশের দিকে চালিত করিতেছে। যে কার্য্য এই অভিব্যক্তি পথের সহায়ক তাহাই সৎ বলিয়া কথিত এবং যাহা অভিব্যক্তির বাধা-প্রদায়ক তাহাই অসৎ ও নিন্দার্হ। চৈতন্য জড়ে পরিণত হইয়া আবার জড়ের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সমগ্রকে যেন চৈতন্যের দিকে লইয়া যাইতেছে—যেন বাষ্প তুষারের মধ্যে কার্য্য করিয়া তুষার রাশিকে বাষ্পে পরিণত করিতেছে। আদিতে এক ব্রহ্ম হইতে একই বর্ণের সৃষ্টি। এক বর্ণ হইতে বহুবর্ণ সৃষ্টি দ্বারা মনুষ্য-সমাজস্থ বিরাট বিষ্ণু নিজেকে আস্বাদন করিতেছেন। বর্ত্তমানে সৃষ্টির নিয়মানুসারে বিশ্ব পুনঃ একের দিকেই ধাবিত। এই বৃত্ত-পরিক্রমণই বিশ্বের নিয়ম। যিনি সৃষ্টির এই গূঢ়তম নিয়ম অবগত হইয়া তদনুসারে নিজেকে গঠিত ও চালিত করেন এবং অপরকেও তৎকার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করেন তাঁহার জীবনে ভগবৎ লীলা প্রকটিত এবং তিনি ধন্য। বিজ্ঞানের কার্য্য স্থূল জগৎ অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তন্মধ্যে স্থিত সত্যকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে জগৎ-মঙ্গলার্থ নিযুক্ত করা। তদ্রূপ সমাজনেতার কার্য্য

মানব সমাজের অন্তর্নিহিত বিচিত্রতার মধ্যস্থ একত্ব আবিষ্কার করিয়া সেই সত্যের প্রয়োগ দ্বারা সমগ্র সমাজকে মঙ্গলের দিকে চালিত করা। সত্য শিব, সুন্দর ও এক।

স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়তঃ আমরা বিশ্বের সবাই পরস্পর সংশ্লিষ্ট। স্থূল হিসাবে আজ যাহা বৃক্ষে, কাল তাহা মনুষ্য-শরীরে, অপর দিন তাহা অন্য গ্রহে। জড়াণুর এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতেছে, এক এক দেহ যেন সে প্রবাহের এক একটী আবর্ত্ত। তাপ, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি নানা আকারে একই শক্তির প্রবাহ বর্ত্তমান। মন হিসাবে সকল মনই এক বিশ্বমনের অংশ মাত্র। চৈতন্য হিসাবেও সবাই এক চৈতন্যে বিধৃত। "সূত্রে মণি-গণাইব।" স্থূল হিসাবে স্থূল দৃষ্টিতে আমরা পৃথক। সে পার্থক্যও ক্ষণস্থায়ী। যদিও স্থূল দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই এক একটী বিশেষ দেহ অবলম্বন করিয়া কোন ব্যক্তির বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থিত, তবুও সূক্ষ্মতঃ ঐ একই দেহস্থিত অণু প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত এবং সে দেহাণু অন্য দেহে প্রবিষ্ট এবং অন্য দেহাণু সেই দেহে প্রবিষ্ট। আমরা পরস্পর পৃথক হইয়াও এক। এই বাহিরের পার্থক্যে নিবদ্ধ-দৃষ্টি মানবই প্রকৃতপক্ষে জড়োপাসক পৌত্তলিক। যাঁহারা সবার মধ্যকার অদ্বৈততত্ত্বকে দেখেন এবং সবাইকে তাহাতে অবস্থিত বোঝেন তাঁহারাই ভগবদ্ভক্ত। অন্যে ভগবদ্-বিরোধী বহুত্বের—সয়তানের সেবক। আত্মার উপাসক সর্ব্বত্র দেখেন এক আত্মারই লীলা এবং তাঁহাকে কর্ম্মে, জ্ঞানে ও প্রেমে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন এবং আপন জীবন মাঝারে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দিয়া ধন্য হন। এরূপ জ্ঞান কর্ম্ম প্রেম পরস্পর অনুপূরক। কর্ম্মে আত্মার আবরণ অপসারিত, জ্ঞানে তাঁহার উপলব্ধি এবং প্রেমে উপভোগ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে স্থূল-দৃষ্টি-সম্পন্ন জড়োপাসকের দৃষ্টি দেহজাত বাহিরের পার্থক্যে নিবদ্ধ, আর সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন আত্মসেবীর দৃষ্টি সর্ব্বান্তর্নিহিত অদ্বৈত-তত্ত্বে সংবদ্ধ। বহুত্ব নিবন্ধন দৈহিক পার্থক্য শত চেষ্টায়ও অপনোদিত হইবার নহে। মাত্র প্রেমের দ্বারা ছোট বড়, পিতা পুত্র, ভগবান ভক্ত এক, এবং ভগবানের মধ্য দিয়াই আমরা এই বহুধা বিভক্ত জগতের সঙ্গে এক হইতে সক্ষম। এই একত্ব উপলব্ধি ও উহাতে বর্ত্তমান থাকা মানব জীবনের বিকাশ এবং পূর্ণ প্রাপ্তি। শত লগুড় আঘাতেও অন্ধকার দূরীভূত হইবার নহে, কিন্তু আলোর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই তাহা বিতাড়িত হয়। ব্যষ্টি জীবনের চরম লক্ষ্য ও শ্রেষ্ঠতম উন্নতি মঙ্গল

যেমন পরতত্ত্ব ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে, সমষ্টিগত জাতীয় জীবনেরও তদ্রূপ চরম লক্ষ্য ঐ একতত্ত্ব উপলব্ধিতে। উহাতেই জাতীয় জীবনের মঙ্গল এবং আনন্দ। যে কর্ম্ম ঐ দিকে নিয়ে যায় তাহাই সৎ এবং অবশ্য অবলম্বনীয়। ব্যষ্টি জীবনের সার্থকতা সমষ্টি জীবনের রক্ষা ও মঙ্গলাভিমুখে পরিচালনে। সমাজ-জীবনধারা অক্ষুণ্ণ ও অনাবিল রাখিতে হইলে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য সমাজস্থ সকলকে সে চরম সত্যলাভে সহায়তা করা। প্রত্যেকের ব্যষ্টি জীবন ও সমাজ-জীবন-ধারা বিশুদ্ধ রাখা অবশ্য-করণীয়। সমাজের সকলকে সত্যের দিকে পরিচালিত করা যেমন কর্ত্তব্য তেমনি ঐরূপ প্রচেষ্টা ব্যষ্টি জীবনের সিদ্ধির সহায়ক। সমাজ গঠনের মূলনীতিও সমগ্র জীবনের সম্যক্ পরিস্ফুটন। সে সমাজ তত পুষ্ট ও জীবনীশক্তি-সম্পন্ন যে সমাজের প্রতি স্তরে এই নীতি সেবিত। যেখানে সমাজের লোকসমূহ বিশেষতঃ অধিকাংশ কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রেমপথে উৎকর্ষ লাভে বাধা প্রাপ্ত এবং তামসিক, সে সমাজ উন্নত এ কথাটি অর্থহীন। সমাজের দৃঢ়তা, জীবনী-শক্তি-সম্পন্নতা ইত্যাদি সমাজের সকলের অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেখানে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থের সম্মুখে অধিকাংশের স্বার্থ বলিকৃত, সে সমাজ ধ্বংসের মুখে। নিম্নস্তরের উন্নতির পরিমাণ অনুসারে অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরের উন্নতির মূল্য নির্ভর করে। নিম্নস্তর সমাজের ভিত্তি। ভিত্তি যেখানে যত সুদৃঢ় তদুপরি নির্ম্মিত সৌধকেও তত সুদৃঢ় করা সম্ভব। তাই নিম্নস্তরের উন্নতির উপর জাতীয় জীবনের উন্নতি স্থাপিত।

কলিতে সেবাধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক অভাব দূরীকরণানুসারে সেবা ত্রিবিধ। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরের কর্ত্তব্য তন্নিম্নস্তরের দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করা। নিম্নস্তরের কর্ত্তব্য ঊর্দ্ধতন স্তরের ঊর্দ্ধগমনে বাধা উৎপাদন না করা। এইরূপে পরস্পরের সেবার দ্বারাই জাতীয় জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ। চারিদিকে যে হিন্দু জাতি সমূহের উন্নতির সাড়া দেখা যাইতেছে তাহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়; কারণ, অন্য কিছু না হইলেও সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী তামসিকতা-প্রসূত গাঢ় নিদ্রার পর উত্থানের চেষ্টা ত বটে। এ জাগরণ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গবৎ বা প্রকৃত জীবনী শক্তির আগমন-প্রসূত, ধ্বংস আনিবে কি মঙ্গলের দিকে চলিবে এ প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের কার্য্যের উপর নির্ভর করে। অনেক সময় দেখা যায় কোন সম্প্রদায়গত আন্দোলনের উত্তেজনায় অনেকে তাহাদের উপরিস্থিত স্তরের লোক সমূহকে টানিয়া নিম্নে নামাইতে চাহে এবং নিম্ন স্তরের লোকদিগকে পদা-

খাতে দূরে নিক্ষেপ দ্বারা মধ্যস্থিত ব্যবধানকে বিস্তৃত করিতে চাহে। এ পথ যে ধ্বংসের তাহা সহজবোধ্য হইলেও স্বার্থান্ধ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় না। আবার অনেক ক্ষুদ্র-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ পদমর্য্যাদা বিনাশের ভয়ে বা নিম্ন স্তরের ব্যক্তির উন্নতিতে নিজ নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে না এই আশঙ্কায় অথবা পরশ্রীকাতরতাপ্রসূত ঈর্য্যাবশে নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণের উন্নতি চেষ্টায় বাধা প্রদানে কৃতসংকল্প। অনেক নিম্ন স্তরের ব্যক্তিও হিংসাবশে অপেক্ষাকৃত উন্নতস্তরের ব্যক্তিদের উন্নতিপথে বাধা দান করে। উচ্চস্তরের ব্যক্তিগণকে টানিয়া নামান কিংবা নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণকে দূরে ঠেলিয়া উন্নতির চেষ্টা প্রকৃত জাগরণ নহে, বিকারগ্রস্ত রোগীর আস্ফালনবৎ মৃত্যু-সূচক। উহা তমোভাবজ, উহাতে মৃত্যুর সকল লক্ষণই বর্ত্তমান। উহাতে প্রেমের পরিবর্ত্তে আছে হিংসা, আত্মোন্নয়নের পরিবর্ত্তে আছে আত্মহনন-চেষ্টা। জাতীয় আন্দোলন অর্থে যদি হিংসা হয়, ও তাহাতে সমাজের অন্যান্য অঙ্গসমূহ হইতে বিচ্যুতি ঘটে, তবে তাহাতে পচনশীল দেহের অবস্থা আনয়ন করিবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। সুস্থ দেহ যেমন প্রতি অঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিমূলক কার্য্য-তৎপর, প্রকৃত জাতীয় উন্নতিও তদ্বৎ। উন্নতি অর্থে এ নহে যে পদ বা হস্ত খুব বলশালী হইয়া মস্তক বা উদর প্রভৃতি অন্য অঙ্গাদিকে চূর্ণ করিবে কিম্বা সমস্ত দেহ হস্ত, পদ বা উদরের একটিতে পরিণত হইবে। সমগ্রজাতির জন্য একটী কর্ম্মকারশালা বা কুম্ভকারশালা প্রস্তুত করিয়া জাতীয় জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদিত হইবে না।

জাতীয় উন্নতি অর্থে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির এবম্বিধ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা সর্ব্বথা করণীয়।

গতি অর্থে বাধাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসরণ। যেরূপ আছি—এই যে অবস্থারূপ সীমা আমাকে বেষ্টন করিয়া আছে, উহাকে অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠতর অবস্থায় গমনই উন্নতি।

সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার উদ্দেশ্য—নিরাপদে অল্প সময়ে ও সহজভাবে প্রত্যেকের ও সমষ্টির জীবনের চরম লক্ষ্য লাভ। যে সমাজ ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের অবকাশ সুবিধা ও সহায়তা প্রদানে যতদূর পারক সে সমাজ তত উন্নত। এক একটি জাতি বা বর্ণ লক্ষ লক্ষ মানবের দ্বারা গঠিত, এই লক্ষ লক্ষ মানব বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন। সকলকে একই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া চিরক্ষুণ্ণ মার্গে একই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চালিত

করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইবার চেষ্টা দ্বারা তাহাদের অন্তর্নিহিত চৈতন্য-শক্তিকে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে প্রাণহীন যন্ত্রবৎ ব্যবহার করা হয়। এরূপ ব্যবহারে তাহাদের জীবনীশক্তির বিকাশের পথে বাধা দেওয়া হয়, ফলে তাহারা যন্ত্রবৎ জড়ভাবাপন্ন হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে বাধ্য হয়। মানুষ অনন্ত শক্তির আধার, তাহার অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তির জাগরণ দ্বারা তাহার পূর্ণ-বিকাশ সাধনই জীবনের সার্থকতা। মানুষ যাহা পারে নাই মানুষ তাহা করিতে চেষ্টাশীল। সে শক্তির তনয়, অমৃতের উৎস, তাহার শক্তির সীমা কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। যে দিন সে তাহার শক্তির সীমা অনুমান করিবে সেইদিন তাহার পতনের আরম্ভ। অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ কার্য্যে সুশৃঙ্খলা অতীব প্রয়োজনীয়, নতুবা অযথা শক্তি-ক্ষয়ে লক্ষ্য-প্রাপ্তি অসম্ভব হয়। সমাজ-জীবনের এই শক্তির স্ফুরণ ও নিয়মন সমাজ-নেতার কার্য্য। বিভিন্ন মানব বিভিন্ন স্তরের, প্রত্যেকের লক্ষ্য অনন্ত শক্তির সীমাহীন প্রকাশ। প্রত্যেকের স্বীয় অবস্থা হইতে চরম লক্ষ্য লাভই তার ধর্ম্ম। এই লক্ষ্যলাভ যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য সেইরূপ সমাজের অপর সকলের কর্ত্তব্য তাহার এই কার্য্যে সহায়তা করা। সমাজ যদি তাহা না করে তবে সে সমাজ আত্মদ্রোহী, তাহার প্রায়শ্চিত্তও ভীষণ। আর্য্যশাস্ত্রকারগণ গুণকর্ম্মানুসারে মানবগণকে চারি শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। তমঃ, রজস্তমঃ, সত্ত্বরজঃ, সত্ত্ব গুণাধিক্য বশতঃ শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ। তমঃ হইতে রজস্তমঃ, রজস্তমঃ হইতে সত্ত্বরজঃ এবং সত্ত্বরজঃ হইতে সত্ত্বে উন্নয়নই সমাজ ধর্ম্ম। সমগ্র মানব সমাজের ন্যায় চৈতন্যের স্ফুরণের ক্রমানুসারে ব্যষ্টি জীবনকেও চারি ভাগ করা সম্ভব। জন্মকালীন জড়-শক্তির আধিক্যে সে শূদ্র। জড় শক্তিকে অতিক্রম করিয়া চৈতন্য শক্তির বিকাশানুসারে ব্যষ্টি জীবন বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ। শূদ্রাবস্থায় সে মূর্খ, জড়-প্রকৃতি-সম্পন্ন চৈতন্য শক্তি প্রায় অপ্রকাশিত, তখন সে পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী। বৈশ্যাবস্থায় সে জড়কে পরাজয়োপযোগী বল ও গুণ সংগ্রহে তৎপর। ক্ষত্রিয়াবস্থায় জড় শক্তির উপর চৈতন্য শক্তির মহিমা ও প্রাধান্য স্থাপনার্থ জড় শক্তি সহ যুদ্ধ-নিরত। ব্রাহ্মণাবস্থায় চৈতন্য শক্তি পূর্ণজয়ী, পূর্ণবিকশিত। তখন সে শান্ত, বুদ্ধ, মুক্ত; জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত। আত্মার পূর্ণ বিকাশের জন্য দেহ ও মনের পূর্ণতা প্রয়োজনীয়। একথা ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন উভয়ত্র প্রযুজ্য। কোন জাতিকে বিশ্ব মানবের মাঝে তাহার অস্তিত্ব রাখিতে হইলে, মঙ্গলের পথে চালিত করিতে হইলে, প্রত্যেকে যাহাতে

তাহার স্বধর্ম্মানুসারে জীবনের পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারে তদনুযায়ী সুযোগ ও সহায়তা দান কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজ পরিবারের, দশের ও দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। সে নিজে যেমন তাহার পিতা মাতা সমাজ দেশ প্রভৃতির অতীত ও বর্ত্তমানের ফল স্বরূপ, তাহার প্রভাবও সেইরূপ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে নিজ পরিবার, দশের ও দেশের উপর কার্য্যকারী হয়। এই হেতুই সে নিজের ও অপরের জন্য কার্য্য করিতে দায়ী, এবং এইরূপ সেবা দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের উন্নতি সম্ভব। জগতের চরমলক্ষ্য বৈদিকের ভাষায় ব্রাহ্মণত্ব, বৈষ্ণবের ভাষায় বৈষ্ণবত্ব, বৌদ্ধের ভাষায় বুদ্ধত্ব। স্ত্রী-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলকেই এই ব্রাহ্মণ হ'তে হবে। সমাজ তার নিজ জীবনের রক্ষণ ও পরিপুষ্টির জন্য প্রত্যেকে যাহাতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে তাহা করিবে, নচেৎ তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। গুণানুসারে মানব-জীবনের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ণয় না করিয়া বংশানুক্রমিক মানুষের ছোট ও বড় ভেদ নির্ণীত করিলে সত্যকে পদদলন করা হইবে ; ও তাহাতে চির-প্রকাশমান আত্মাকে অস্বীকার করা হইবে। তৎফলে মিথ্যার পূজক ভগবদ্‌দ্রোহী সমাজদ্রোহী নিজের ও সকলের ধ্বংসের পাপে পতিত হইবে। তাই আমাদের প্রত্যেককে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হইবে এবং অপরকে তৎলাভে সাহায্য করিতে হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞ বিচারক, ব্রহ্মজ্ঞ শাসক, ব্রহ্মজ্ঞ শিক্ষক, ব্রহ্মজ্ঞ কৃষক ব্যবসায়ী, ব্রহ্মজ্ঞ শ্রমজীবী আবির্ভূত হইবে। তখনই পূর্ণ সত্যযুগ আসিবে। তখন সকল দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যাইবে। সমাজ-জীবনে প্রেমের একতা, জীবনের একতা আসিবে, অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা হইবে। এইরূপ ভিতর হইতে আমাদিগকে অদ্বৈতের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া অদ্বৈতের একতা আসিবে। এস ভাই সমাজ-সেবক, কে আছ কোথায়, অগ্রসর হও, পরম পিতার নামে সমাজ ও ব্যষ্টি জীবনে অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হও।



মরণে ভয় কেন ?

লেখক—শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চির-স্থির কবে নীর হায়রে জীবন-নদে ?

মধুসূদন।

ভয় আমাদের শরীরের সহজাত অন্তঃকরণের ভাব বা বৃত্তিবিশেষ। কাম ক্রোধ লোভ যেমন মনের বৃত্তি, ভয় ও লজ্জাদিও সেই প্রকারের। ঈশ্বর আমাদের অন্তরে ও বাহিরে ব্যবহারের জন্য যত কিছু দিয়াছেন সকলেরই সুব্যবহারে সুফল বা সুখ এবং অপব্যবহারে দুঃখ পাইতে হয়, ইহা সুনিশ্চিত। আমরা যে বিচারশক্তি দ্বারা কাম, ক্রোধ, লজ্জা, ভয়, আহার, নিদ্রা লোক-ব্যবহারের যথাযথ নির্ব্বাচন করিতে পারি তাহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি উন্নত এবং নির্ম্মল হইলে তাহার নাম জ্ঞান। ঈশ্বর-বিষয়ক যে জ্ঞান তাহার নাম তত্ত্ব-জ্ঞান। তত্ত্ব-জ্ঞানী সর্ব্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব দর্শন করেন, সর্ব্বকার্য্যে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব উপলব্ধি করেন, তাঁহারই লীলা বলিয়া মনে করেন। তত্ত্ব-জ্ঞানী জন্মকে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করেন না, স্থিতিতেও কোন সুখ দুঃখ অনুভব করেন না, মরণও কোন ভয়াবহ বলিয়া মনে করেন না। তিনি জানেন সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বভাবে হইতেছে, থাকিতেছে, যাইতেছে; ইহা সেই একেরই লীলা বা অভিনয় মাত্র।

অবিদ্যার আশ্রিত মায়ামোহ-জালে জড়িত মানব—আমরা নানা প্রকারে মৃত্যুকে একটা ভয়াবহ ব্যাপারের অভিনয় বলিয়া মনে করিয়া আতঙ্কে কম্পিত হই। মৃত্যু-যন্ত্রণা বা যমযাতনা বলিয়া একটা কল্পিত ধারণা আমাদের মনে জাগরূক থাকিয়া তৎকালে ভগবানের নাম আমাদিগকে বিস্মৃত করাইয়া দেয়। মৃত্যুর পুর্ব্বেও জীবিতকালে অনেকে ত এমন অনেক পীড়ায় পীড়িত হই, যাহার যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা হয়। শূল-রোগীর বেদনার ক্লেশ, শ্বাস-রোগীর শ্বাসের যাতনা অপেক্ষা অনেকে অল্প ক্লেশে দেহ-ত্যাগ করিয়া থাকেন। গুর্ব্বিণী প্রসব-যাতনায় বলিতে বাধ্য হন ভগবান আর যেন গর্ভ ধারণ করিতে না হয়। অনেকে যে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন তাঁহারা ত কোন যাতনা অনুভব করেন বলিয়াই বোধ হয় না। তবে শরীর ধারণ করিলেই দৈহিক ক্লেশ ভোগ করিতে

হয়। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে গুরুতর ব্যাধির যাতনা অপেক্ষা মৃত্যু-যাতনা বলিয়া পৃথক আর একটা অন্য প্রকারের যাতনা কিছুই নাই। ইহা সংস্কার জন্য একটা ভয় মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, আর এক প্রকারের মৃত্যু-ভীত আছেন—যাহারা এই সংসারকেই চির বাসস্থান বলিয়া মনে করেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি তাঁহারা যেন চিরকালই ভোগ করিবেন। মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহাদের "ভগবান হায় কি হইল!" এই আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া তাঁহারা ভয়ে আকুল হইয়া পড়েন। স্ত্রী বলেন—"তুমি কোথায় চ'ল্লে, আমারে কি ব'লে যাও?" পুরুষও ভাবেন "তাইত আমি কোথায় চল্লেম, ইহাদের কারে দিয়ে যাই, অতঃপর ইহাদের কে দেখ্‌বে।" এই চিন্তায় যে একটা যাতনা হয়, ইহা মৃত্যু-যাতনা নয়, ইহা আত্মগ্লানি মাত্র। এই গ্লানি জ্ঞানীর হয় না, ইহা সর্ব্বসাধারণের হয় না, সুতরাং ইহা মৃত্যুরই যাতনা জন্য ভয় নয়। সুলতান মামুদ যখন ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া গজনী নগরকে ইন্দ্রভবন সদৃশ সজ্জিত করিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন আরও কত কি করিব। মৃত্যু সময় যখন দেখিলেন কয়দিনের সুখের জন্য এত নরহত্যা, এত নগর ধ্বংস করিয়াছি, তখন তাঁহার আত্মগ্লানি হইয়াছিল, ইহা মৃত্যু-যাতনা নয়। হয়ত ঈদৃশ ব্যক্তির দেহাবসান অক্লেশেও হইতে পারে। পাপ-পরায়ণ মীরণের মৃত্যু বজ্রাঘাতে হইয়াছিল। বজ্রাঘাত অপেক্ষা যন্ত্রণাহীন ত্বরিত মৃত্যু আর কোন প্রকারের হইতে পারে না। অতএব মৃত্যুই একটা ভয় নয়।

তৃতীয়তঃ, যাহারা আত্ম-বিস্মৃত অর্থাৎ আমি কে, কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, কোথায় যাইব, ইহা যাহারা কখন মনেও চিন্তা করেন নাই, তাঁহারা মৃত্যুর পর কি হইবে এই চিন্তায় মৃত্যুকালে কাতর হন। শ্মশানে যাহাদের মনে বৈরাগ্য আসে না, স্ত্রী পুত্র কন্যার মৃত্যু বা প্রতিবেশীর মৃত্যু-দর্শনে যাঁহাদের আপন ভবিষ্যৎ মনে হয় না—অথবা মনে হইয়াও স্থান পায় না, তাঁহারা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়া পরবর্ত্তী ভাবনায় কাতর হন। ইহা তাহাদের অপরিণাম-দর্শিতার ফল মাত্র। ইহার নাম মৃত্যুর যন্ত্রণা বলা যায় না। পাপাত্মা মৃত্যুশয্যায় আত্মকৃত দুষ্কার্য্য স্মরণ করিয়া পরকালে দণ্ড-ভয়ে যে ভীত হয়, তাহা তাহার আত্মগ্লানি—অনুতাপ ইহ জীবনেই প্রায়শ্চিত্ত করে, মৃত্যু সময় সেই সমস্ত স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া ক্লেশ দেয় মাত্র। মৃত্যু তাহার কারণ নয়। মৃত্যুই যদি যাতনা হইত, তাহা হইলে পাপী পুণ্যবান সকলেই মৃত্যুসময়

একটা যাতনা অনুভব করিত। অনেক সাধু-পুরুষ যোগী ঋষিরা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া থাকেন।

প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা মৃত্যুকে স্থানান্তর গমন ভিন্ন আর কিছু মনে করেন না। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

গীতা ২য়। ২২ শ্লোক।

যেমন আমরা পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করি, তদ্রূপ আত্মাও এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ আশ্রয় করেন। মৃত্যু আত্মার দেহান্তর গমনের দ্বার স্বরূপ মাত্র। পাপী ইহা মনে করিয়া মৃত্যুকে ভয় করিতে পারেন যে মরিলেই ত আমার দুষ্ক্রিয়ার ফলভোগ করিতে হইবে। তাহা নয়, দুষ্ক্রিয়া অথবা সৎক্রিয়ার ফল ইহ বা পরলোকে যেখানেই থাক, ভোগ করিতেই হইবে। কর্ম্মফল ভোগ ব্যতীত অব্যাহতি নাই।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি॥

ভোগ ভিন্ন শত কোটী কল্পকালেও কর্ম্মক্ষয় হয় না; কৃত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। তজ্জন্য মৃত্যুকেই একটা ভয়ের কারণ মনে করা কর্ত্তব্য নয়।

আমরা দেহাত্মবাদী অবোধ মানব, মৃত্যুকালে একে শারীরিক অসুস্থতা, তাতে রোরুদ্যমান স্ত্রী-পুত্র-স্বজনগণের বিলাপ, সেই সঙ্গে কল্পিত মৃত্যুভয়ে বিহ্বল হইয়া আমরা এমনি আত্মহারা হইয়া পড়ি, যে ভগবানের অমৃতময় উপদেশ যাহা স্মৃতিপথে থাকিলে আমরা সদ্‌গতি লাভ করিতে পারি তাহা আদৌ আমাদের মনেই আসে না। ভগবান বলিতেছেন—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মা মনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

গীতা ৮ম। ১৩ শ্লোক।

ওঁ এই এক অক্ষর ব্রহ্মের নাম। এই এক অক্ষর উচ্চারণ ও চিন্তনপূর্ব্বক যিনি দেহত্যাগ করিতে পারেন তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন্। ইহা অতি সহজ

কথা। কিন্তু আমরা তৎকালে অমূলক মৃত্যুভয়ে এমনি আত্মহারা হইয়া পড়ি যে ভবিষ্য জন্মের শুভ চিন্তাটী তখন আমাদের মনে আসে না।

ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
গীতা ৮ম অ ৫ শ্লোক।

ভগবানের কি কৃপার কথা—এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—যে ব্যক্তি আজীবন ভগদুপাসনায় কালযাপন করেন তিনি ত ভগবানকে লাভ করিতে পারিবেনই, কিন্তু কেহ যদি আজীবন ভগবানকে বিস্মৃত থাকিয়াও মরণ সময় তাঁহাকে একাগ্রমনে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারেন তিনিও ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। আমরা এমনই ভাগ্যহীন, জ্ঞানহীন, সংসার চিন্তায় অবসরহীন, যে মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ত ভগবচ্চিন্তা মনে করিতে পারি না, অধিকন্তু যখন সংসার হইতে চলিয়া যাইতেছি তখনও মৃত্যুভয়ের একটা আতঙ্ক কল্পনা করিয়া ভয়ে এমনি বিহ্বল হইয়া পড়ি যে তৎকালে ক্ষণকালের জন্যও একান্তমনে ভগবদ্ ভাবনা মনে আসে না। সুতরাং জন্মান্তরে দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

মরণ-ভীতি আমাদের এমনি সংস্কারাবদ্ধ যে যাহারা ঈশ্বরতত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞ, সংসারের অনিত্যতা যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাদৃশ মহাত্মগণের রচিত ২।১টী গানে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ভাব এবং আসন্ন সময়ে স্ত্রী পুত্রাদির মমতা জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও দুঃখিত হই।

একটী গানে আছে—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,
সকলেতে কবে কথা তুমি রবে নিরুত্তর।
গৃহে হায় হায় শব্দ,
সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ তব হিম কলেবর
যার প্রতি যত মায়া
কিবা পুত্র কিবা জায়া
তার মুখ দেখে তত হইবে কাতর!

ঈদৃশ গান ধীর বুদ্ধিমান ব্যক্তির অন্তরেও মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছায়া উপস্থিত করিয়া ভীতির সঞ্চার করে।

আর একটী গান—

আমায় কোথায় আনিলে ?
চারিদিকে অন্ধকার,
তরণী না দেখি আর,
ম'লেম বুঝি এইবার ঘূর্ণিত জলে।
কোথা রইল পিতা মাতা
কে করে স্নেহ মমতা
প্রাণ প্রিয়ে রইলে কোথা বন্ধু সকলে।

মহাজন ব্যক্তি যদি আসন্নকালে ঈশ্বর বিস্মৃত হইয়া স্ত্রী পুত্রাদির জন্য ব্যাকুল হন, তাহা হইলে প্রাকৃত জনের ত কথাই নাই।

আমরা কোন তত্ত্বোপদেশপূর্ণ পুস্তকে পড়িয়াছি—"এক দম্পতী জাহাজে চড়িয়া ইউরোপের দিকে যাইতেছিলেন। পথে হঠাৎ ঝড় উঠিল, সমুদ্র ভীষণ আকার ধারণ করিল। জাহাজ ডুবু ডুবু হইল, আরোহিগণ আসন্ন মৃত্যুর ভয়াবহ চিন্তায় কাতর ও বিষণ্ণ হইলেন; কিন্তু উক্ত দম্পতীর মধ্যে স্ত্রী দেখিলেন, তাঁহার স্বামী কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। স্ত্রী স্বামীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বামী গম্ভীরভাবে আপন পকেটস্থ পিস্তল বাহির করিয়া স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধারণ করিলেন। স্ত্রী বলিলেন "এ আবার কি ? তোমার হয়েছে কি ?" স্বামী বলিলেন "পিস্তল দেখিয়া ভয় হয় না ?" স্ত্রী উত্তর করিলেন "তোমার হাতের পিস্তল দেখিয়া আমার ভয় হইবে কেন ?" স্বামী বলিলেন "তবে প্রেমময় জগৎস্বামীর হাতের ঝড় তুফান দেখিয়া আমিই বা ভয় করিব কেন ?"

যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী সকল কাজেই মঙ্গলভাব দর্শন করেন, তিনি কখনও ঈশ্বরের নিয়মিত মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইবেন না। তাই বলি ভাই মানব! মৃত্যু আর কিছুই নয়; একই পিতৃরাজ্যে একস্থান হইতে স্থানান্তর বদলী মাত্র। তোমার কর্ম্মফল অনুসারে সেস্থান তোমায় সুখকর হইতেও পারে। সর্ব্বকার্য্যে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবে যাঁহার বিশ্বাস, তাদৃশ ধার্ম্মিক পুরুষ কিরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত, আমরা এ স্থলে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ পারসিক কবি

হাফেজ হইতে অনুবাদিত কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের রচিত একটী কবিতা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। কবিতাটী এই—

ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন
অনিত্য-সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ,
যারা এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে
চির-বাসস্থান বলি ভাবে মনে মনে,
পাপরূপ পিশাচ যাদের হৃদাসন
করি আত্ম-অধিকার আছে অনুক্ষণ,
পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয়,
পরমেশ-প্রেমে মন মুগ্ধ যার নয়,
হেরিলে নয়নে এই ভ্রূকুটী তোমার
তাহাদেরি হয় মনে ভয়ের সঞ্চার।
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার
ভ্রূভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার ?
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন।
যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে
লোলুপ নিয়ত মম মন-মধুকরে,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু ! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত।
কোনরূপে তোমারে করিলে অতিক্রম,
যাইব আনন্দে যথা সেই প্রিয়তম।

মৃত্যুর অনন্তর কালের ভাবনায় আকুল হইয়া যাহারা অন্ধকার দর্শন করেন, কোথায় ছিলাম, কোথায় যাব, কি হবে, ইহার একেতর নির্ণয় করিতে না পারিয়া মৃত্যুকে বিভীষিকাময় মনে করেন, তাঁহাদের প্রবোধের জন্য সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন অতি সুন্দর জ্ঞান-গর্ভ সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই গানটী বেদের সার সংগ্রহ বলিলেও হয়। গানটী এই—

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে,
এই বাদানুবাদ করে সকলে।

কেহ বলে ভূত প্রেত হবি,
কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি,
কেহ বলে সাযুজ্য মিলে।
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য
মান্য ক'রে সব খোয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করেছ
পঞ্চ জন মিলে জুলে,
সে যে সময় হ'লে আপনা আপনি
যে যার স্থানে যাবে চ'লে।
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই,
তাই হবি রে নিদান-কালে;
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়
জল হয়ে সে মিশায় জলে।

পাঠক ! আমরা বলি মৃত্যুভয়ে কম্পিত হইবার কোন কারণ নাই, প্রয়োজনও নাই—

সম্মুখে অজ্ঞান-সিন্ধু ভাসে কৃষ্ণ-পদতরি,
এই তীরে সন্ধ্যা উষা অন্য তীরে মুগ্ধ করি।

নবীনচন্দ্র।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভগবান যে বলিয়াছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

এই ভগবদুক্তি স্মরণ রাখ, স্মরণ রাখার একমাত্র উপায় অভ্যাস-যোগ—

অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥

গীতা ৮ম অ ৮ শ্লোক।

অভ্যাসই সতত স্মরণের অন্তরঙ্গ সাধন। অভ্যাস-স্বরূপ উপায়যুক্ত এবং অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা পরম পুরুষ ভগবানকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকে লাভ করা যায়।

দেহ-ত্যাগের সময় যাহাতে ঈশ্বরচিন্তা হয় আগে থাকিতেই তাহার উপায় করিতে হয়। সেই উপায় অভ্যাস-যোগ। অভ্যাসই জীবের স্বভাবে পরিণত হয়। নিত্য নিয়মিত অভ্যাস ব্যতীত সংস্কার জন্মে না। দৃঢ় সংস্কার ব্যতীত স্বভাব-শক্তির উপর আধিপত্য জন্মে না। ঈশ্বর-চিন্তা অভ্যাস করিলে শেষের দিনেও তাঁহাকে মনে পড়িবে। যদি সাধনার অবকাশ না হয়, হাতে কাজ করিতে থাকিয়াও মুখে ভগবানের নাম কর। নাম করিতে কোন নিয়ম আবশ্যক নাই; কোন বিচার করিবার আবশ্যক নাই, যত অধিক কাল সম্ভব যত অধিকবার সম্ভব নাম কর। বসিয়া থাকিতে থাকিতে নাম কর, যখন দাঁড়াইয়া থাক নাম কর, যখন শুইয়া থাক তখনও নাম কর; নাম করিতে শুচি অশুচি বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, কালাকাল নিয়ম নাই, স্নানে আহারে ভ্রমণে মলমূত্র-ত্যাগে সর্ব্বদাই নাম করা যায়। স্নান আহার প্রভৃতি অবশ্য-করণীয় কর্ম্মগুলি কোন না কোন প্রকারে ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া ভাল। তাহা হইলে ভগবৎ-স্মরণ সুসাধ্য হয়। এই জন্যই—প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং" এবং "শয়নে পদ্মনাভঞ্চ" ইত্যাদি প্রাতরুত্থান হইতে রাত্রি-শয়ন পর্য্যন্ত যদি ভগবানের নাম উচ্চারণ করা যায়—কেবল উচ্চারণ করিলে হইবে না, ঐ সকল নাম যে ভগবানেরই তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে, ইহাই অভ্যাসযোগের সূত্র। তাহা হইলে মানব সংসারে থাকিয়াও মৃত্যুকালে ভগবানকে স্মরণ রাখিতে সমর্থ হয়; মৃত্যুভয় তাহার কাছে আসে না। তাই বলি মরণে ভয় কেন?

উদয় ও অস্ত।

(রায় শ্রীযদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি বাহাদুর)

উদয় ও অস্তে
নাহি কোন ভেদ,
যদিচ বিভিন্ন তারা।
আঁধারে জনমি
আলোকে বিলীন
উদয় উদয়াচলে।

আলোকে জনমি
আঁধারে বিলীন
অস্ত যবে অস্তাচলে।
যদিচ অভিন্ন
তবু নাহি জানে
তারা কভু পরস্পরে ;
দিবা নিশি থাকি
মাঝেতে তাদের
পৃথক করিয়া রাখে।
তারা নাহি জানে
কভু পরস্পরে
বিধির নিয়ম-বশে—
একে নাহি জানে
অপরের স্বস্তি,
স্বর্গীয় জ্যোতির ভাতি।
কেবা জানে বল
কোন্ দূর দেশে
দুই জনে এক হবে।
জনম মরণ
উদয়াস্ত-প্রায়
অভিন্ন অথচ ভিন্ন।
কেবা জানে বল
কোন দূরদেশে
দোহার মিলন হবে।
কাল-স্রোতে ভাসি
চলি যায় দোহে
নিয়মে নিবদ্ধ হ'য়ে।
এক দিব্য জ্যোতি
দুই ভাগ হয়
জনম মরণ নামে।

নীলাম্বরের কথা।

বহুরূপ তারা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ।)

লেখক—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম্, বি, এ, এ,

চৈত্র মাসের হিন্দু-পত্রিকায় আমরা দেখাইয়াছি যে ১৯২১ খৃঃ অঃ সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর কিরীট রাশির R. তারাটী একবার ক্ষীণ জ্যোতিঃ হইয়াছিল, তখন উহার উজ্জ্বলতা ৯·৩ স্থূলত্বে পরিণত হয়। তৎপরে ১৯২৩ খৃঃ অঃ ৯ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ঐ তারাটী সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত প্রায় পূর্ণ জ্যোতিঃ উপভোগ করিয়াছে ঐ দেড় বৎসরের মধ্যে উহার জ্যোতিঃ যে যে সময়ে হ্রাস হইয়াছিল তাহার বিবরণ—।

সন ও তারিখ		স্থূলত্ব	পর্য্যবেক্ষক	স্থান
১৯২২।	১ এপ্রিল	৭·০	স্ক্যাগ	
	১৫ ,,	৭·০	ওয়াটসন্	আমেরিকা।
	২৮ জুলাই	৭·০	ক্লফ	
	২৯ ,,	৬·৮	ল্যাকিনী	ইটালি।
	৩১ ,,	৭·০	ক্যাণ্ডা	জাপান।
	৭ আগষ্ট	৬·৯	নাকামুরা	জাপান।
	৮	৬·৯	ল্যাকিনী	ইটালি।
	১৫ ,,	৭·০	গডফ্রে	আমেরিকা।
	২২	৬·৯	ক্লেমেন্ট	

তৎপরে ১৯২৩ খৃঃ অঃ ৯ই এপ্রিল উহার জ্যোতিঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে উহার পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ—

সন ও তারিখ		স্থূলত্ব।
১৯২৩।	৬ এপ্রিল	৬·২৩
	৯ ,,	৬·৩২
	১৪ ,,	৬·৪০
	১৬ ,,	৬·৬০
	১৭ ,,	৬·৮০
	১৮ ,,	৭·০০

১৯	এপ্রিল	৭.১০	
২০	”	৭.১০	
২২	”	৭.৩০	
২৪	”	৭.৩০	
২৫	”	৭.৩০	
২৬	”	৭.৩০	
২৭	”	৭.৩০	
২৯	”	৭.৪০	
১	মে	৭.৭০	
২	”	৭.৮০	
৩	”	৭.৮০	
৪	”	৯.০০	
৭	”	৯.৮০	হইতেও ক্ষীণ জ্যোতিঃ, অস্পষ্ট দৃশ্য।
৯	”	১০.৯০	”　　”
১০	”	১০.৯০	হইতেও ক্ষীণ জ্যোতিঃ এবং আমাদের ৩ ইঞ্চি দূরবীণে অদৃশ্য।
১২	”	১০.৯০	”　　”
১৩	”	১১.৮০	”　　”
১৭	”	১১.৮০	”　　”
৩১	”	১১.৪০	হইতেও ক্ষীণ জ্যোতিঃ কিন্তু অতি কষ্টে দেখিতে পাওয়া যায়।
১	জুন	১১.৩০	আকাশ নির্ম্মল থাকায় দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ৬ই এপ্রিল উহার জ্যোতিঃ ৬.২৩ ছিল পরে ৯ই এপ্রিল ৬.৩২ হয় সুতরাং ৬ই হইতে ৯ই তারিখের মধ্যে যে কোন সময়ে উহার জ্যোতিঃ কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরে ১৯শে ও ২০শে দুই দিন ৭.১০ স্থূলত্বে সমভাবে থাকিয়া ২২শে তারিখে আবার .২ স্থূলত্ব কমিয়া ৭.৩ স্থূলত্বে পরিণত হয় এবং ২৭শে পর্য্যন্ত পাঁচ দিন সমভাবে থাকে পরে ৭ই মে পর্য্যন্ত আবার কমিয়া ৯.৮০ হইতেও ক্ষীণ জ্যোতিঃ হয় ও আমাদের

দূরবীণে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই সময়ে আকাশের অবস্থা বেশ ভাল ছিল না, আকাশের দূরতম প্রদেশে ঘনিভূত জলকণা বিদ্যমান থাকাতে আমরা আর উহাকে দেখিতে পাই নাই, পরে ৩১শে মে তারিখে উহাকে অতি কষ্টে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল ঐ দিনও আকাশ তত নির্ম্মল ছিল না, ১লা জুন তারিখে আকাশ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল থাকায় এবং উহার জ্যোতিঃও ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা উহাকে বেশ ভালরূপেই দেখিতে পাই, এক্ষণে উহা ক্রমশই স্থূলতর হইতেছে। শীঘ্রই উহা স্বাভাবিক স্থূলত্ব ৬·২০ প্রাপ্ত হইয়া সুধুচক্ষে দেখিবার যোগ্য হইবে। *

ধনু রাশির RY. তারাটী ১৯২২ খৃঃ অঃ নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত অদৃশ্য থাকিয়া সূর্য্যসান্নিধ্যবশতঃ পর্য্যবেক্ষণের অযোগ্য হইয়াছিল পরে পূর্ব্বাকাশে উহার উদয় হওয়ার পর হইতে আমরা উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে অদ্যপিও ঐ তারাটী অদৃশ্য আছে। †

হ্রদ-সর্প-রাশির R. তারাটী ২৬শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সুধুচক্ষে সুন্দর দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল ঐ দিন উহার স্থূলত্ব ৬·১৫ ছিলে পরে ১৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত আমরা উহাকে দ্বিচক্ষু-দূরবীণে (Binocular) দেখিয়াছি ঐ দিন উহার স্থূলত্ব ৬·৬৩ ছিল, এই সময় হইতেই আকাশের অবস্থা মন্দ হইতে আরম্ভ হয় সুতরাং Binocular এ আর উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, আকাশের অবস্থা ভাল থাকিলে আমরা ৭·৫ স্থূলত্বের তারা কখনও কখনও ৮·২ স্থূলত্বের তারাও Binocular এ দেখিতে পাইয়া থাকি। ২রা জুন তারিখে আমরা দূরবীণে উহাকে ৭·৪২ স্থূলত্বে পরিণত হইতে দেখিয়াছি এক্ষণে ঐ তারাটী ক্রমেই ক্ষীণ জ্যোতিঃ হইতেছে, আগামী ১৮ই আগষ্ট উহার ক্ষীণতম জ্যোতিঃ ৯·৮ স্থূলত্বে পরিণত হইবার কথা।

মার তারাটী (Mira or o ceti) ২রা এপ্রিল স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইবার কথা ছিল কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই (চৈত্র মাসের হিন্দু পত্রিকায়) বলিয়াছিলাম যে যেরূপ দ্রুত উহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ১৮। ২০ দিন পূর্ব্বেই উহা চরম উজ্জ্বলতা লাভ করিবে। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা দেখিয়াছি যে ৬ই মার্চ্চ তারিখে উহা চরম উজ্জ্বলতা ২·৬৩ স্থূলত্ব লাভ করিয়া ১৩ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত পূর্ণ জ্যোতিতে বিদ্যমান ছিল পরে উহার জ্যোতিঃ

* ১লা আগষ্ট তারিখে উহার উজ্জ্বলতা ৬·১ দেখা গিয়াছে।

† ১লা আগষ্ট তারিখে উহার উজ্জ্বলতা ৯·৫ দেখা গিয়াছে।

আবার ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। সূর্য্য সান্নিধ্য নিবন্ধন ঐ সময়ে উহার পর্য্যবেক্ষণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়াছিল, তথাপি আমরা ২৪শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত উহাকে ২'৯০ স্থূলত্বে পরিণত হইতে দেখিয়াছিলাম। তৎপরে আর উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, আজকাল পূর্ব্বাকাশে উহার উদয় হইয়াছে বটে কিন্তু শেষ রাত্রে আকাশের অবস্থা ভাল না থাকায় আমরা উহাকে এখনও পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই। পরন্তু পূর্ব্ব বা পশ্চিম গগনে তারাটী যখন চক্রবাল রেখার দিকে হেলিয়া থাকে (Elongated position) তখন দূরবর্ত্তী অন্যান্য তারার জ্যোতির সহিত তুলনা করিয়া উহার জ্যোতিঃ নিরূপণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আবার উষা বা গোধূলিকালে অর্থাৎ নিশাবসান-কালে রাত্রির ঘনান্ধকার তিরোহিত হইলে ও সন্ধ্যায় আকাশ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বে তারাগুলি স্বাভাবিক স্থূলত্ব হইতে ছোট দেখায়, তজ্জন্য ঐ সময়ে উহাদের পর্য্যবেক্ষণ ফলপ্রদ নহে।

মকরাশির SS. তারাটী ১৯২১ খৃঃ অঃ ১লা অক্টোবর হইতে ১৯২২ খৃঃ অঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে সাতবার উজ্জ্বলতম জ্যোতিতে উপনীত হইয়াছিল; উহার পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ—

সন ও তারিখ।		স্থূলত্ব।	পর্য্যবেক্ষক।	স্থান।	চরম উজ্জ্বলতা লাভের সময়।	চরম উজ্জ্বলতা উপভোগের সময়।
১৯২১।	৬ অক্টোবর	৮'৪	চন্দ্র	ভারতবর্ষ	২ দিন	১৪ দিন।
	২০ নভেম্বর	৮'৪	হোর্ল	আমেরিকা	১ "	৪ "
১৯২২।	১ ফেব্রুয়ারী	৮'২	টাউনলী	"	১০ "	১১ "
	২৩ মার্চ্চ	৮'৩	চন্দ্র	ভারতবর্ষ	৫ "	৬ "
	১ মে	৮'৩	"	"	৩ "	৩ "
	২৪ জুন	৮'২	নাকামুরা	জাপান	১ "	১২ "
	৬ সেপ্টেম্বর	৮'২	পেল্টেয়ার	আমেরিকা	২ "	৩ "

ঐ বৎসর মিথুন রাশির U. তারাটী তিনবার উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহার পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ—

১৯২১।	২৩ অক্টোবর	৯'২	ওয়াটার ফিল্ড	ব্রিটিশ কলম্বিয়া	১ দিন	১০ দিন।
১৯২২।	১৬ জানুয়ারী	৯'৩	"	"	১ "	১ "
	২৬ এপ্রিল	৯'২	চন্দ্র	ভারতবর্ষ	৩ "	১১ "

বীণা রাশির RX, তারাটী সুপ্রসিদ্ধ অঙ্গুরীয়ক নীহারিকা হইতে ৩৪ সেকেণ্ড পূর্ব্বে ও ১২ মিনিট দক্ষিণে অবস্থিত। ১৯০২ খৃঃ অঃ ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বাভেরিয়া প্রদেশের মিউনিক মানমন্দিরে Mr. Silbernagel কর্ত্তৃক গৃহীত দুই খানি ফটোগ্রাফের প্লেটে ১২·৫ স্থূলত্বে প্রথমে দেখা গিয়াছিল, তৎপূর্ব্বের বা পরের কোন ফটোগ্রাফের প্লেটে উহার কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই। তজ্জন্য Seeliger উহাকে নূতন তারা বলিয়া প্রচার করেন। তৎপরে wolf কর্ত্তৃক গৃহীত পনেরখানি ফটোগ্রাফের প্লেটেও উহার অস্তিত্ব খুজিয়া পাওয়া যায় নাই; কিন্তু তথাপি চারিদিকে খোজ খোজ রব পড়িয়া যায়, এবং Stratanow, Pickering, Hartwig, Hartmann, Williams, Wolf, Leavenworth, Perrine, Graff, Luther, Kustner প্রভৃতি মহা মহা জ্যোতিষ্ক তত্ত্ববিদ্ উহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। ঐ সময়ে Fleming নামা জনৈক মহিলা হারভার্ড মানমন্দির হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফের প্লেটসমূহ পরীক্ষা করিয়া প্রচার করিলেন যে ঐ তারাটী নূতন নহে, উহা একটী অনুজ্জ্বল বহুরূপ তারা (Faint Variable. Star) ঐ সকল ফটো প্লেট পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন যে ১৮৮৮ খৃঃ অঃ ৩রা জুন, ১৮৯৫ খৃঃ অঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ খৃঃ অঃ ২রা জুলাই এবং ১৯০২ খৃঃ অঃ ২৩শে আগষ্ট তারিখের ফটো প্লেটে উহার ছায়া পড়িয়াছে, Stratanow দেখাইলেন যে পশ্চিম তাতারের তাস্কন্দ (Taschkend) মান মন্দির হইতে গৃহীত অঙ্গুরীয়ক নীহারিকার তেত্রিশখানি প্লেটে উহার চিহ্ন আছে, Perrine ১৯০৩ খৃঃ অঃ এপ্রিল মাসে যন্ত্রযোগে উহার বিশ্লিষ্ট কিরণের ছায়া চিত্র (Photograph of the spectrum) গ্রহণ করিয়া দেখাইলেন যে সেখানে হাইড্রোজেন বাষ্প আছে আর ঐ তারাটী তক্ষক রাশির R. তারার (R. Draconis) জ্ঞাতি। এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ঐ তারাটী একই সরল রেখায় অবস্থিত তিনটী ক্ষীণ জ্যোতিঃ তারার মধ্যস্থলের তারা, উহার দক্ষিণস্থ তারাটী যুগল নক্ষত্র। ঐ বহুরূপ তারাটী ২৪৭ দিনে একবার করিয়া ১১·০ স্থূলত্ব হইতে ১৭·০ স্থূলত্বে রূপের পরিবর্ত্তন করে।

ফ্রান্সের Lyon মান মন্দির হইতে Dr. H. Grouiller সম্প্রতি সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে তাঁহারা ১১ই মে (১৯২৩) রাত্রিকালে বকরাশিতে একটী নূতন তারাব আবির্ভাব হইতে দেখিয়াছেন, উহার উজ্জ্বলতা ৫·০, অবস্থান R, A 21^{H} 20^{M}, Dec, 35^{O} 56^{I}. আকাশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ

থাকায় আমরা এ পর্য্যন্ত উহাকে দেখিবার সুযোগ পাই নাই। কৌতুহলী পাঠকগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। আমাদের পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। *

প্রার্থনা।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

জগদীশ !

(আমি) তোমারে ভুলিয়ে সংসারে মজিয়ে
পাইনু অশেষ দুখ।
সেই মহাপাপে, দগ্ধ তনু তাপে,
বিলুপ্ত হইল সুখ।
পুত্র দারা তরে, যে দুখ অন্তরে
পাইনু সংসারে এসে।
প্রভো, তব তরে, এ পাপ অন্তরে,
কেন না বিরহ পশে ?
কেন এ অন্তর, না হয় কাতর,
তোমার বিরহ-ভারে।
হায় ! অশ্রুবারি, শ্রীচরণ স্মরি
কেন না নয়নে ঝরে ?
(আমি) মায়ার কুহকে, মুগ্ধ ছিনু সুখে
এবে রে পরাণ কাঁদে।
আপনার দোষে, মজিলাম শেষে
পড়িনু দুস্তর ফাঁদে।
(এবে) ভাবি দেখি চিতে, আপন বলিতে,
তুমি বিনা নাহি কেহ।
দেহ পদতরি, মোহন মুরারি,
ঘুচাও আমার মোহ।

* আমরা বহু অনুসন্ধানে ঐরূপ কোন নূতন তারা দেখিতে পাই নাই।

(যেন) জনমে জনমে, ধরা স্বর্গধামে,
নরকে, যেখানে রই।
(যেন) নিমিষের তরে, অন্তরে বাহিরে
পদ ছাড়া নাহি হই।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকম্।

লেখক—শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি শান্তিঃ করুণা চ)

শান্তিঃ। (সাস্রং) মাতর্মাতঃ! ক্কাসি, দেহি মে প্রতি বচনং।
মুক্তাতঙ্ক কুরঙ্গ কাননভুবঃ শৈলাঃ স্খলদ্বারয়ঃ।
পুণ্যাস্থায়তনানি সন্তত তপোনিষ্ঠাশ্চ বৈখানসাঃ॥
যস্যাঃ প্রীতিরমীষু সাস্থ ভবতী চাণ্ডালবেশ্মোদরং।
প্রাপ্তা গৌঃ কপিলেব জীবতি কথং পাষণ্ডহস্তংগতা॥

অথবা অলং জীবন সম্ভাবনয়া, যতঃ;—
মামনালোক্য ন স্নাতি, ন ভুঙ্‌ক্তে ন স্বপিত্যপি।
ন ময়া রহিতা শ্রদ্ধা, ক্ষণার্দ্ধমপি জীবতি॥

তদ্বিনা শ্রদ্ধয়া শান্তের্মুহূর্ত্তমপি জীবনং বিড়ম্বনমেব তৎ সখি করুণে! চিতামারচয় যাবদচিরমেব হুতাশন-প্রবেশেন তস্যাঃ সহচরী ভবামি।

অনুবাদ।

(শান্তি ও করুণার প্রবেশ)

শান্তি। মা! মা! কোথায় তুমি, উত্তর দাও।
হিংসাহীন যে কাননে কুরঙ্গ-নিকর,
বিচরণ করে সদা নির্ভয়-অন্তর।
যে শৈল শিখর হ'তে ঝর ঝর করি,
পড়িতেছে অবিরত সুশীতল বারি।

বৈখানস-ব্রতধারী তপস্যা-নিরত ।
যোগী ঋষি বাস যথা করেন সতত ।
আর পুণ্য দেবালয়ে সদা যাঁর প্রীতি,
এবে পাষণ্ডের গৃহে করি অবস্থিতি,
আছে কি জীবন তার ? এতদিন হায় !
যবনের গৃহ-গত কপিলার প্রায় ॥

না, না, তাঁর জীবনের আশা করাই বৃথা ;—

স্নানাহার নিদ্রা নাহি আমা বিনা হয় ।
আমা বিনা ক্ষণার্দ্ধ না বাঁচে শ্রদ্ধা হায় ॥

হায় ! সেই শ্রদ্ধার অভাবে ক্ষণার্দ্ধ জীবন-ধারণ করাও শান্তির পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। সখি করুণে ! তুমি শীঘ্র চিতা রচনা ক'রে দাও, আমি অনল-প্রবেশ ক'রে মায়ের সহচরী হই ।

মূল

করুণা। (সাস্রং) সহি ! এব্বং বিসম জলণজালা সলকত্তুস্ সহহিং অখ্‌রহিং এপ্পন্তী সব্বধা বিলুও জীবিদং মং করোসি তাপ্পসীদ মুহুত্ত অং জীবিদং ধারেদু প্পিয়সহি জাব ইদো তদো প্পদেসেসুং মুনিঅণসমাউলেসুং অস্‌সমেস্‌ং ভাইরহী তীরে বহুবিহ মহা অণভূসিদেসুং ণিউণং নিলুবেক্ষ কধম্পি মহামোহো ভীদাপচ্ছন্নং পড়িবসদি । †

(অনুবাদ)

করু। সখি ! তোমার এই কথাগুলি বিষম অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত শলাকার ন্যায় আমায় হৃদয় বিদ্ধ ক'রে প্রাণনাশের উপক্রম ক'রছে। মুহূর্ত্তকাল জীবনরক্ষা কর, আমি চতুর্দ্দিকস্থ মুনিজন-সমাকুল আশ্রমসমূহে, ভাগীরাথী তীরে, বহুবিধ-মহাজন-ভূষিত পবিত্র স্থানসমূহে, খুব নিপুণভাবে অন্বেষণ ক'রে দেখি, যদি মহামোহ-ভয়ে ভীতা হয়ে শ্রদ্ধা কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন ।

(মূল)

শান্তিঃ। সখি ! কিয়দন্বিষ্যতে ?

নীবারাঙ্কিত সৈকতানি সরিতাং কুলানি বৈখানসৈ
রাক্রান্তানি সমিচ্চসালচমসব্যাপ্তা গৃহা যজ্বানাং ॥

† সং। সখি ! এবং বিষজ্বলনজ্বালা শলাকা দুঃসহান্যক্ষরাণি জল্পন্তী সর্ব্বথা বিলুপ্ত-জীবিতাং মাং করোষি তৎপ্রসীদ মুহূর্ত্তং জীবিতং ধারয়তু প্রিয়সখী যাবদিতস্ততঃ প্রদেশেষু মুনিজন-সমাকুলেষু ভাগীরথী-তীরে বহুবিধ-মহাজন-ভূষিতেষু নিপুণং নিরূপয়াবঃ কথমপি মহামোহভীতা প্রচ্ছন্নং প্রতিবসতি ।

প্রত্যেকঞ্চ নিরূপিতাঃ প্রতিপদং চত্বার একাশ্রমাঃ
শ্রদ্ধায়াঃ ক্বচিদপ্যহো সখি! ময়াবার্ত্তাপি নাকর্ণিতা ॥

(অনুবাদ)

শান্তি। আর কি খুজবে সখি! আমি না দেখেছি কোথায়?
নীবার-অঙ্কিত মরি সরিৎ-সৈকত,
যথা বৈখানস-কুল তপস্যায় রত,
যজ্ঞপাত্র-পরিব্যাপ্ত যাজ্ঞিক-আলয়।
দেখিলাম প্রতি স্থান সূক্ষ্মরূপে হায় ॥
চারি আশ্রমেতে কত তন্ন তন্ন করি,
খুজিয়াছি সখি! আমি দিবা বিভাবরী ॥
কি বলিব দুঃখ সখি! হায় কোন স্থানে।
শ্রদ্ধার কথাটি আমি না শুনিনু কাণে ॥

(মূল)

করু। সহি! এববং ভণামি সা জই সচ্চং জ্জেব সদ্ধা অত্থিতদো তারিসীএ এরিসিং দুগ্গদিং ণ সম্ভাবেমি। ণহিতারিসীও পুণ্ণভাইণিও এরিসিং অসম্ভাবণিজ্জং বিবত্তিং অণুভবন্তি। *

(অনুবাদ)

করু। সখি! আমি বল্‌ছি কি যদি তিনি জীবিতাই থাকেন, তা হ'লে তাঁর ন্যায় সতী সাধ্বীর কখনই সেরূপ দুর্দ্দশা হওয়া সম্ভব নয়।

(মূল)

শান্তিঃ। সখি! কিমিহ প্রতিকূলে বিধাতরি ন সম্ভাব্যতে? তথাহি;—
শ্রীর্দ্দেবীজনকাত্মজা দশমুখস্যাসীদগৃহে রক্ষসঃ।
নীতাচৈব রসাতলং ভগবতী পূর্ব্বং ত্রয়ী দানবৈঃ ॥
গন্ধর্ব্বস্য মদালসাঞ্চ তনয়াং পাতালকেতুশ্ছলা।
দৈত্যেন্দ্রোঽপি জহার হন্ত! বিষমা বামা বিধের্বৃত্তয়ঃ ॥
তন্তবতু পাষণ্ডালয়েষ্বেব তাবত্তামনুসরাবঃ।

করু। (সত্রাসং) রখ্‌সো রখ্‌সো। †

* সখি! এবং ভণামি সা যদি সত্যমেব শ্রদ্ধা অস্তি তদা তাদৃশ্যঃ ঈদৃশীং দুর্গতিং ন সম্ভাবয়ামি। নহি তাদৃশ্যঃ পুণ্যভাগিন্য ঈদৃশীং অসম্ভাবনীয়াং বিপত্তি-মনুভবন্তি।

† রাক্খসো রাক্খসঃ। ইতি সং

শান্তি। কাসৌ রাক্ষসঃ ?

করু। সহি! পেক্খ পেক্খ এসো গলন্ত মলপঙ্ক-পিচ্ছিল বীহচ্ছদেহচ্ছবী উল্লুঞ্চিঅ চিউরো মুক্কবসণবেস দুদ্দসণো সিহি সিহন্ত পিঞ্ছিআ হত্থো ইদোজ্জেব পড়িবট্টদি। *

(অনুবাদ)

শান্তি। সখি! বিধাতা প্রতিকূল হ'লে কিনা সম্ভব হয় ?

সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সীতা জনক-নন্দিনী,
দশানন-গৃহে তিনি হ'লেন বন্দিনী।
ত্রয়ী হরি দানবে লইল রসাতলে!
হরিল পাতাল-কেতু মদালসা, ছলে॥
বিধাতা হইলে বাম কিবা নাহি হয়।
সেই হেতু শ্রদ্ধা তরে সদা হয় ভয়॥

যা হোক্, এখন একবার পাষণ্ড-আলয়েই শ্রদ্ধার সন্ধান ক'রে দেখা যাক্।

করু। (সত্রাসে) রাক্ষস! রাক্ষস!

শান্তি। কোথায় রাক্ষস ?

করু। সখি! দেখ, দেখ, গলিত মলপঙ্কে পিচ্ছিল ও বীভৎসদেহ উর্দ্ধগত-কেশ, মুক্তবসন, কুৎসিতদর্শন একখান ময়ূর পুচ্ছের পাখা হাতে করে এ দিকেই আস্‌চে।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভা—

বর্ত্তমান মাসে কাশীতে "নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার" সপ্তম অধিবেশন হইবে। সভার উদ্দেশ্য—

(১) ভারতের সর্ব্বজাতীয় হিন্দুদের মধ্যে একতা-বন্ধন স্থাপনে সহায়তা করা।

(২) ভারতে হিন্দু এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া পরস্পরের সাহায্য করা।

(৩) হিন্দুদের মধ্যে জাতিসমূহের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বিধায়ক উপায় উদ্ভাবন করা।

---

* সখি! পশ্য পশ্য এষ গলন্মলপঙ্ক-পিচ্ছিল বীভৎস-দেহচ্ছবি রুল্লুঞ্চিত-চিকুরোমুক্ত-বসনবেশো দুর্দ্দর্শনঃ শিখিশিখণ্ডক-পিঞ্ছিকাহস্ত ইত এব প্রতিবর্ত্ততে॥

(৪) সকল প্রকারে সর্ব্বাবস্থায় হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করা। এবং,

(৫) সাধারণ ভাবে, হিন্দুদের মধ্যে যাহাতে নৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্ম-বিষয়ক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতি উত্তরোত্তর সাধিত হয়, তদ্বিষয়ক আলোচনা করা। সভার উদ্দেশ্য সাধু। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সভার সাফল্য কামনা করি।

স্বর্গীয় পণ্ডিত রামভজ দত্ত—

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ২১শে শ্রাবণ সোমবার পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরী দুষ্ট ব্রণ রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় একজন স্বদেশপ্রেমিক ও নীরবকর্ম্মী হারাইয়া ভারতের যে বাস্তবিকই সমূহ ক্ষতি হইল একথা বলা বাহুল্য মাত্র। পণ্ডিত রামভজের যশোরাশি শুধু তাঁহার জন্মভূমি পঞ্জাব প্রদেশেই নিবদ্ধ ছিল না, সমস্ত ভারতে তাহা ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার সহিত বঙ্গদেশের অতি নিকট সম্বন্ধ, কেন না, কবীন্দ্র রবীন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সরলাবালা দেবী তাঁহারই উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী। শ্রীমতী সরলাবালা ও তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের প্রতি আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর সদ্গতিবিধান করুন।

যশোহরে কমিশনার সাহেব—

গত ৩১শে আগষ্ট মঙ্গলবার, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার মিঃ লিণ্ডসে পরিদর্শন উপলক্ষে যশোহরে আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে যশোহর টাউনহলে একটী সাধারণ সভা আহূত হয় ও তাহাতে যশোহরে কালাজ্বর নিবারণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। কয়েকজন ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত লোক লইয়া যশোহরে কালাজ্বর নিবারিণী সমিতি গঠিত হইয়াছে। ৪ঠা তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মাননীয় ষ্টিফেন্‌সন্ সাহেব ও বঙ্গীয় স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর ডান্ সাহেব উভয়ে যশোহরে আগমন করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে কমিশনার সাহেবের সম্বর্দ্ধনার্থ রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের বাসা বাটীতে একটী সান্ধ্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে স্থানীয় অধিকাংশ উকিল, মোক্তার, ভদ্রলোক ও সাহেব মেম সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, মিঃ লিণ্ডসে পূর্ব্বে যশোহরের জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

শ্রীহরি

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

৩০শ বর্ষ, ৩০শ খণ্ড ৫ম সংখ্যা। | ভাদ্র। | ১৩৩০ সাল। ১৮৪৫ শকাব্দাঃ

আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা ও গার্হস্থ্যজীবন।

লেখক—ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলেই তাহার পূর্ব্বে স্ত্রীজাতিকে ভাল করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই নারীজাতি বিশেষভাবে সম্মানপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। স্ত্রীজাতি মানব-জননীর জাতি বলিয়াই বোধ হয় সভ্য মানবেরা তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতের আর্য্য ঋষিগণ নারীর মহত্ব যে ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। তাঁহাদের মতে—

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

সন্তানের জননী বলিয়া স্ত্রীগণ আদরণীয়; তাঁহারা গৃহকে উজ্জ্বল করিয়া থাকেন, তাঁহারা গৃহের শ্রীস্বরূপ, স্ত্রীতে এবং শ্রীতে কিছুই পার্থক্য নাই।

স্ত্রীজাতিকে আর্য্য ঋষিগণ যে দেবতার ন্যায় দেখিয়া তাহাদের মহত্ব কতখানি হৃদয় দিয়া বুঝিয়া গিয়াছেন, তাহা যে কোন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপরি-উক্ত

শ্লোক হইতে সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। কিন্তু মানবের কল্যাণ-কামী মুনি-ঋষিগণের হৃদয়ের উচ্চতা যদি আমরা বুঝিবার চেষ্টা না করি, অথবা তাঁহাদের হিত-বচন বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করি, সেটা আমাদের বর্ত্তমান কুশিক্ষার বিষময় ফল সন্দেহ নাই।

এক সমাজের দুটী অঙ্গ নারী এবং নর এই দ্বিমূর্ত্তিতে ঈশ্বর মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সমাজের উন্নতিকল্পে বিদ্যাবুদ্ধি উভয়েরই প্রয়োজন। একের সাহায্য বিনা অন্যে কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে না। সকল সভ্যদেশেই নারীজাতি সম্মানের পাত্রী বিবেচিত হইলেও, একমাত্র বৈদিকযুগে ভারত ভিন্ন তদনুরূপ সম্মান তাঁহারা কোথায়ও পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। পুরুষ স্বভাবতঃ কঠোর-স্বভাব, নারী কোমল-স্বভাবা, উভয়ের শারীরিক এবং মানসিক গঠনের পর্য্যালোচনা করিলে পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র গৃহের বাহিরে এবং নারীর, অভ্যন্তরে বলিয়া বোধ হয়। আকৃতি ও প্রকৃতিতে পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও জীবনের লক্ষ্য উভয়েরই এক, জ্ঞান ও কর্ম্মে উভয়েরই তুল্য অধিকার, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে জ্ঞানধর্ম্মের প্রভেদ কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং সমাজের উন্নতি করিতে হইলে, সংসার শান্তির আগার করিয়া তুলিতে হইলে, শ্রীস্বরূপা স্ত্রীজাতিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে সম্পদশালিনী করিতে হইবে। হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীকে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। স্ত্রী-সমাজে এরূপ উচ্চাঙ্গের কথা বোধ হয় আর কোন দেশে নাই। সেই স্ত্রীকে যাহারা বিলাসের পুত্তলী অথবা পালিত পশুর ন্যায় মনে করে, তাহাদিগকে স্বতঃ পরতঃ অন্ধকারে রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাদের বিশেষণ অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে নানাজনে নানামত প্রচার করিয়া থাকেন। কাহারও মতে তাহাদের উচ্চ শিক্ষা হওয়াই উচিত; কাহারও কাহারও মতে সামান্য শিক্ষা তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত। আবার কেহ বলেন, সংসারের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের কিছুমাত্র শিক্ষা না দেওয়াই উচিত। আমরা প্রত্যেকের বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করিব। ভারতের বৈদিক যুগ হইতে স্ত্রীজাতির শিক্ষা কি ভাবে চলিয়া আসিতেছে, সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখা যাউক।

বেদাধ্যয়নে ও ওঙ্কার উচ্চারণে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই, এরূপ বিধি নিষেধের মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ কোন প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে এরূপ নিষেধের কোন উল্লেখ দেখা যায় না; পরন্তু স্ত্রীলোকের

বেদাধ্যয়নের কথা পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ব বেদের একস্থানে উল্লিখিত আছে কন্যা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই যুবা পতি লাভ করে। ইন্দ্রিয়াদি-সংযমপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নই যে ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গ, সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতভেদ নাই, এবং পুরুষ ও স্ত্রীজাতির ব্রহ্মচর্য্য যে একই প্রকার তাহা "সমানং ব্রহ্মচর্য্যং" এই বাক্য হইতেই প্রমাণিত হয়। বেদের কোন কোন সূত্রের রচয়িত্রী স্ত্রীলোক, তাহা অনেকে জানেন। কেহ কেহ মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ঋষি হইয়া ঋত্বিকের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে বিশ্ববারার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকস্থলেই স্ত্রীলোকের হোম করিবার বিধি আছে, কিন্তু বেদাধ্যয়ন না করিয়া হোম করা যায় না। সেকালে বিবাহের কালেও কন্যাকে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত, সুতরাং তখনকার যুগে স্ত্রীজাতি বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি উচ্চশিক্ষাই প্রাপ্ত হইতেন। স্ত্রীজাতির বেদাদি উচ্চাঙ্গের শিক্ষার বিরোধী পক্ষ বলিবেন "স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজ-বন্ধুনাম্ ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" বোধ হয়, ভাগবতের এই শ্লোকার্দ্ধকে মূলভিত্তি করিয়া স্ত্রী শূদ্রের বেদে অধিকার নাই এই প্রবাদ রটনা করা হইয়াছে। পূর্ব্বাপর ঘটনা আলোচনা করিলে ভাগবতের প্রামাণ্য বিষয়ে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। ভাগবতকার সে অর্থে রচনা করিয়াছেন বলিয়াও মনে করিবার কোন হেতু নাই। শ্লোকের অপরাংশ এইরূপ—

> কর্ম্ম শ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
> ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥

পণ্ডিত শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি মহাশয় উহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

কর্ম্মই শ্রেয়স্কর এইরূপ বিবেচনা-বিমূঢ় স্ত্রী শূদ্র এবং অধম দ্বিজদিগের বেদত্রয় (ঋক্ যজুঃ ও সাম) শ্রুতিগোচর হয় না, এই মহাভারতের দ্বারা ইহাদেরও মঙ্গল হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া মুনি (ব্যাসদেব) কর্তৃক কৃপাবশতঃ এই মহাভারত বিরচিত হইয়াছে।"

বৈদিক যুগের পরে মনু-সংহিতার যুগ। মনু-সংহিতাই স্মৃতি-গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রধান। ইহার আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে মনুর বিধি অথবা নিষেধ কিছুমাত্র নাই, অর্থাৎ বৈদিক যুগ হইতে যে ভাবে স্ত্রীশিক্ষা চলিয়া আসিতেছে সংহিতাকার তাহাই বহাল রাখিয়াছেন, পরন্তু কেবলমাত্র পণ্ডিত হওয়া অপেক্ষা যে সমস্ত বিষয় গৃহের সুখ শান্তির অনুকূল

যেমন গৃহকর্ম্ম, পতিসেবা, অতিথি-সৎকার প্রভৃতির জন্য তাহার বিশেষ অনুরোধ দেখা যায়। মহাভারতেও দ্রৌপদী প্রভৃতি বহু বিদূষী মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়। দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদে দ্রৌপদী কৃষ্ণমহিষী সত্যভামার নিকট যে ভাবে পতিমাহাত্ম্য ও পতিসেবা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই উচ্চান্তঃকরণ উচ্চ-শিক্ষিতেরই অনুরূপ। ইহার পরে তন্ত্রশাস্ত্রে আমরা স্ত্রীশিক্ষার স্পষ্ট অনুশাসন দেখিতে পাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক সুবিখ্যাত অনুশাসন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" সর্ব্বজন-বিদিত। উক্ত তন্ত্রে নারী-জাতির কোন্ সময়ে বিবাহ হওয়া উচিত এই অনুশাসনের মধ্যেও শিক্ষার ধারা সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই ; যথা—

অজ্ঞাত-পতিমর্য্যাদাং অজ্ঞাত-পতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালাম্ অজ্ঞাত-ধর্ম্মশাসনাম্॥

যে বালিকা পতিমর্য্যাদা জানে না, পতিসেবা ও ধর্ম্মের শাসন শিখে নাই, তাহার বিবাহ দিবে না।

আমরা পূর্ব্বাপর দেখিয়াছি স্ত্রীশিক্ষা ভারতে সর্ব্বসময়েই প্রচলিত ছিল, তবে কালের কুটীল বাতাসে কখনও হয় ত নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া থাকিবে। সেই কারণেই বোধ হয় শতাব্দী-পূর্ব্বে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল, স্ত্রীলোককে শিক্ষিত করিলে সে বিধবা হয়। সুখের বিষয়, সে সব কুসংস্কারের দিন এখন আর নাই। স্ত্রীজাতির অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষিত হওয়া উচিত এইরূপ ইদানীং প্রায় সকলেরই অভিমত হইবে, কিন্তু সেই শিক্ষার স্বরূপ কি এবং তাহা কত পরিমাণে গার্হস্থজীবনে কার্য্যকরী হইতেছে তাহাই আমাদের আলোচ্য।

নারী ও নর উভয়েই ঈশ্বরের সন্তান ; সংসারে উভয়েরই অধিকার তুল্য হওয়াই উচিত। কিন্তু উভয়েরই আত্মা এক হইলেও উভয়ের শরীরে আশ্চর্য্য প্রভেদ বর্ত্তমান এবং শরীরের ন্যায় স্বভাব, রুচি ও মানসিক গতিরও স্বল্পাধিক পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভীরুতা, লজ্জাশীলতা, হৃদয়ের কোমলতা, বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকল অবস্থায় স্ত্রীলোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ নির্ভীকতা, নিঃসঙ্কোচতা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণ-রাজিও বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল অবস্থায় পুরুষের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। লজ্জাশীলতা অথবা মায়া মমতা শুধু যে অন্তঃপুররুদ্ধা ভারতরমণীতেই শোভা পায় তাহা নহে, স্বাধীনা ইউরোপীয়া মহিলারাও ঐ সমস্ত গুণের তুল্য অধিকারিণী। ঔদ্ধত্য অথবা প্রগল্‌ভতার জন্য তাহারা কখনও প্রশংসা লাভ করেন না। স্ত্রীজাতির শরীরের

গঠন ও প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিলে তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র গৃহের অভ্যন্তর হ্যাই বোধ হয়।

মাতৃত্বই রমণীর প্রধান অলঙ্কার এবং স্ত্রীশিক্ষাই মাতৃত্ব-বিকাশের প্রধান সহায় হওয়া উচিত। পুরুষের মনুষ্যত্ব এবং নারীর মাতৃত্ব একার্থবোধক, সুতরাং শিক্ষায় যাহাতে নারীজীবনে সেই মাতৃত্ব সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নব্যবঙ্গের রাজা রামমোহন রায়ই স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া বিটন বিদ্যালয় (এখনকার বেথুন কলেজ) স্থাপন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এজন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। যাহা হউক, স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও সেকালে অনেকেই তাহাতে মেয়েদের পড়াইতেন না। স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলনে যাহারা অগ্রগামী, কেবল মাত্র তাহারাই স্কুলে মেয়েদের পাঠাইতেন, কিন্তু তাহাদের মেয়েরাও অধিকদূর শিক্ষা-লাভ করিতে পারিত না, কারণ তাহারা বিবাহের বয়স হইলেই স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনী মেয়েদের বিবাহের বয়সের বাঁধাধরা নিয়ম নাই, সুতরাং তাহাদের সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্তিরও কোন বাধা নাই, অথচ যে মাতৃত্ব রমণীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহা তাহারা হারাইয়া সমাজে যে কিরূপ বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিতেছেন তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। অলক্ষিতে যে দুর্নীতি তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে তাহা অনেকে বুঝিতে পারিয়াও তাহার প্রতিকারের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন না। ধর্ম্মই শিক্ষার ভিত্তি, সেই ধর্ম্মত্যাগ করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তাহাতে যে বিষময় ফল ফলিবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু স্কুল কলেজের ছাত্রীদিগকে অবাধ স্বাধীনতাও দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মহীন শিক্ষার অবাধস্বাধীনতা সর্ব্বভুক হুতাশনের সহায়ক প্রচণ্ড বায়ুরূপ ভয়ানক আকার ধারণ করিতেছে। ফলে নারীজীবন হইতে মাতৃত্ব অধিকাংশ স্থানেই লোপ পাইতেছে। অমৃত বাবুর বিবাহ-বিভ্রাটের সরোজিনী অথবা যোগেন বাবুর মডেল ভগিনীর সৃষ্টি অতিরিক্ত পরিমাণে হইতেছে। অবশ্য ইংরাজী-শিক্ষিতা প্রত্যেক রমণীই যে এইরূপ হইতেছেন, এমন কথা আমরা বলি না; যাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের সুস্পষ্ট ছায়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। ব্রহ্মচর্য্যের সুদৃঢ় বর্ম্মে নিজেকে আবৃত না করিয়া স্বাধীনভাবে পুরুষ-জাতির সহিত একত্র বসবাসে নারীজাতির অধঃপতন যে অবশ্যম্ভাবী, সে কথা রমণী-কুলের উন্নতিকামী উদার-নৈতিক সমাজ-সংস্কারকগণ কেন যে বুঝেন না, তাহা বলা যায় না।

মুসলমানদিগের জেনানার ন্যায় অবরোধ-প্রথার সৃষ্টি বোধ হয় ইন্দ্রিয়-পরায়ণ মোগল সম্রাটদিগের শাসন-কাল হইতেই হইয়াছে। বাস্তবিক প্রাচীন ভারতে এরূপ অবরোধ প্রথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। সেকালে রমণীগণ স্বাধীনভাবে বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন, কিন্তু সেকালে ব্রহ্মচর্যের অনুশাসন সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

পুরুষ জাতিকে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে সে শিক্ষা নারীজাতির পক্ষে উপযোগী কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবারও বিশেষ কারণ আছে।

পুর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি, আত্মা উভয়ের একরূপ হইলেও নারী-জাতির স্বভাব পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সুতরাং পুরুষের শিক্ষা নারী-জাতির স্বভাবের অনুকূল হইতে পারে না। পুরুষের কঠোরতা নারীহৃদয়ে, ইহা কেহই পছন্দ করিবেন না। লেডি ম্যাক্‌বেথের ন্যায় ভয়ঙ্কর চরিত্রের স্ত্রীলোকের সাহচর্য্য কল্পনা করিতেও হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। কেহ কেহ বলেন শিক্ষা, শিক্ষা। স্ত্রীপুরুষভেদে শিক্ষার আবার তারতম্য কি? মৃত্তিকা হইতে একই রস পান করিয়া বৃক্ষ, লতিকা স্ব স্ব ধর্ম্ম পাইতেছে। লতা কখনও বৃক্ষের ন্যায় কঠিনতা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু এ উদাহরণ মানবের পক্ষে খাটে না। কার্য্যক্ষেত্রে আমরা স্ত্রীজাতিতে পুরুষোচিত শিক্ষার প্রতিকূল প্রভাবই দেখিতে পাই। সেইজন্য এখন মধ্যে মধ্যে মহিলাদের উপযোগী নূতন বিশ্ববিদ্যালয় রচনার আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায়। যে শিক্ষায় পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া পরীক্ষার পাশ করিতে হয়, সে শিক্ষাও মাতৃত্বের ঘোর প্রতিকূল। শুধু পুরুষের সঙ্গে কেন, যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শিক্ষাই নারীজাতির অনিষ্টের কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। সাম্যই তাহাদের মাতৃত্বগঠনের অন্যতম উপাদান, আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিগণ তাহা যে ভাবে বুঝিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ করি, কোন দেশে কোন কালে কেহ পারিবে না। আহা কি সুন্দর!

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন॥

যাহারা গাউন পরিয়া জুতা মোজা পায়ে দিয়া স্কুল কলেজে বিজাতীয় ভাবে শিক্ষা পাইতেছেন, তাহাদের প্রকৃতিতে নারীত্বের প্রভাবের একান্তই অভাব। শিক্ষা 'পাশের' জন্য নহে, একথা অনেকেই ভুলিয়াছেন। ম্যাট্রি-কিউলেসেন, বিএ বা এম্‌এ পাশ করিয়া তাহারা মাতৃত্ব হারাইয়া ফেলেন,

সুতরাং মুনিঋষিদের অভীপ্সিত গৃহলক্ষ্মী নামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া । অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারের সংসারের ভার উড়িয়া চাকর ও ব্রাহ্মণ- াপক উপবীতধারী কোন কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত কুলিমজুরের উপর ন্যস্ত হয়, মা লক্ষ্মীরা বন্ধুবান্ধবদের সহিত হাওয়া খাইতে খাইতে, কখনও বা গোলটেবেলের চারিধারে বসিয়া চা খাইতে খাইতে রাজনীতি, সমাজনীতির আলোচনা করেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর স্বামী অথবা পুত্রকন্যাদের ভরণপোষণ-ভার, যে গৃহে কদাচার কুৎসিত-ব্যাধিগ্রস্ত কুলিমজুরের হস্তে অর্পিত, সে গৃহের নারী কোন্ আখ্যায় অভিহিত হইতে পারেন, তাহা অভিধান খুঁজিয়াও পাওয়া দুষ্কর। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারে এ নিয়ম অবশ্য খাটে না, কিন্তু বিজাতীয় শিক্ষার মোহ তাহাদিগকে এমনভাবে মুগ্ধ করিয়াছে যে স্বামিসেবা, সন্তান-পালন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারে সংসারের পারিপাট্য-সাধন তাহাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শিক্ষার কুফল স্বাস্থ্যহানি যে উক্ত-রূপ শৈথিল্যের অন্যতম কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিবাহের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বালিকা-বিদ্যালয়ে যাহারা শিক্ষালাভ করেন, তাহাদের শিক্ষাও নানাকারণে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সে স্থানে সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি অল্প পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেকে মনে করেন, আত্মীয় স্বজনের নিকট চিঠি পত্র লিখিতে এবং গৃহস্থের জমা খরচ বা দুগ্ধবিক্রেতা কিম্বা রজকের হিসাবাদি রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল; কিন্তু কেবল এইটুকুই শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। স্ত্রীর অপর নাম সহধর্ম্মিণী, কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় ধর্ম্মের লেশমাত্রও না থাকাতে তাহাদের কাছে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী, এই প্রবাদের সার্থকতা বেশ পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। আজকাল অনেক গ্রন্থকারের নানাবিধ কুরুচিপুর্ণ উপন্যাস বন্যার ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্ত উপন্যাসের বহু সংস্করণ ধর্ম্মশূন্য শিক্ষায় শিক্ষিতা তরলমতি যুবতীদের মস্তক চর্ব্বণ করিতেছে। অবৈধ প্রণয় ইত্যাদি কুরুচিপুর্ণ ভাবগুলি লিখনভঙ্গীর গুণে তাহাদের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, এই সমস্ত পুস্তক পড়িয়া অন্য কোন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতে বা অন্য কোন সদ্বিষয়ের আলোচনা করিতে তাহাদের মতি নিতান্তই অপারক হইয়া পড়ে, এবং তাহারা আস্তে আস্তে তাহাদের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নারীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া বসে।

নারী-জীবনের উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অনেকে অনেক

কথা বলিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা একাধিকবার দেখাইয়াছি মাতৃত্ব-বিকাশই নারী-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' 'প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ' প্রভৃতি মুনিবাক্য তাহার প্রমাণ। শারীর-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের নিকটে নারী-শরীরতত্ত্বের আলোচনা পূর্ব্ব প্রমাণের সম্পূর্ণ পোষকতা করে সন্তান-প্রতিপালন মাতৃত্ববিকাশের প্রকৃষ্ট পন্থা, কিন্তু কোন বালিকা-বিদ্যালয়ে এই সম্বন্ধে কোনরূপ শিক্ষাপ্রদান করা হয় না। সন্তানের জননী হইয় যুবতী জানে না কেমন করিয়া তাহাকে পালন করিতে হয়, তাহার ফলে আমরা দেখিতে পাই, লণ্ডন নগরে যে স্থলে বৎসরে হাজারকরা ৮০টা শিশু মরে, কলিকাতা নগরীতে সে স্থলে শিশু মৃত্যুর হার হাজারকরা ২৫০ গ্রামের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। অনেকে বলিবেন, পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা জননী দ্বারা আমরা কত জীব মানুষ হইয়া গিয়াছি, সে কথা সত্য; কিন্তু ইহাও মিথ্যা নহে যে তাহাদের অজ্ঞতার ফলে কত শত জীব নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার হিসাব রাখা হয়, অনেক ঘটনা চক্ষুর গোচরীভূত হয়, পূর্ব্বে কোন হিসাবই পাওয়া যাইত না।

মাতৃ-চরিত্রের প্রভাব সন্তানে বহু স্থলেই অধিকাংশরূপে বর্ত্তিয়া থাকে, সে কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিয়া নারীজাতিকে শিক্ষা দান করা উচিত। আহার-কালে কোন একটী ছেলে তাহার মাতার নিকট দুগ্ধে মিষ্টান্ন চাহিয়াছিল; মাতা বলিলেন, দুগ্ধে মিষ্ট খাইতে নাই, পুত্রের মুখ খানি মলিন দেখিয়া সেই স্থলে উপস্থিত রমণীর এক আত্মীয় মিষ্ট দিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করেন, ইহাতে রমণী উত্তর দিয়াছিলেন—"আমাকে এমন অনুরোধ করিবেন না। একবার না বলিয়া পুনরায় দিলে ইহারা আর কখনও আমার কথা বিশ্বাস করিবে না।" বলা বাহুল্য, এইরূপ চরিত্রের রমণীই মাতৃ-নামের সম্পূর্ণ উপযুক্তা।

যাহা হউক, মাতৃত্বকে কেন্দ্র করিয়া নারীজাতির শিক্ষা-বিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য প্রণালীর শিক্ষা এবং পাশ্চাত্যধরণের স্ত্রীস্বাধীনতা আদর্শ মাতৃত্বের ঘোর প্রতিকূল। পাশ্চাত্য স্ত্রীস্বাধীনতা নিন্দনীয় বলিয়া মুসলমান সমাজের জেনানা প্রথাও প্রশংসনীয় বলা যাইতে পারে না; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ মুসলমান সম্রাটদের অত্যাচার-ফলে হয়ত জেনানা প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী যুগের প্রথাই

অবলম্বনীয়। গৃহকর্ম্মের অবসরে নারী রাজনীতি অথবা দেশবিদেশের সংবাদ আলোচনা করেন তাহাতে ক্ষতি নাই, ইংরেজী অথবা অন্যান্য বিদেশের ভাষাতে সুশিক্ষিতা হইতে পারেন, কিন্তু তাহার শিক্ষা-প্রণালী সম্পূর্ণ দেশীয় মতে হওয়া উচিত। ইহাদের সহিত বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতি ভারতের নিজস্ব অলঙ্কারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে, রুচি-অনুসারে সঙ্গীত ও চিত্রকলার প্রচলনও আবশ্যক।

সূচি-শিল্পে অনেক রমণীকে দক্ষতা লাভ করিতে দেখা যায়। সেইরূপ নানাবিধ উটজ শিল্পেরও (Cottage Industry) শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহাতে যেমন শিল্পকলার উন্নতি হইবে, সেইরূপ অর্থাগমের সম্ভাবনাও আছে। তাহাতে পরিবারিক দরিদ্রতা কতক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে; কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে কখনই শিক্ষা শেষ হইতে পারে না। অন্তঃপুরের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সংস্কৃত-শিক্ষা ও আত্মরক্ষা।

কশ্চিৎ সংস্কৃতসেবী।

সংস্কৃতভাষা ভারতীয় আর্য্যগণের জাতীয় সম্পদ। জগতের বিভিন্ন সভ্য জাতি এই সংস্কৃতভাষার সাহিত্য-দর্শনাদি পাঠ করিয়া আনন্দে বিভোর হন। মানবজাতির প্রাচীন সভ্যতা ও ভাষাতত্ত্বের বীজ অন্বেষণ করিবার জন্য তাঁহারা সাদরে এই দেবভাষার সেবায় অবহিত হন। সংস্কৃতভাষা দেবভাষা। এই দেবভাষার কুক্ষিতেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অমূল্য অবদানরাজি রক্ষিত আছে। পূর্ব্বজগণের কীর্ত্তিকলাপের অমরকাহিনী এই মঞ্জুষায়ই নিহিত আছে। এককথায় এই দেবভাষা সংস্কৃতভাষাই ভারতের বিজয়বৈজয়ন্তী। এই ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপন আমাদের দায়সংরক্ষণ।

আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম, জ্ঞান প্রজ্ঞান, সাধনা উপাসনা—সমস্তই দেবভাষার সাহায্যে সম্পাদিত হয়। আমাদের উৎসবে ব্যসনে, পূজায় পার্ব্বণে, জীবনে মরণে দেবভাষারই সেবা। আমরা বিবাহে দেবভাষার মন্ত্র পাঠ করিয়াই দাম্পত্যবন্ধনে বদ্ধ হই। আবার শ্রাদ্ধতর্পণেও এই দেবভাষার মন্ত্র পাঠ

করিয়াই পিতৃঋণ দেবঋণ পরিশোধ করিতে প্রয়াস পাই। আমাদের সহিত এই ভাষার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

সংস্কৃতভাষার সেবা ত্যাগ করিলে আমাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। জাতীয়ভাবের ভাণ্ডার জাতীয় সাহিত্য। ভারতীয় আর্য্য-সমাজের বা হিন্দুসমাজের বিভিন্নভাষাভাষী বিভিন্নপ্রদেশবাসিগণের মধ্যে এই সংস্কৃতভাষাই প্রধান সংযোগসূত্র। বেদ বেদান্ত তন্ত্র পুরাণ স্মৃতি সাহিত্য প্রভৃতির সাহায্যেই হিন্দুসমাজে প্রাচীন পবিত্র আদর্শের প্রচারচর্চ্চা সম্পন্ন হয়। সংস্কৃতচর্চ্চা পরিত্যাগ করা আর হিন্দুর বিশেষত্ব বর্জ্জন করা একই কথা। হিন্দুর জাতীয় ভাবধারা অনাদিকাল হইতে এই সংস্কৃত-ভাষাখাতেই প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দু নামে পরিচয় দিতে হইলে, এই ভাবধারার প্রাণরক্ষা করিতে হইবে, এই ভাবধারার জীবনরক্ষণে যিনি যত্নবান্, তাঁহার পক্ষে সংস্কৃতভাষার সেবা অপরিহার্য্য।

যে জাতি বা যে সমাজ স্বীয় বিশেষত্ব পরিহার করিয়া অপরের ভাবে অনু-প্রাণিত হয়, জগতের ইতিহাস হইতে তাহার স্মৃতি মুছিয়া যায়। আর যাহারা জগতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ করিয়া নিজেদের ভাবের ছাপ দিয়া তাহা গ্রহণ করে, নিজেদের ছাঁচে ঢালিয়া লইয়া তাহা ব্যবহার করে, তাহারাই বিশ্বমানবের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়াও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইলে যে জাতির অস্তিত্ব ধাতুমাত্রে পর্য্যবসিত হয়—ইহাতে সংশয় থাকিতে পারে না। সুতরাং হিন্দুর স্বতন্ত্রতারক্ষার জন্য সংস্কৃতভাষার সেবা অবশ্যকর্ত্তব্য, মনে হয়।

অধ্যয়ন অধ্যাপনাই ভাষার জীবন। যদি অধ্যয়ন অধ্যাপনার লোপ হয়, গুরু-পরম্পরা বিলুপ্ত হয়, তবে পর্ব্বতপ্রমাণ গ্রন্থরাজির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও সে ভাষার জীবনের সন্ধান পাওয়া যায় না। পঠন-পাঠনই ভাষার প্রাণস্পন্দন। ভাষাকে জীবিত রাখিতে হইলে, এই প্রাণস্পন্দন যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, পঠন পাঠন অব্যাহত রাখিতে হইবে। দুর্ভাগ্যদোষে বর্ত্তমানে আমরা এই বিষয়ে অত্যধিক ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছি। ইহা যে কল্যাণকর নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আজ ইউরোপীয় মনীষিবর্গ সংস্কৃতভাষার সেবায় অভিনিবিষ্ট; তাঁহারা সংস্কৃতভাষার রত্নাগার অধিকার করিয়া লইয়াছেন। আর আমরা উদাসনেত্রে তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া কালাতিপাত করিতেছি। প্রাচ্যভাষাবিৎ

ইউরোপীয় পণ্ডিতের মুখে সংস্কৃতভাষার প্রশংসা—বেদ-বেদান্তের গৌরব-কথা শুনিয়া, আমরা আনন্দে আত্মহারা হই, গর্ব্বগৌরবে স্ফীতবক্ষ হই, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে স্বয়ং সংস্কৃতভাষার সেবায় কিংবা পরম্পরায় সংস্কৃতসেবার সৌষ্ঠব-সাধনে আমরা একান্তই পরাঙ্মুখ। ইহা আমাদের দুর্দ্দশার প্রচুর পরিচায়ক। ইহারই ফলে ক্রমে আমরা হিন্দুর নিজস্ব ভাবসম্পদ্, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাধনা উপাসনা হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতেছি, ক্রমে হিন্দু নামে পরিচিত হইবার অধিকার হারাইতেছি।

গুণগ্রাহী সদাশয় ইংরেজগবর্ণমেণ্ট আমাদের মহার্হসম্পদ্ সংস্কৃতভাষার প্রাণরক্ষার জন্য স্বদেশে এবং এদেশে বহু প্রয়াস পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতভাষার পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতীয়গণকে সংস্কৃতভাষার সেবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। বৈদেশিক সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় বিদ্যার্থিগণ এ যাবৎ সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনাদির জ্ঞানও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় প্রাচীন প্রথায় সংস্কৃতভাষার পঠন পাঠন অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টই কাশী ও কলিকাতায় সংস্কৃতকলেজে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ রাখিয়াছেন। ইংরেজীশিক্ষার্থী ছাত্রগণ যেমন ঐ স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত সংস্কৃতগ্রন্থ পাঠ করে, কেবলসংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্রগণও সেখানে তেমন সংস্কৃতপরীক্ষাসমিতির অনুমোদিত সংস্কৃতগ্রন্থ অধ্যয়ন করে। কেবল সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্রগণের ও তাঁহাদের অধ্যাপকবর্গের বৃত্তি পুরস্কারাদির ব্যবস্থা করিয়াও গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃতবিদ্যার সঞ্জীবনে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু হায়! আমরা এই সাহায্য ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না।

অধিকারলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্কোচসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আজ আমরা কলিকাতাসংস্কৃতকলেজের পক্ষচ্ছেদে কৃতসংকল্প হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্কোচসাধন করিয়াছি। সংস্কৃতকলেজে কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপনার পথ রুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সংস্কৃতশিক্ষার পথে কণ্টকারোপণ আমাদের কল্যাণকর হইতে পারে না, ইহা আমরা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছি।

যাঁহারা ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের পথ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতেছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিকতর আশঙ্কার কথা এই যে, কেবল-সংস্কৃতাধ্যায়ীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিতের পুত্র আজ প্রবৃত্তির আশায় ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রসর হইতেছেন।

গুরু পুরোহিত-বংশের বহু সন্তান প্রবৃত্তির মোহে স্ববৃত্তি ত্যাগ করিতেছেন। ইহার প্রতীকার একান্ত কর্ত্তব্য।

সংস্কৃতশিক্ষায় আর বর্ত্তমানে অন্ন-সংস্থান হয় না। "অপাকার্য্যশতং কৃত্বা" যাহাদের ভরণপোষণ করা সঙ্গত বলিয়া শাস্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন. সেই পোষ্য-বর্গের পোষণ আর সংস্কৃতবিদ্যার সাহায্যে সম্পন্ন হয় না। সংস্কৃতশিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী এখন সমাজের গণ্ডে বিস্ফোটক-স্বরূপ বিবেচিত হইতেছেন। এখন "অকার্য্যসহস্রং কৃত্বা'ও তাঁহারা গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। প্রধানতঃ সেই জন্যই পণ্ডিতের সন্তান পূর্ব্বপুরুষাগত সংস্কৃতশিক্ষা ত্যাগ করিয়া বৈদেশিক শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। আমরা আর পূর্ব্বের মত ভূসম্পত্তি ও ধনসম্পত্তি দ্বারা সংস্কৃতজ্ঞের জীবিকানির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দেই না। ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড হইতেছে, তথাপি পণ্ডিতের সাহায্য লইবার সুযোগ হইতেছে না। আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, ধর্ম্মানুষ্ঠানে আস্থা নাই, সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর শ্রদ্ধা নাই কাজেই আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ অকার্য্য কুকার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতেছেন, আর একান্ত অতৃপ্তচিত্তে সন্তানগণকে ইংরেজীশিক্ষালয়ে প্রেরণ করিয়া স্বীয় সংস্কৃতাধ্যয়ন-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। সংস্কৃতভাষার পঠনপাঠনের স্রোত যাঁহারা রক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারাই এখন তাহাতে বাঁধ বাঁধিতেছেন। মন্ত্র-তন্ত্রজ্ঞ গুরু-পুরোহিতের অভাব বাড়িতেছে। কর্ম্মকর্ত্তার ইচ্ছা থাকিলেও সকল সময়ে উপযুক্ত লোক পাওয়া সম্ভব হইতেছে না। ক্রিয়ানুষ্ঠান লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞান দূরে সরিয়া যাইতেছে। হিন্দুভাব ক্রমে ক্রমে শিশির-সঙ্কুচিত পদ্মের মত মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রতীকারের উপায় কি?

সমাজ আজ শত ঝঞ্ঝাবাতে কাতর। সঙ্কীর্ণতা—হীনতা-দীনতার বজ্রকীট ইহার মর্ম্মভেদ করিতেছে। আশার অবলম্বন কোথায়?

পরমুখাপেক্ষিতার দিন আর নাই। এখন সংস্কৃতবিদ্‌গণ আত্মরক্ষায় মনোযোগী হউন্। সংস্কৃতশিক্ষা ত্যাগ করিয়া পণ্ডিতপুত্রগণ যে আজ অন্যপথে যাইতেছেন—ইহাতে দেশের ভাবী অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত হইতেছে—এবং তাঁহারাও প্রকারান্তরে আত্মঘাতের আয়োজন করিতেছেন, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। কাহারও সাহায্য পাইলাম না বলিয়া আত্মহত্যার আয়োজন করিব কেন? আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া আত্মরক্ষার জন্য পুরুষকার প্রয়োগ করিতে বাধা কি? পরাপেক্ষায় স্বাতন্ত্র্য লোপ পায়, আত্মনির্ভর দূরে যায়, সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে পরাপেক্ষা পরিহার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে।

সংস্কৃতাধ্যায়িছাত্রগণকে এরূপ ভাবে শিক্ষাপ্রদান করিতে হইবে যে তাহারা সমাজের গলগ্রহ না হয়, জীবিকার জন্য পরের দ্বারস্থ না হয়। ইংরাজীশিক্ষার সঙ্গে যেমন বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্গে সেরূপ করিলে ক্ষতি কি? ইংরেজীশিক্ষিতেরা যেমন বৈদেশিক বৈদ্যবিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, সংস্কৃতজ্ঞগণও তেমন ভারতীয় এবং বিদেশীয় উভয়বিধ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন। বিদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র মাতৃভাষার সাহায্যেই তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন। বহুদিন হইতে অনেক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ চিকিৎসাবৃত্তির সাহায্যে স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জন করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিতগণ ঐ সকল ব্যক্তিকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন সত্য, কিন্তু আমরা জানি, বর্ত্তমানে অনেক নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত, বৈদ্যবৃত্তি পণ্ডিতের কৃপালাভ করিবার জন্য লালায়িত।

যেমন চিকিৎসাব্যবসায়ের দ্বারা পণ্ডিতেরা জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন, তেমন পূর্ত্ত, স্থাপত্য, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারাও সংস্কৃতজ্ঞগণ জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন। সংস্কৃত শিক্ষা করিলে যে অন্নের জন্য পরের দ্বারে গিয়া স্তুতিপাঠ করিতেই হইবে—ইহার কোনও হেতু নাই। বিভিন্ন অর্থকর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে সংসার-নির্ব্বাহ ও শাস্ত্রচর্চ্চায় জীবনযাপন অসম্ভব মনে হয় না।

সংস্কৃতজ্ঞগণ যদি নিজ ব্রহ্মত্রা ভূমিতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনে প্রয়াস পান, তবে স্বল্পব্যয়ে ও স্বচ্ছন্দে তাঁহারা সংসারযাত্রানির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সংস্কৃতজ্ঞ কি পূর্ত্তবিদ্যা স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে পারেন না? এদেশে অনেক নিরক্ষর লোক শ্রমজীবিগণের সাহায্যে গৃহাদি নির্ম্মাণের কার্য্য (কণ্ট্রাক্টারী) করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। পণ্ডিতগণ কি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না? চিত্র কি পণ্ডিতের তুলিকায় ফুটে না? সূত্রধারকর্ম্ম, তন্তুবায়কর্ম্ম, স্বর্ণকারকর্ম্ম, কর্ম্মকারকর্ম্ম প্রভৃতি কি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া করা যায় না? পণ্ডিতের পক্ষে বাণিজ্য যে একেবারেই মানায় না,—এ কথা কি সত্য? প্রতিকূলে প্রচুর প্রমাণ নাই কি?

আমরা মনে করি, সংস্কৃতাধ্যায়িগণ সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে অপর একটী অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিলে এবং উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে এক সঙ্গে

শাস্ত্র ও সংসার উভয়েরই সেবায় সাফল্য লাভ করিতে পারেন। একযোগে শাস্ত্রশিক্ষা ও প্রাণরক্ষা উভয়ই হইতে পারে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সমস্ত বৃত্তিগ্রহণ করিলে সামাজিক অবনতি ও ধর্ম্মজীবনের গ্লানি উপস্থিত হইবে। তাঁহারা বলেন "শাস্ত্রে ঐ সমস্ত বৃত্তি নিন্দিত—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে অকর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।" আমরা তাঁহাদের সরলতা ও শাস্ত্রানুরাগের প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা-শক্তির উপর নির্ভর করিতে চাহি না। আপৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবৃত্তি, তদভাবে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনযাপন করিতে পারেন, ইহা মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-কারগণের ঘোষণা। শাস্ত্রবিহিত উপায় দ্বারা যে সময়ে জীবিকার্জ্জন অসম্ভব হয়, সেই সময়ই আপৎকাল—ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। আপৎকালে ব্রাহ্মণ শ্ববৃত্তি বা শূদ্রবৃত্তি করিবেন না—এ কথা ধর্ম্মাচার্য্যগণ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া গিয়াছেন। আজ পণ্ডিতমণ্ডলী নিন্দিত বৈতসীবৃত্তিকে ঘৃণার নয়নে দেখেন না, কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত ক্ষত্রিয়-বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণের কথা উঠিলেই একেবারে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার ছল করিয়া ঐ বৃত্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, ইহার অর্থ কি? "ব্রাহ্মণেন ভেষজং ন কার্য্যম্" এই বেদবাণী উপেক্ষা করিতে সাহস হইয়াছে, "পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং" ভক্ষণ করিতে আপত্তি নাই, "বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকস্যান্নং' তাহাতে অরুচি নাই, আর কত কি শাস্ত্রগর্হিত কার্য্য করিতে হইতেছে, তাহার তালিকা করা দুষ্কর। কেবল এই দুর্দ্দিনের জন্য স্বসম্প্রদায়ের রক্ষার্থে যে হিতকর উপায় শাস্ত্রকারগণের দ্বারা উদ্‌ভাবিত—তাহাতেই অরুচি? এ ভাব ত্যাগ না করিলে উপায় নাই। বর্ত্তমানে যেভাবে সংস্কৃতজ্ঞগণ দিনযাপন করিতেছেন—তাহা যে এই উপায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ধর্ম্মশাস্ত্রানু-মোদিত কিনা, তাহা তাঁহারা নিজেরাই চিন্তা করুন।

উপসংহারে আমরা দেশপূজ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট শ্রদ্ধাসহকারে বিনীত-ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা সমবেত হইয়া স্থির করুন যে, আমাদের এই প্রস্তাব ফলোপধায়ক কিনা? প্রয়োজন হইলে আমরা এই প্রস্তাবের অনুকূলে শাস্ত্রের অনুমোদন প্রদর্শন করিব।

যিনি প্রস্তাবিত প্রকারের শিক্ষার জন্য শিক্ষাগারস্থাপনের প্রয়োজন উপ-লব্ধি করেন, তিনি তৎসম্বন্ধীয় ইতিকর্ত্তব্যতা-নির্দ্ধারণের জন্য হিন্দু-পত্রিকা-সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্, এ, বি, এল, সি, আই, ই, বেদান্তবাচস্পতি বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন।

এ প্রসঙ্গে আমরা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি নানাবিধ জীবনোপায়ের কথা বলিতেছি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে গুলি বিশেষভাবে গ্রহণ করা সংস্কৃতাধ্যায়িগণের পক্ষে সঙ্গত ও শোভন বিবেচিত হইবে, সে গুলিরই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এ কার্য্যে চাই আন্তরিক আগ্রহ। আর চাই সৎসাহস। অর্থের অভাব হয় না। সৎকর্ম্মের সহায় ভগবান্—ইহা চিরসত্য। যদি ভারতীয় হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রের বিলোপ বিধাতার বিধান না হয়, তবে প্রস্তাবিত শিক্ষালয় যে ভারতের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে—এরূপ বিশ্বাস করিবার প্রচুর কারণ বিদ্যমান আছে।

পূজনীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত জানিতে পারিলে আমরা আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিব।

সমাধি।

লেখক-শ্রীযুক্ত রাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ।

সমাধি শব্দ অনেক অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সপ্তশতী চণ্ডীর সমাধি নামক বৈশ্যের কথা অনেকের সুপরিচিত। সমাধি শব্দে কাব্যের গুণবিশেষ, মৌনভাব, আরোপ, প্রতিজ্ঞা, সম্মতি, চুক্তি, কবর, নিয়ম, নিদ্রা, নিদেশ, যোগ, একাগ্রতা, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান, ব্রহ্ম, সর্ব্বেন্দ্রিয়-নিরোধ প্রভৃতি অর্থও বুঝায়। আমরা যোগ ও জ্ঞানার্থবাচী (একাগ্রতা, নিরোধ ও জ্ঞান অর্থজ্ঞাপক) সমাধি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য, সমাধির প্রয়োজন কি? প্রয়োজন দুই ভাবে বিবেচিত হইতে পারে। প্রথম অনিষ্ট-নিবৃত্তি, দ্বিতীয় ইষ্ট-প্রাপ্তি। দুঃখই অনিষ্ট, বা অনীপ্সিত, তাহার ত্যাগ এবং সুখই ইষ্ট বা ঈপ্সিত, তাহার প্রাপ্তি—এই দুইটাই সমাধির প্রয়োজন। সর্ব্ব দুঃখের নিদান চিত্তচাঞ্চল্য, এবং সর্ব্ব সন্তোষের, অশেষ সুখের মুল চিত্তকে বশীভূত করা। দুঃখ-নিবৃত্তির ইচ্ছা যোগ-প্রবৃত্তির কারণ এবং ইষ্টলাভ তাহার ফল। যোগীদিগের যে ঐশ্বর্য্য শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হয় কিংবা সৌভাগ্যবলে কাহারো কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা এবং তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর সুখ ও মোক্ষ—যাহা ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত, যুক্তি আদি দ্বারা

পল্লবিত ও নির্ণীত হইয়াছে, যাহা লাভ করিবার জন্য সকলেই ন্যূনাধিক লালায়িত, তাহার লাভের প্রকৃষ্ট উপায়কে সমাধি নামে আখ্যাত করা যাইতে পারে।

আজকাল এ বিষয়টীর আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। অনেকে সমাধিটীকে অতি সহজসাধ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। অনেকের কাছে শুনিয়াছি যে তাহাদের পরিচিত বহুলোকের সমাধি হইয়া থাকে। সমাধিটী এত সুলভও নহে। অনেকের ধারণা সমাধি মুনি ঋষি কিংবা লোকোত্তর মহাজনেরই হইয়া থাকে। কথাটি এক হিসাবে ঠিক্ হইলেও সমাধি অতি-মাত্র সুদুর্লভ কিংবা একেবারে অনধিগম্যও নহে।

যোগশাস্ত্রে যোগ ও সমাধি—একার্থবোধক। যোগ প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাধিতে চিত্তবৃত্তি নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয় না, একটি না একটি বৃত্তি থাকিয়া যায়, এই জন্য সম্প্রজ্ঞাত যোগমাত্রেই সালম্বন সমাধি। ইহাতে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা তিনই বর্ত্তমান থাকে, তবে ধ্যান ও ধ্যাতা লুক্কায়িত মাত্র, কেবল ধ্যেয়াকারে চিত্তবৃত্তি ধারা (বৃত্তিরূপ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়াই যেন) অবভাসিত হয়, এই মাত্র বিশেষ। চতুর্বিধ সম্প্রজ্ঞাত যোগেরই এই নিয়ম। বিতর্ক-বিচার-আনন্দ-অস্মিতামাত্রে চিত্তধারা প্রবাহিত করিয়া ঐ চারিপ্রকার সম্প্রজ্ঞাত যোগ হইয়া থাকে (পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ, ১৭ সূ।) প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে যে এই যোগ ত্রিবিধ—যথা বিষয়-বিষয়ক, ইন্দ্রিয়-বিষয়ক, এবং অহঙ্কার-তত্ত্ব-বিষয়ক। ইহার একতমের অবলম্বনে চিত্তের যে একাগ্রতা হয় তাহাই সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি-পদবাচ্য। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ' বলিয়া যে সংজ্ঞা করা হইয়াছে, একটী ব্যতীত আর সমস্ত বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হয়, ইহাতেই তাহার সার্থকতা বুঝিতে হইবে। কার্য্যতঃ সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে সমস্ত চিত্তবৃত্তি অস্তমিত হয় না। সম্প্রজ্ঞাত-যোগ-সিদ্ধ পুরুষ নানাবিধ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, সম্যক্ কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে পারেন না। তিনি মোক্ষ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। পরম পুরুষার্থ তাহার করায়ত্ত নহে।

এই স্থানে আর একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক।. চিত্তবৃত্তিরই একাগ্রতা কি নিরোধ হইয়া থাকে, তদধিষ্ঠাতা পুরুষের বাস্তব কোন পরিবর্ত্তন হয় না। এ বিষয়ে কি যোগশাস্ত্র, কি বেদান্তশাস্ত্র, কাহারও মতানৈক্য নাই। যোগশাস্ত্রে আছে—

"দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।"

(পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাদ, ২০ সূত্র)

অর্থ—জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই দ্রষ্টা। এই পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী।

"চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধি-সংবেদনম্।

(পাতঞ্জলদর্শন, কৈবল্যপাদ, ২২ সূত্র)

অর্থ—চিতি বা পুরুষ বিষয়াকারে পরিণত হয় না, বা কোথাও গমন করে না। বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া পুরুষ ঐ চিত্তবৃত্ত্যাকার লাভ করিয়া স্বচিত্তবৃত্তির জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে।

প্রথমোক্ত সূত্রের ব্যাসভাষ্য হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল। তাহা হইতে পুরুষের নিত্যৈকরূপতা স্পষ্টীকৃত হইবে।

"জ্ঞাতাজ্ঞাত-বিষয়ত্বাৎ পরিণামিনী হি বুদ্ধিঃ, তস্যাশ্চ বিষয়ো গবাদির্ঘটাদির্বা জ্ঞাতশ্চাজ্ঞাতশ্চেতি পরিণামিত্বং দর্শয়তি, সদা জ্ঞাতবিষয়ত্বস্তু পুরুষস্য অপরিণামিত্বং পরিদীপয়তি, কস্মাৎ, ন হি বুদ্ধিশ্চ নাম পুরুষবিষয়শ্চ স্যাদ্ গৃহীতাঽগৃহীতাচ, ইতি সিদ্ধং পুরুষস্য সদাজ্ঞাতবিষয়ত্বং, ততশ্চাপরিণামিত্বমিতি। × × × × গুণানাং তুপদ্রষ্টা পুরুষ ইতি, অতো ন সরূপঃ।"

অতএব দেখা যাইতেছে পাতঞ্জল-দর্শনের মতে চিতির দ্রষ্টা পুরুষের, বা আত্মার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না; কিন্তু চিত্ত বা বুদ্ধি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। বেদান্তেরও এ বিষয়ে ঐকমত্য আছে।

অয়মাত্মা ব্রহ্ম (অথর্ব্ববেদ)

অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা (উপনিষদ্)

নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাশ্চ তাভ্যঃ (বে, দ, ২।৩।১৭)

জ্ঞোঽতএব (বে, দ, ২।৩।১৮)

তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যবদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ। (বে, দ, ২।৩।২৯)

উপরি-উক্ত বেদ, ও উপনিষদ্বাক্য এবং বেদান্ত-দর্শনের সূত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বেদান্ত মতে আত্মার পরিণাম হয় না, বুদ্ধির পরিণামেই আত্মার পরিণাম হয় বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বেদান্ত গ্রন্থেও ইহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ পাওয়া যায়।

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণএকোমুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিঃস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব॥

(অষ্টাবক্র-সংহিতা)

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।

(ভগবদ্গীতা, ২।২৫।-)

যোগদর্শন ও বেদান্ত উভয়েরই মতে যখন আত্মা শুদ্ধ, অপরিণামী, নিত্যৈক-রূপ-স্বভাব, তখন এই দুঃখ বোধই কেন, কোথা হইতেই বা আসে, কেনই বা আত্মা বা আমি সংসারাবর্ত্তে পতিত হইয়া সুখ দুঃখের তরঙ্গাঘাতে ভীত, উল্লসিত ও বিধ্বস্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া থাকি? ইহার উত্তরে বেদান্ত বলেন অবিবেক, চিত্ত হইতে আত্মার পার্থক্যবোধের অভাব। যোগ-দর্শনও তাহাই বলিয়া থাকেন। তবে যোগ-দর্শন এই অবিবেক-নিবৃত্তির উপায় স্বরূপে পরিসংখ্যান (প্রসংখ্যান) বা যোগ-বিশেষের উপদেশ দিয়া থাকেন।

বেদান্তও তাহা অনুমোদন করেন, তবে বেদান্ত মতে অন্য একটী উপায়ও আছে, তাহার নাম জ্ঞান। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত বিচার করিলে দেখা যায় তন্মতে জ্ঞান ব্যতীত অন্য পন্থা নাই, তবে যোগ বা উপাসনা জ্ঞানের সহায় হইতে পারে। যাহা হউক তত সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করিবার এইক্ষণ প্রয়োজন নাই। উভয় মতেই চিত্তচিকিৎসার প্রয়োজন; জ্ঞান দ্বারাই হউক কিংবা যোগ দ্বারাই হউক। মন ও চিত্ত একই কথা—একই জিনিষ ক্রিয়াভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, যথা:—বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার। ভাষা-প্রয়োগের সৌকর্য্যার্থে এই চারিটি কোথাও মন নামে, কোথাও চিত্ত নামে অভিহিত। যোগী ও জ্ঞানী উভয়েই স্বীকার করিয়া থাকেন, চিত্ত বা মনই সুখ দুঃখের বন্ধ মুক্তির কারণ; অতএব চিত্ত-চিকিৎসাই সকলের কর্ত্তব্য। যোগ-দর্শন তদুদ্দেশ্যে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন। সমগ্র শাস্ত্রই মনের একাগ্রতার জন্য বিবিধ উপায় স্তরে স্তরে বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানীও ইহা পরিত্যাগ করেন নাই। জ্ঞানীও যে ইহার উপযোগিতা স্বীকার করেন তাহাও বেশ প্রমাণিত হইতে পারে। জ্ঞানীর প্রধান প্রমাণ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। "তত্ সাংখ্য-যোগাধিগম্যম্" বলিয়া উপনিষদ্ তার-স্বরে জ্ঞান ও যোগের প্রয়োজনীয়তা ও মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। যোগের উচ্চতর অঙ্গে যোগীর উদ্দেশ্য চিত্তক্ষয় বা চিত্তনাশ। চিত্তনাশই মোক্ষ। তাহাই যোগশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করিতেছেন গ্রন্থান্তে দুইটী সূত্র দ্বারা—

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণাম-ক্রম সমাপ্তি গুণানাম্।

(পাতঞ্জল-দর্শন, কৈবল্যপাদ, ৩২ সূত্র)

ভাবার্থ—তখন গুণত্রয়ের পরিণাম-নিবৃত্তি বা চিত্তনাশ হয়।

পুরুষার্থ-শূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ
কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।

(পাতঃ, কৈবল্যপাদ, ৩৪ সূত্র)

ভাবার্থ—গুণত্রয়ের প্রতিলোম ক্রমে প্রলয় হইলে, তাহাকে কৈবল্য বলে। তখন পুরুষ বা চৈতন্য স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ চিত্তের অভাব বশতঃ আর তাহাতে তাহার (চিত্তের) প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। বেদান্তও তাহা অনুমোদন করিতেছেন—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিবিষয়ং স্মৃতম্॥

পঞ্চদশী, যোগানন্দ, ১১৭ শ্লোক।

চিত্তমেব হি সংসারস্তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ।
যচ্চিত্তস্তন্ময়ো মর্ত্ত্যো গুহ্যমেতৎ সনাতনম্॥

ঐ, ঐ, ১১৩ শ্লোক।

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব।
যোগস্তদ্ বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্।

যোগবাশিষ্ঠ।

উপরি-উক্ত শ্লোকগুলি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে চিত্তজয় করাই মুক্তির কারণ, এবং এই পথের নাম যোগ; আর বেদান্ত-মতে অপর পথটীর নাম জ্ঞান। উভয়ই মুক্তির উপায়।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমরা যোগ ও জ্ঞানমার্গের উল্লেখ করিলাম, এবং পুরুষের অপরিণামিতা বা কৌটস্থ্যের ইঙ্গিতমাত্র করিয়া রাখিলাম। যোগ ও জ্ঞানের পার্থক্য বর্ণনকালে ঐ বিষয়ের বিস্তার করিয়া দেখাইব।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ত্রৈবিধ্য উল্লেখ করিয়াছি। বাকি রহিল অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাধি। ঐ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের স্বরূপ বুঝান অতীব কঠিন। মোটামুটি বলিতে গেলে ইহাই প্রকৃত যোগ বা সমাধি পদবাচ্য। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে একটিমাত্র বিষয়ে (ইন্দ্রিয় ও অস্মিতাকেও বিষয় বলা যায়; যাহা প্রমাশ্রিত বা প্রমেয়—non-subject বা object তাহাই বিষয়; করণ ও অস্মিতাও বিষয়রাশি মধ্যে নিক্ষিপ্ত) মন স্থিরীকৃত হইয়া থাকে; অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে মনের কোন বৃত্তিই থাকে না, মন নিষ্ক্রিয় হয়, সমস্ত বৃত্তিই অস্তমিত হয়; মন সংস্কারমাত্রে পরিলীন হয়। সুষুপ্তির দিকে লক্ষ্য করিলে অসম্প্রজ্ঞাত

যোগের কতক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থায়ও সমগ্র বৃত্তি অস্তমিত হয় নাই; তথায় নিদ্রা নামক বৃত্তিটী রহিয়াছে। সেই অবস্থা হইতে নিদ্রা নামক বৃত্তিটিকেও বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু পাঠকগণ ভুল করিবেন না। মন হইতে সুষুপ্তি বাদ দিলে জাগরণ আসিয়া পড়ে, তাহা কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নহে। নিম্নলিখিতরূপে (following equation এ) বিষয়টি প্রকাশ করা যাইতে পারে—

সুষুপ্ত মন—সুষুপ্তি বা নিদ্রা = স্বপ্নস্থিত মন বা জাগরিত মন। মনের সুষুপ্তি গেলেও যদি মন স্বপ্নরাজ্যে কিংবা জাগরণে না আইসে তবে মনের যে অবস্থা তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ স্বাভাবিকক্রমে বৃত্তিশূন্য মনের অবস্থান দৃষ্ট হয় না। মন সুষুপ্তিতে একটীমাত্র বৃত্তি নিয়া অবস্থিত হয়, স্বপ্নে ও জাগরণে ক্ষণে ক্ষণে বৃত্তিবাহুল্য। সুষুপ্ত মনকে যুক্ত কিংবা সমাহিত বা একাগ্র বলা হয় না, কারণ তাহা প্রাকৃতিক ক্রমে অহরহঃ সংসাধিত হইতেছে। অভ্যাসবলে মনের সমস্ত বৃত্তি রোধ করিতে পারিলে, অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে পারে। ইহাতে মনের কোন আলম্বন নাই। বিষয়টী বড়ই গুরুতর। ইহার সন্ধান tripartite division of mind নিয়া বিচারশীল শাস্ত্রে মিলিবে না। অতি সূক্ষ্ম বিচার না করিতে পারিলে ইহার তত্ত্বোদ্ঘাটন সুদূর-পরাহত। বিষয়টী বুঝিতেই এত শ্রম। উহা হইতে বুদ্ধি পরাহত হইয়া আইসে। ঐ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেও আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

যাহা হউক মোটামুটি আমরা কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিলাম মাত্র। বারান্তরে আমরা ইহার আরও আলোচনা করিব। এই দুরবগাহ সমাধিতত্ত্ব বুঝিলে তবে জ্ঞানপথ কিয়ৎপরিমাণে বিশদীকৃত হইতে পারে। যোগপথের সমাধি ও বিশুদ্ধ জ্ঞানপথের সমাধির পার্থক্য যদি সুযোগ হয় তবে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

সম্প্রতি, বিশুদ্ধ-বেদান্ত-পথ-প্রদর্শক বঙ্গের নবীন ঋষি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সোঽহং স্বামী যোগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে দুই একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শ্রুতি-মতে যোগ স্থির ইন্দ্রিয় ধারণ।
চিত্তবৃত্তি-রোধ যোগ বলে পাতঞ্জল।

জীব ব্রহ্মে ঐক্য যোগ তন্ত্রের বচন।
সংহিতাতে যোগ, ত্যাগে সঙ্কল্প সকল!

মন্ত্র, হঠ, লয়, রাজ, যোগ-চতুষ্টয়।
মৃদু মধ্যমাদি চারি সাধক তাহার।
নিম্ন যোগ শাস্ত্র ইহা করিছে নির্ণয়।
রাজ-যোগী শ্রেষ্ঠ, হয় ভবসিন্ধু পার॥

চিত্তবৃত্তি রোধে হয় ইন্দ্রিয় সংযত।
সঙ্কল্প বিহনে মন স্বতঃ লুপ্ত হয়।
মনোরূপী মায়া যবে হয় অপগত,
জীব ব্রহ্মে ভেদজ্ঞান সম্ভাবিত নয়॥

বৈরাগ্য-অনলে যার দগ্ধ চিত্ত-মল
অন্য সাধনের তার নাহি প্রয়োজন।
ত্যজি দেহেন্দ্রিয় আর বিষয় সকল
অনায়াসে আত্ম-সংস্থ হয় তার মন॥

নিম্ন অধিকারী তরে হয়েছে কল্পিত
বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ, দ্বিবিধ সাধন।
বহিরঙ্গে অন্তরায় হ'লে বিদূরিত
অন্তরঙ্গে যোগক্ষম হয় জীবগণ॥

সংযম সাধনে নানা সিদ্ধিলাভ হয়,
কিন্তু তাহা মুক্তি-পথে বিঘ্নের কারণ।
সিদ্ধিতেও হয় যবে বৈরাগ্য উদয়
পরম কৈবল্য তবে লভে যোগিজন॥

প্রাণায়াম আসনাদি দৈহিক সাধনে
হয় দেহ লঘু দৃঢ় শাস্ত্রের বচন।
ব্রহ্মচর্য্য আর বিজ্ঞ আচার্য্য বিহনে
দৈহিক সাধন হয় রোগের কারণ॥

সবিকল্প সমাধি বা ঐকাগ্র্য সময়
জ্ঞান জ্ঞাতা প্রভাহীন, জ্ঞেয় প্রকাশিত।
জ্ঞান জ্ঞাতা বিনা জ্ঞেয় অনুভব্য নয়,
সবিকল্পে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা বিরাজিত॥

শুধু মন লয় নহে সমাধি কারণ।
হয় মূর্চ্ছা সুপ্তিতেও সদা মন লয়।
আত্মাতে সম্যক স্থিতি সমাধি-লক্ষণ
অনাত্মজ্ঞ জীবে তাহা সম্ভাবিত নয়॥

শাণিত ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারের মতন
যোগের সে সূক্ষ্ম পথ দুস্তর দুর্গম;
বৈরাগ্য-বর্ম্মেতে অঙ্গ করি আবরণ
করে জ্ঞানিগণ যোগ-মার্গ অতিক্রম॥

* * * *

প্রথম অভ্যাসে মনের বিলয়ে
প্রবুদ্ধ সন্ন্যাসী জন।
বিজলীর প্রায় ক্ষণেকের তরে
করে আত্মদরশন॥

নিয়ত অভ্যাসে আত্ম-অনুভূতি
যবে স্থিতিশীল হয়।
তাহাই সমাধি, অপরোক্ষ জ্ঞান,
নির্ব্বাণ, কারণে লয়॥

রাজর্ষি দেবর্ষি মহর্ষি বাঞ্ছিত
নিরালম্ব জ্ঞানযোগ।
এই যোগে যোগী হয়ে জীবন্মুক্ত
করে আত্মানন্দ ভোগ॥

ক্রমে কাল বশে দেহ অবসানে,
হয় ভূমা ব্রহ্মে লয়।

নাহি অন্য পন্থা . ব্রহ্ম-পদ-লাভে
করে শ্রুতি নিরূপণ ॥

সোঽহং গীতা, ২য় সংস্করণ, যোগ ও উপসংহার ॥



ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা।

লেখক—সম্পাদক।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিতেন না এবং আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তাঁহাদের অভিমত ভ্রমশূন্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের ইংরাজী শিক্ষিত পণ্ডিতদিগের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা জানি না। তবে ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বেও আমি শুনিয়াছি যে, রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণাদি হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা করা বাতুলের কর্ম্ম। তাঁহারা বলেন বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের ভারতবর্ষের কোন ইতিহাসই নাই, সবই কবি-কল্পনা, উপন্যাস বা গল্প। কিছুদিন পরে Cambridge History of India Vol I. পাঠ করিতে করিতে ৩০৭ পৃষ্ঠায় দেখিলাম :—

That the war between the Kurus and Pandus is historical and that it took place in ancient times can not be doubted, however much its story has been overloaded with legend, & however late may be the form in which it has been handed down. Cambridge History of India ইউরোপের অনেক প্রধান প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা লিখিত হইতেছে। এই গ্রন্থের সকল মতের সহিত আমি একমত হইতে পারি না, কিন্তু তথাপি লেখকদিগের শ্রম, গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না করিয়া পারি না। যাউক সে কথা। এই গ্রন্থের মত এই যে যথার্থ বৃত্তান্ত গল্পের দ্বারা যতই কেন না ভারাক্রান্ত হইয়া থাকুক, এবং যে আকারে উহা আমাদিগের নিকট পৌঁছিয়াছে তাহা যতই আধুনিক হউক না কেন, কুরু ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে

যে সত্য সত্যই প্রাচীন কালে একটি যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

ভগবান বুদ্ধদেবের জন্ম হয় খৃষ্টের জন্মের ৫৬৩ বৎসর পূর্ব্বে। তিনি ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং ৬ বৎসর তপস্যার পর বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসরেই মগধের রাজা বিম্বিসরের সহিত তাঁহার দেখা হয় এবং ৮০ বৎসর বয়সে তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। তাঁহার নির্ব্বাণের ৮ বৎসর পূর্ব্বে বিম্বিসরের পুত্র অজাতশত্রু রাজা হয়েন। বুদ্ধদেবের সহিত অজাতশত্রুরও অনেকবার দেখা হইয়াছিল।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বিম্বিসার মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিম্বিসারের পিতা ক্ষত্রৌজা, তৎপিতা ক্ষেমধর্ম্মা, তৎপিতা কামবর্ণ ও তৎপিতা শিশুনাগ। বিম্বিসারের পূর্ব্বে যথাক্রমে ইঁহারা মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শিশুনাগের পূর্ব্বে যথাক্রমে পাঁচজন প্রদ্যোতরাজা মগধে রাজত্ব করেন। শিশুনাগের পূর্ব্বে যিনি রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম নন্দিবর্দ্ধন। তাঁহার পূর্ব্বে তৎপিতা জনক, তৎপূর্ব্বে জনকের পিতা বিশাখযূপ, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা পালক, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা শুনিক রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শুনিকের পূর্ব্বে রাজা ছিলেন রিপুঞ্জয়। শুনিক রিপুঞ্জয়ের কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি প্রভু রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন। রিপুঞ্জয়ের পূর্ব্বে রাজা ছিলেন তৎপিতা বিশ্বজিৎ, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা সত্যজিৎ, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা সুনীত, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা সুবল, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা সুমতি, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা দৃঢ়সেন, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা সুশ্রম, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা ধর্ম্ম, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা সুব্রত, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা ক্ষেম্য, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা সুচি, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা বিপ্র, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা শ্রুতঞ্জয়, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা শ্রেনজিৎ, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা বৃহৎকর্ম্মা, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা সুক্ষত্র, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা নিরমিত্র, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা অযুতায়ুঃ, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা শ্রুতবান্, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা সোমাপি, তৎপূর্ব্বে তৎপিতা সহদেব মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সহদেব জরাসন্ধের পুত্র। এই সহদেব কুরু-ক্ষেত্রের মহাসমরে যোগদান করিয়াছিলেন।

এখানে আমরা দেখিতেছি, সহদেব হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত ২২ জন রাজা মগধে রাজত্ব করেন, তৎপরে প্রদ্যোতবংশীয় শুনিক হইতে নন্দিবর্দ্ধন পর্য্যন্ত

৫ জন রাজা রাজত্ব করেন, তৎপরে শিশুনাগ বংশের ৪ জন রাজত্ব করেন। ঐ বংশের পঞ্চম রাজা বিম্বিসার। যদি প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল গড়ে ৩০ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে ২২+৫+৪=৩১ জন রাজার রাজত্বকাল ৩১×৩০=৯৩০ বৎসর হয়। এ হিসাবে বুদ্ধের সময়ের ৯৩০ বৎসর পূর্ব্বে, খৃষ্টের সময়ের (৯৩০+৫০০=) ১৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে এবং বর্ত্তমান সময় হইতে (১৪৩০+১৯২৩=) ৩৩৫৩ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল স্থির করা যায়।

মগধরাজ সহদেব হইতে ঊর্দ্ধদিকে গণনা করিয়া যদি আমরা সত্যযুগে যাইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা দেখিব—সহদেবের পিতা জরাসন্ধ, তৎপিতা বৃহদ্রথ, তৎপিতা উপরিচরবসু, তৎপিতা কৃতক, তৎপিতা চ্যবন, তৎপিতা সুহোত্র, তৎপিতা সুধন্বুঃ, তৎপিতা কুরু। কুরু হইতে কুরুক্ষেত্র নামের উৎপত্তি হয়। কুরুর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের নাম যথাক্রমে সংবরণ, ঋক্ষ, অজমীঢ়, হস্তী (ইনি হস্তিনাপুরীর প্রতিষ্ঠা করেন), সুহোত্র, বৃহৎক্ষত্র, মন্যু, বিতথ, ভরত (ইঁহার রাজ্য বলিয়া ভারতবর্ষ নামকরণ হয়।), দুষ্মন্ত, অনিল, তংসু, অন্তিনার, কতয়, রৌদ্রাশ্ব, অহম্পাতি, সম্পাতি, বহুগব, সুদ্যুম্ন, অভয়দ, মনস্যু, প্রবীর, প্রচিন্বান্, জনমেয়, পুরু, যযাতি, নহুষ, আয়ু, পুরুরবাঃ। বুধ, পুরুরবার পিতা, বুধের পিতা সোম, অত্রি সোমের পিতা। অত্রির পিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। বুধ, সোম, অত্রি, ব্রহ্মা—ইঁহারা আমাদের গণনার বাহিরে, ইহারা দেবাত্মা। পুরুরবাঃ সোমবংশের প্রথম রাজা। তিনি সত্যযুগের মানুষ। পুরুরবা হইতে জরাসন্ধ ৩৭ পুরুষ। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে সহদেব পর্য্যন্ত পাইয়াছি ৩১ জন রাজা, জরাসন্ধ হইতে পাইলাম ৩৭ জন রাজা, সাকল্যে ৬৮ জন রাজার রাজত্বকাল অতিক্রম করিলে আমরা সত্যযুগের এক অংশ পাইতে পারি। পূর্ব্ব নিয়মে ৩০ বৎসর একজনের রাজ্যকাল ধরিলে বুদ্ধপূর্ব্ব (৬৮×৩০=) ২০৪০ বর্ষ পাই, উহার সহিত ৫০০ বর্ষ যোগ করিলে ২৫৪০ সংখ্যা পাই। খৃষ্টের ২৫৪০ বৎসর পূর্ব্বে সত্যযুগ ছিল, এরূপ ধারণার একটী কারণ এখানে আমরা পাই। বর্ত্তমানকাল হইতে ঐ সময় (২৫৪০+১৯২৩=) ৪৪৬৩ বৎসর পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হয়। যুধিষ্ঠির কলির প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন, সহদেবও তৎসময়ে ছিলেন। বর্ত্তমানকাল হইতে সহদেবের সময় ৩৩৫৩ বৎসর পূর্ব্বোক্তকাল ৪৪৬৩ হইতে বিয়োগ করিলে আমরা অবশিষ্ট যে ১১১০ পাই, তাহাই দ্বাপর ও ত্রেতার এবং সত্যের এক

ভাগের সময়, সুতরাং যুগ-পরিমাণ লক্ষ কোটি প্রভৃতি বৃহত্তর সংখ্যায় গণনা করা উচিত বলিয়া মনে হয় না।

পৌরাণিক বর্ণনা হইতে জানা যায় এ দেশীয় রাজবংশের উৎপত্তি চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি দেবতা হইতে। চন্দ্রবংশের রাজগণের মধ্যে নহুষ, যদু, দ্রুহ্যু, অনু, পুরু, তুর্ব্বসু প্রভৃতি শব্দ মনুষ্যবাচক পর্য্যায় শব্দরূপে আমরা নিরুক্তে (মহর্ষি যাস্ক কৃত বৈদিক অভিধানে) পাই। আমাদের মনে হয় বংশ-পরিচয় দিতে গিয়া যখন নাম-ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই, তখনই আকাশের চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে বহু বিস্মৃত নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু পরিজ্ঞাত নাম-সমূহ হইতে একটা ধারণায় উপনীত হওয়ার বাধা হয় নাই। পুরাণ-পক্ষপাতীরা হিন্দুসভ্যতার বয়স লক্ষ কোটিতে গণনা করেন ; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের পরিমাণ বহু বর্ষ বলেন ; এদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বুদ্ধের পূর্ব্বের কিছুই মানিতে চাহেন না। আমরা ইহার মধ্যপন্থায় চলিতে চাই।

মহাভারত-বর্ণিত পাণ্ডুরাজবংশের নাম-তালিকা হইতেও আমরা পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহ বুঝিতে পারি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুন ও তৎপুত্র অভিমন্যু ব্যাপৃত ছিলেন। অর্জ্জুনের অধস্তন পুরুষ উদয়ন বুদ্ধের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, ইতিহাস একথা স্বীকার করেন। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ, তৎপুত্র জনমেজয়। তৎপরবর্ত্তী তদ্বংশীয় নৃপতিগণের নাম যথাক্রমে শতানীক, অশ্বমেধদত্ত, অধিসোমকৃষ্ণ, নিচক্ষু (ইনি কৌশাম্বী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন), উষ্ণ, চিত্ররথ, সূচীরথ, ধৃতিমান্, সুষেণ, সুনীথ, ঋচ, নৃচক্ষুঃ, সুখাবল, পরিপ্লব, সুনয়, মেধাবী, নৃপঞ্জয়, মৃদু, তিগ্ম, বৃহদ্রথ, বসুদান, শতানীক, উদয়ন। উদয়নের পরে অহিনর, খণ্ডপাণি, নরমিত্র, ও ক্ষেমক যথাক্রমে রাজত্ব করেন। ক্ষেমকের পর এই বংশ বিলুপ্ত হয়। অর্জ্জুন হইতে উদয়ন ২৭ পুরুষ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নির্ণয় করিলে বুদ্ধের ২৭ × ৩০ = ৮১০ বৎসর পূর্ব্বে অর্জ্জুন ছিলেন। বিম্বিসার হইতে সহদেব ৩১ পুরুষ। উদয়ন হইতে অর্জ্জুন ২৭ পুরুষ। এখানে পাণ্ডুবংশ-তালিকায় ৪ পুরুষের নাম বাদ গিয়াছে কি না, বলা যায় না। অর্জ্জুন-বংশীয় প্রত্যেক রাজা মগধরাজ অপেক্ষা ৪ বৎসর অধিক রাজত্ব করিয়াছিলেন মনে করিলে আমরা ইহাদের রাজত্ব হইতেও ঐ একই সময় পাইতে পারি। এপক্ষেও বুদ্ধের (ন্যূনাধিক) ৯ শত বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্ত একরূপ অক্ষুণ্ণই থাকে।

অর্জ্জুনের ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের নাম তালিকার আলোচনা করিয়াও আমরা দ্বাপর, ত্রেতা, ও সত্য যুগের সন্ধান লইতে চেষ্টা করিব। অর্জ্জুনের পিতা পাণ্ডু, পাণ্ডুর পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের নাম যথা—বিচিত্রবীর্য্য, শান্তনু, প্রতীপ, দিলীপ, ভীম, ঋক্ষ, দেবাতিথি, ক্রোধন, অযুতায়ু, আরাবী, জয়সেন, সার্ব্বভৌম, বিদূরথ, সুরথ, জহ্নু, কুরু। কুরুর পুত্র জহ্নু হইতে পাণ্ডুবংশের বিস্তার হয়। এবং কুরুর অপর পুত্র সধনু হইতে মগধ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন ও মগধরাজ সহদেব সমসাময়িক। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে উভয়েই ছিলেন। অর্জ্জুন হইতে কুরু ১৮ পুরুষ ও সহদেব হইতে কুরু মাত্র ৯ পুরুষ উর্দ্ধে। এখানে হয় মগধবংশতালিকার অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে হয়, না হয় মগধবংশীয় রাজারা দীর্ঘজীবী ছিলেন স্বীকার করিতে হয়। অন্যথা কুরুর একধারায় অধস্তন ৯ পুরুষের সঙ্গে অন্য ধারায় অধস্তন ১৮ পুরুষের সমসাময়িকতা কিরূপে সম্ভব হয়?

কুরুর পিতা সংবরণ হইতে পুরুরবা ২৯ পুরুষ। অর্জ্জুন হইতে কুরু ১৮ পুরুষ। সহদেব হইতে কুরু ৯ পুরুষ, কুরু হইতে পুরুরবা ২৯ পুরুষ। একদিকে সাতচল্লিশ পুরুষ, অন্যদিকে ৩৮ পুরুষ। বংশপত্রিকায় ভ্রম বা এক বংশীয়দের দীর্ঘজীবন ও অন্য বংশীয়দের স্বল্প জীবন ভিন্ন ইহার আর কি সঙ্গতি থাকিতে পারে? মোটের উপর এই দুই ধারার আলোচনায় অনেকটা সদৃশ ফল পাওয়া যায়। পৃথক্ গণনা করিলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৪৭ × ৩০ = ১৪১০ বর্ষ পূর্ব্বে সত্য যুগ স্থির হয়। উহার সহিত ৮১০ বৎসর যোগ করিলে বুদ্ধের (১৪১০ + ৮১০ =) ২২২০ বর্ষ পূর্ব্বে সত্যযুগ পাওয়া যায়। বুদ্ধপূর্ব্ব ২০৪০ বর্ষে অথবা ২২২০ বর্ষে সত্যযুগের এক অংশ আমরা পাই।

সূর্য্যবংশের নামতালিকা হইতেও অনেকাংশে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। প্রসেনজিতের পূর্ব্বপুরুষ বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। বৃহদ্বল অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন। প্রসেনজিৎ ও বৃহদ্বলের মধ্যবর্ত্তী রাজগণের সংখ্যা হইতে এই সময়ের পরিমাণ নিরূপণ করা যায়।

বৃহদ্বলের পুত্র বৃহৎক্ষান, তৎপুত্র গুরুক্ষেপ, তৎপুত্র বৎস, তৎপুত্র ব্যোমব্যুহ, তৎপুত্র প্রতিব্যোম, তৎপুত্র দিবাকর। তৎপরবর্ত্তী রাজগণ যথা—সহদেব, মরুদেব, সুনক্ষত্র, কিন্নর, অন্তরীক্ষ, সুবর্ণ, অমিত্রজিৎ, বৃহদ্রাজ, ধর্ম্মী, কৃতঞ্জয়, রণঞ্জয়, শাক্য, শুদ্ধোদন, রাহুল, প্রসেনজিৎ, ক্ষুদ্রক, কুণ্ডক, সুরথ, সুমিত্র।

সুমিত্র ইক্ষ্বাকুবংশের শেষ রাজা। ইহার পর এই বংশ বিলুপ্ত হয়। পুরাণে আছে—"ইক্ষ্বাকুণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।"

এখানে আমরা দেখিতেছি বৃহদ্বল হইতে অধস্তন ২২ পুরুষ প্রসেনজিৎ। পুর্ব্বোক্ত নিয়মে এই সময়ের পরিমাণ (২২ × ৩০ =) ৬৬০ বৎসর হয়। যদি ইহাদের প্রত্যেকের রাজ্যকাল গড়ে ৪০ বৎসর ধরা যায়, তবে (২২ × ৪০ =) ৮৮০ বৎসর হয়। মগধরাজবংশ ও পাণ্ডুরাজবংশের নামতালিকা হইতে পুর্ব্বে আমরা ৯৩০ ও ৮১০ বুদ্ধপূর্ব্ব বৎসর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় পাইয়াছি। সূর্য্য-বংশের এই সকল রাজা প্রত্যেকে ঐ বংশের রাজা অপেক্ষা অধিককাল রাজত্ব করিয়াছিলেন মনে করিলে, অথবা এই বংশতালিকায় ৮।৯টী নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে মনে করিলেই সামঞ্জস্য হয়। অনপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় বুদ্ধের পুর্ব্বে ৭ম হইতে দশম শ তাব্দী স্থির করিতে হয়। আমাদের মতানুসারে সামঞ্জস্য করিলে বুদ্ধপূর্ব্ব ৯ শতাব্দী স্থির হয়।

এই বংশের ঊর্দ্ধতনগণের নামতালিকার অনুসরণ করিয়াও আমরা সত্য ত্রেতার সন্ধান পাইতে পারি। বৃহদ্বলের ৩৩ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী রামচন্দ্র ত্রেতার ব্যক্তি। বৃহদ্বল, বিশ্রুতবান্, মহস্বান্, অমর্ষ, সুগন্ধি, প্রসুশ্রুত, মরু, শীঘ্র, অগ্নিবর্ণ, সুদর্শন, ধ্রুবসন্ধি, পুষ্য, হিরণ্যনাভ, বিশ্বসহ, ব্যুথিতাশ্ব, শঙ্খনাভ, বজ্রনাভ, উক্থ্য, ছল, দল, পারিপাত্র, রুরু, রূপ. অহিনস্ত, দেবানীক, ক্ষেমধন্বা, পুণ্ডরীক, লভ, নল, নিষদ, অতিথি, কুশ, রাম।

এই বংশের অগ্নিবর্ণ প্রভৃতি রাজগণ অসংযত হওয়ায় অচিরে দেহত্যাগ করেন—ইহা সংস্কৃত-সাহিত্যসেবীর অগোচর নয়। আমরা ৩০ বৎসরে পুরুষ ধরিয়া স্থির করিতে পারি যে, কলির প্রথমের বৃহদ্বল হইতে ত্রেতার রামচন্দ্র ৩৩ × ৩০ = ৯৯০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক প্রসেনজিৎ হইতে ত্রেতার রাম (৯৯০ + ৬৬০ =) ১৬৫০ বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন। ৬৬০ স্থলে ৮৮০ ধরিলে (৯৯০ + ৮৮০ =) ১৮৭০ বৎসর হয়।

সূর্য্যবংশে ২২ পুরুষে (প্রসেনজিত হইতে বৃহদ্বল) ৬৬০ বৎসর ধরিলে খৃঃ পুঃ ৬৬০ + ৫০০ = ১১৬০ বৎসরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটিয়াছিল মনে করিতে হয়। কেম্ব্রিজের ভারতীয় ইতিহাসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খৃঃ পুঃ সহস্র বর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা বিভিন্ন গণনায় খৃঃ পুঃ ১১৬০, ১৩১০ ও ১৪৩০ বর্ষ পাইয়াছি।

অঙ্গরাজ কর্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। কর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী

অঙ্গরাজগণের নামতালিকা হইতেও আমরা ত্রেতার রামচন্দ্রের বা তাঁহার পিতা দশরথের সমসাময়িক রোমপাদের সন্ধান পাই। কর্ণ, অধিরথ, সত্যকর্ম্মা, ধৃতব্রত, ধৃতি, বিজয়, জয়দ্রথ, বৃহন্মনাঃ, বৃহদ্ভানু, বৃহৎকর্ম্মা, বৃহদ্রথ, ভদ্ররথ, হর্য্যক্ষ, চম্প, পৃথুলাক্ষ, তুরঙ্গ, রোমপাদ, ইনি দশরথের শান্তা নাম্নী কন্যাকে পোষ্যপুত্রী গ্রহণ করেন, ইনি দশরথের সখা ছিলেন। পরে ইঁহার পুত্র তুরঙ্গ জন্মেন ও তিনি রাজা হন। রোমপাদের পূর্ব্বে রাজা ছিলেন চিত্ররথ, তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মরথ, তৎপূর্ব্বে দিবিরথ, তৎপূর্ব্বে পার, তৎপূর্ব্বে অঙ্গ, তৎপূর্ব্বে বলি। অঙ্গের পূর্ব্বে যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সকলেই অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। রোমপাদ হইতে কর্ণ ১৭ পুরুষ। অথচ রামচন্দ্র হইতে বৃহদ্বল ৩৩ পুরুষ। দশরথ হইতে বৃহদ্বল (কর্ণের সমসাময়িক) ৩৪ পুরুষ, রোমপাদ হইতে ১৭ পুরুষ। ইহার সঙ্গতির জন্য বলা যায়, অঙ্গরাজবংশ দীর্ঘজীবী ছিলেন, এবং সূর্য্যবংশীয় অনেক রাজা ব্যাবায়ী যক্ষ্মাগ্রস্ত হওয়ায় অল্পায়ুঃ হইয়াছিলেন। ৩৪ × ৩০ = ১০২০, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ১০২০ বর্ষ পূর্ব্বে ত্রেতার দশরথ ছিলেন বলা যায়। কিন্তু রোমপাদ ঐ নিয়মে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের (১৭ × ৩০ =) ৫১০ পূর্ব্বে ছিলেন মনে করিতে হয়। যদি সূর্য্যবশীয় রাজাদের রাজ্যভোগ অল্প করিয়া ধরা হয় অর্থাৎ প্রত্যেকের গড়ে ২০ বৎসর ধরা যায়, আর অঙ্গরাজগণের রাজ্য কাল অধিক ধরা হয় অর্থাৎ প্রত্যেকের গড়ে ৪০ বৎসর ধরা যায়, তবে সংখ্যায় মিল হইতে পারে। আমরা বড় সংখ্যাটীই গ্রহণ করিলাম। তাহা হইলেও ত্রেতার সময় কলির প্রথমের কুরুক্ষেত্র সময় হইতে সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে হয়।

আমরা পূর্ব্বে 'বলি'রাজার কথা বলিয়াছি। বলির পিতা সুতপা, তৎপিতা হেম, তৎপিতা উষদ্রথ, তৎপিতা তিতিক্ষু, তৎপিতা মহামনাঃ, তৎপিতা মহামণি, তৎপিতা জন্মেজয়, তৎপিতা পুরঞ্জয়, তৎপিতা মৃত্যুঞ্জয়, তৎপিতা কালানর, তৎপিতা সভানর, তৎপিতা অনু, তৎপিতা যযাতি। কর্ণ হইতে উর্দ্ধতন ৩৬ পুরুষ যযাতি। অর্জ্জুন হইতে ৪০ পুরুষ যযাতি। এ পার্থক্য সামান্যই। অঙ্গরাজবংশের রাজত্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল (৩ বৎসর অধিক) স্বীকার করিলেই ইহার সামঞ্জস্য হয়।

এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর আলোচনা হইতে আমরা বুঝিলাম—যুগের বৎসর-পরিমাণ লক্ষ কোটীতে সামঞ্জস্য হওয়া যত কঠিন, এ পন্থায় (ঐতিহাসিক বিচারে) তত কঠিন নয়।

বলির পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সূহ্ম—স্ব স্ব নামে ৫টী রাজ্য

স্থাপন করেন। বর্ত্তমান মুঙ্গের ভাগলপুর প্রাচীন অঙ্গরাজ্য, বঙ্গরাজ্য বর্ত্তমান বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও যশোহর। পুণ্ড্র ছোটনাগপুর, সূহ্ম বাঁকুড়া মেদিনীপুর, এবং কলিঙ্গ রাজ্য বর্ত্তমান উড়িষ্যা।

বুদ্ধের সময়ে অঙ্গদেশের স্বাতন্ত্র্য ছিল না। বিম্বিসার অঙ্গদেশ জয় করিয়া স্বরাষ্ট্রভুক্ত করেন। পাণ্ডবদিগের কুটুম্ব ছিলেন পাঞ্চালবংশীয়েরা। পাণ্ডব-পত্নীর নাম ছিল দ্রৌপদী। তিনি পাঞ্চালী বা পঞ্চালবংশের রাজার দুহিতা। কুরুবংশীয়দের রাজধানী ছিল হস্তিনা এবং ইন্দ্রপ্রস্থ। উত্তর পঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্র (বেরিলি রামনগরের কাছে)। দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল্য ফরাক্কাবাদ-কাম্পিল-গ্রাম। রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে যদুবংশের রাজত্ব ছিল। যদুবংশের শূরসেনশাখার রাজত্ব ছিল মথুরা জেলা ও তাহার দক্ষিণ অংশ। মথুরা ছিল রাজধানী। কৃষ্ণ ছিলেন শূরসেন-বংশীয়। শূরসেন রাজ্যের পশ্চিমে মৎস্যদেশ। আধুনিক আলোয়ার জয়-পুর ও ভরতপুরের কতক অংশ মৎস্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৎস্যদেশের রাজধানী ছিল উপলব্য ও বিরাট নগর। উপলব্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই জানা যায় নাই। বিরাটনগরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান জয়পুরে বিদ্যমান।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

কাশীতে হিন্দু-মহাসভা।

বিগত ২০শে আগষ্ট এবং তৎপরবর্ত্তী কতিপয় দিবস ধরিয়া কাশীধামে হিন্দু-মহাসভার অধিবেশন হইয়াছে। কাশীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহাশয় ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার উদ্দেশ্য—হিন্দুদিগের মধ্যে একতা-সংস্থাপন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সদ্ভাব-সংরক্ষণ। সভায় হিন্দু শব্দের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা

দ্বারা বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী সকল সম্প্রদায়ই 'হিন্দু' পর্য্যায়-ভুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন। সভাতে শিখ বৌদ্ধ প্রভৃতি অনেকে যোগদানও করিয়াছেন। মহাবোধিসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনাগরিক ধর্ম্মপাল মহোদয়ও সভায় যোগদান করিয়াছেন।

সভার উদ্দেশ্য মহৎ। পণ্ডিত মালব্য মহাশয় বহুজ্ঞ ও কৃতী পুরুষ। বহু কার্য্যে আমরা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার কৃতকার্য্যতা ও হিন্দুসভার সাফল্য কামনা করি।

কিন্তু সভা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য কতদূর সংসাধিত হইবে সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তার কারণ আছে। আমাদের বক্তব্য নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

বর্ণভেদ, ভাষাভেদ, মতভেদ, আচারভেদ হেতু হিন্দুসমাজে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর উদ্ভব হইয়াছে যে ঐ সকল গণ্ডীস্থিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা সংস্থাপন করা অনেকের মতে একরূপ দুঃসাধ্য কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আদিম এক এক বর্ণের মধ্যে শত শত বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে। কোনও কোনও বর্ণের মানবের জল ব্যবহার্য্য নয়, কোনও বর্ণের মানব বা অস্পৃশ্য, এবং কোনও কোনও বর্ণের মানবের ছায়া পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য। জন্মান্তর ও অদৃষ্ট-বাদে বিশ্বাসী ও অজ্ঞ ব্যক্তি অনেক সময় সামাজিক হীনতা অঙ্গীকার করিয়া লইয়া থাকে। কিন্তু ঐ বিশ্বাস এবং অজ্ঞতার অভাব হইলে কেহই অপরের অধীনতা বা দাসত্ব স্বীকার করিতে সম্মত হয় না। আজ যদি একজন হিন্দু মেথর শিক্ষিত হইয়া কোনও প্রদেশের মন্ত্রিত্বপদ লাভ করেন, তাহা হইলে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত কিরূপ সামাজিক ব্যবহার করিবেন, তাহা বর্ত্তমানে স্থির করা সহজ নহে। কিন্তু প্রাচীনকালে ঋষিগণ একসময় এ সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। কবশ মাতঙ্গ প্রভৃতি তাহার উদাহরণস্থল। সমাজে এমন কেহ নেতা কি এখন আছেন যাঁহার আদেশে বর্ত্তমান সমাজ কোনও উপযুক্ত চণ্ডালকে 'ঋষি' বলিয়া স্বীকার করিবে? "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ" উক্তি আছে বটে, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কি বর্ত্তমানে আছে? যদি থাকে, তাহা কি এই প্রকার সভাসমিতির দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে?—অর্থাৎ কেবল কতকগুলি মন্তব্য গ্রহণের দ্বারা কি সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হইতে পারে? পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের ন্যায় কোনও নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ কি কোনও "দ্বিজশ্রেষ্ঠ চণ্ডালের" জল

পান করিতে প্রস্তুত আছেন? যদি তাহা না থাকেন, তাহা হইলে ঐ দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ চণ্ডালের কি হিন্দুসমাজের প্রতি অনুরক্তি থাকা সম্ভব?

যখন দেশব্যাপী বন্যা হয়, তখন সব জলাশয়—ক্ষুদ্র বৃহৎ সবই একত্ব লাভ করে। সামাজিক প্লাবনেও উহা হইতে পারে। পরাক্রমশালী রাজার আজ্ঞায় একতা সম্ভব হইতে পারে। মহাপুরুষের আবির্ভাবেও এরূপ হইতে পারে। হিন্দুসমাজে কোনও প্লাবন দেখা যায় না। স্রোতোহীনা সরিতের ন্যায় হিন্দুসমাজ অচলভাবে রহিয়াছে। হিন্দু রাজা নাই, কোনও ক্রান্তদর্শী মুনি ঋষি তপস্বী নাই, কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাবও দেখিতেছি না! এ অবস্থায় সামাজিক সাম্য-সংস্থাপন অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য ত বটেই। তবে কর্ত্তব্য আছে। কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। বৈষম্য ধীরে ধীরে যতদূর দূরীভূত হয় ততই ভাল, কালে কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে আরব্ধ কার্য্য সহজ-সাধ্য হইবে। সুতরাং আমরা হিন্দু-মহাসভা হইতে যদিও আশু কোনও বিশেষ ফললাভের আশা করি না, তথাপি শিক্ষাবিস্তার, স্বার্থত্যাগ, বিবেকবুদ্ধি, দেশবৎসলতার বৃদ্ধির সহিত সমাজের সাম্যের ব্যবস্থা কথঞ্চিৎ পরিমাণে না হইয়া পারে না। বিদেশীয়দিগের সংস্রবে হিন্দুজাতি তাহাদের সমাজের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এবং এই দুর্ব্বলতা যত অধিক উপলব্ধ হইবে, ততই তাহার প্রতীকারের চেষ্টা বলবতী হইবার সম্ভাবনা। অদ্য আমরা এই স্থানে প্রবন্ধ শেষ করিলাম। সময়ান্তরে ইহার বিশেষ আলোচনা করিবার অভিপ্রায় রহিল।

আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয়—বিগত ৪ঠা ভাদ্র কাশীমবাজার মহারাজের স্থাপিত কলিকাতা ২০নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে অবৈতনিক আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটী দাতব্য ঔষধালয় খোলা হইয়াছে। কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ ভিষক্‌শাস্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে উহা পরিচালিত হইতেছে।

হিন্দু দেব-মন্দিরে হিন্দু-বেশধারী সাহেব—প্রকাশ এই যে আমেরিকা হইতে আগত একদল সাহেব হিন্দুর ন্যায় বেশভূষা করিয়া হিন্দুর তীর্থে তীর্থে দেবতা দর্শন করিয়া বেড়াইতেছে। কি উদ্দেশ্যে ইহারা এইরূপ করিতেছে, তাহা কে জানে।

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩০শ বর্ষ, ৩০শ খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আশ্বিন।

১৩৩০ সাল।
১৮৪৫ শকাব্দাঃ

"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার বি, এ।

মানব সুখের কাঙ্গাল। সুখের আশায় সে সকল কাজ করে। সুখই যেন তাহার নিয়ন্তা। তাই সত্যদ্রষ্টা ঋষির বাণী জলদগম্ভীর নিনাদে ভারত-আকাশ কম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইয়াছিল "আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দে বর্ত্তন্তে আনন্দং প্রত্যভিসংবিশন্তি চ"। জগৎ আনন্দ হইতে আসিয়াছে, আনন্দেই বর্ত্তমান এবং অবশেষে আনন্দে প্রবেশ করিবে। মানবের মূল সত্তা আনন্দ, তজ্জন্যই সে আনন্দের প্রেরণায় আনন্দ অনুসন্ধানে এত তৎপর। আনন্দের স্থূলমূর্ত্তি সুখ দ্বিবিধ; নিম্নমুখী ও ঊর্দ্ধমুখী। জড়ত্ব-উৎপাদী নিম্নমুখী সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং প্রতিক্রিয়ারূপে দুঃখ আনয়ন করে। যে সুখ সংকীর্ণতা-প্রসূত তাহার ফল দুঃখ। যে সুখের উৎস বিস্তৃতির ক্ষেত্র তাহা দীর্ঘস্থায়ী ও মিলনমুখী। মনের ক্ষেত্র সাধারণতঃ তিনটী। জড়, বুদ্ধি, ও আধ্যাত্ম ক্ষেত্র। জড়ক্ষেত্র, বুদ্ধির ক্ষেত্র ও আধ্যাত্ম ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে স্থূল, বিস্তৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী। যাহা যত বিস্তৃত তাহার সুখও তত গভীর ও স্থায়ী। স্থূলের মিলন প্রকৃত

মিলন নহে, যাহা যত সূক্ষ্ম তাহার মিলনও তত গভীর। যে মিলন সংকীর্ণতা-প্রসূত ও যাঁহার ফলে ক্ষুদ্রতা উৎপাদিত হয় তাহাকে মিলন বলা যায় না। ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতিষ্ঠান পশ্বত্বে। সংকীর্ণতা-প্রাপ্ত না হইলে মন ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগেচ্ছু হয় না। এরূপ ভোগান্তে মন যে সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাহা তাহার অতৃপ্তি ও উত্তেজনা হইতে সহজবোধ্য। যে মিলন অধিকতর মিলনের সহায়ক তাহাই মঙ্গলপ্রসূ। কাম ক্রোধ কলহ হিংসায় যে এত জ্বালা তাহার কারণ এ সমস্ত মানুষে মানুষে পার্থক্য আনাইয়া দেয় পরস্পরকে দূর করে। পুত্র কন্যা প্রভৃতি প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমরা এত কাতর হই কেন? যাহাদের মধ্যে আমাদের আমিত্ব আরোপ দ্বারা যাহাদিগকে আপন ভাবিয়াছিলাম তাহাদের বিচ্ছেদ কষ্টদায়ক। তাহাদের মিলনে সুখ, যেহেতু তাহাদের মধ্যে আমাদের আমিত্ব আরোপ করিয়াছি। পক্ষান্তরে অপ্রিয়ের দর্শনে দুঃখ, কারণ অপ্রিয় হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। তাহার উপস্থিতিতে আমাদের সংকীর্ণ বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট ভাসিয়া উঠে। বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ দ্বারা আমাদিগকে বড় আমির দিকে লইয়া যায়, তাই তাহা আমাদিগকে সমুন্নত করে। উহাদের ক্ষেত্র বিস্তৃততর, তদ্ধেতু এরূপ সুখ বাঞ্ছনীয়, বিস্তৃতিই প্রকৃত সুখ। যাহাতে প্রকৃত সুখ আসে, তাহা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পুত্রাদিতে আমিত্ব আরোপিত হইয়াছে বলিয়াই সুখ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আমিত্বের প্রসারই সুখ। কিন্তু এদিকে দেখা যায় পুত্রাদির মৃত্যু প্রভৃতি বিচ্ছেদ ভীষণ দুঃখজনক। অন্য পক্ষে মানুষ সুখের কাঙ্গাল। তখন উপায় কি? যদি জগতের প্রত্যেকের মধ্যে আমিত্ব আরোপ করা যায় তাহা হইলে প্রকৃত আনন্দ পাই। সে আনন্দের পরিমাণ তার বিস্তৃতি অনুযায়ী, অথচ জগৎ মোটের উপর ধ্বংস পাইতেছে না, তজ্জন্য বিচ্ছেদ-জাত দুঃখের আগমনের সম্ভাবনাও হয় না।

সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞানাদি মনকে বিস্তৃতি দান করে। দর্শন বিজ্ঞানাদি Generalisation of truth, উহাদের অন্তর্নিহিত সত্য-সমূহ অদ্বৈত সত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খণ্ড বিকাশ মাত্র। সেই জন্য উহদের সেবা ও সাধনা। বিজ্ঞানাদির আবিষ্কৃত সত্য মানবের অনিষ্ট-সাধনে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে সত্যের অপব্যবহার বলা যাইতে পারে। তাহার জন্য প্রযোক্তা দোষী। অশেষ-উপকার-সাধনকারী অগ্নির দ্বারা গৃহ-দাহ কার্য্য সাধিত হইলে, অগ্নির দোষ নাই, দাহকারীই দোষী।

যে কোন উপায় মানুষের মনকে প্রসারিত করে তাহাই অবশ্য-অবলম্বনীয়।

যাহার ভূমি খণ্ডিতা, তাহা মানবকে বিচ্ছেদের দিকে লইয়া যায়; তাই তাহা আনে দুঃখ ও মৃত্যু। আত্মার সুখ তাহার মিলন ক্ষেত্র পরমাত্মায়। আত্মার সুখ সূক্ষ্ম ও মিলন-প্রসূ, তাই গঠনকারী ও অদ্বৈতাভিমুখী। ফল জ্ঞান, কর্ম্মপ্রেরণা ও প্রেম। যাহা বিস্তৃততম তাহাই অদ্বৈত ও ভূমা। পরার্থ-সেবায় মানুষের ক্ষুদ্রতা ডুবিয়া যায়, তাহাতে সে প্রকৃত স্বার্থের দর্শন পায় এবং তাহাই তাহার মঙ্গল। তাই পরার্থই স্বার্থ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জগৎ আনন্দ হইতে জাত, তাহাতে আনন্দের ছায়া বর্ত্তমান। মানুষও জগতের মাঝে আনন্দের আস্বাদ পায়, সেই জন্য সে জাগতিক পদার্থ-সমূহে এত আকৃষ্ট। কিন্তু জাগতিক পদার্থের অস্তিত্ব খণ্ডতায়। অল্প যাহা, খণ্ড যাহা, মন তাহার আপন শক্তির গুণে সহজেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। সেই জন্য তাহাতে তাহার তৃপ্তি নাই, শুধু লাভ করে বিক্ষিপ্ততা। যাহাতে সকলের মিলন, যাহা অনন্ত এবং তদ্ধেতু সকল দ্বিধা-বর্জ্জিত, কেবল মাত্র তাহাতেই আনন্দ—আনন্দই জীবনের মূল সূত্র। মিলন-প্রয়াসী মানবাত্মা পথে পথে আনন্দের অনুসন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কাম ক্রোধাদিতে সে আনন্দ পায় না, কারণ উহারা অল্পসেবী। সে অল্পকে ত্যাগ করিতে চাহে। সকল ভাবের মূলে তাহার যে অহঙ্কার, তাহাও অল্পকে ত্যাগ করিবার প্রয়াস মাত্র। যে দিন মানব অল্পকে ত্যাগ করিবার শ্রেষ্ঠ পন্থা পাইবে, সে দিন তাহার সকল দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যাইবে। ভূমাতেই সকল অল্পের অবসান, অতএব ভূমাই আনন্দ। এস সবে ভূমাকে লাভ করিবার পন্থা খুঁজি। ভূমাকে লাভ করিতে হইলে বহুত্ব-ভাবরূপী সয়তান, যাহার সেবায় এতকাল কাটিল—যে এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, যাহাতে এতদিন আমিত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছিলাম—সে বড় বাধা দেয়। ক্ষুদ্রত্ব ছাড়িয়া বহুত্বে আসিতে হইলে মনের যে Straining (আয়াস) তাহা প্রথমতঃ বড় কষ্টপ্রদ। এইরূপ নিরবলম্ব উদারভাবের উপাসনা আয়াস-সাধ্য। ভূমাকে লাভ করিবার সহজতম উপায় সত্যদ্রষ্টা বিশ্বপ্রেমিকের শরণ গ্রহণ। সত্যদ্রষ্টার আশ্রয়ে মন সহজভাবে স্বাভাবিক উপায়ে লক্ষ্যলাভে সমর্থ হয়। শুধু চাই মনকে সে আদর্শের নিকট সমর্পণ। এই উপায়ে আদান প্রদানে গন্তব্য পথ সহজ হইয়া পড়ে। জীবন্ত আদর্শলাভ করিয়া ও ভালবাসা পাইয়া মন তাহার অজ্ঞাতসারে ভূমার দিকে অগ্রসর হয়। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই আদর্শের শরণ-গ্রহণই সহজতম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহা-প্রেমিক মানবহিতার্থে বলিয়াছিলেন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং

ব্রজ"। ভালবাসাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়ার সহজ উপায়। ভালবাসার প্রয়াসের ব্যথা নাই, আছে ত্যাগের মহত্ব। যাহাকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসা যায়, মন অজ্ঞাতসারে তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অতএব ভূমার সেবক আনন্দের প্রয়াসী সত্যদ্রষ্টার শরণ লও।

সর্ব্বশেষে এই প্রার্থনা আমরা যেন কায়, মন ও বাক্যে সত্যদ্রষ্টার শরণ গ্রহণ করিয়া ভূমাকে লাভ করিতে পারি। মঙ্গলময় পরম পিতা আমাদের শান্তির পথে সহায় হউন।

রামায়ণের ঐতিহাসিকতা

লেখক—সম্পাদক

অধুনা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা রামায়ণ ও মহাভারত যে কেবল কাব্য নহে পরন্তু উহার ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কোনও এক সময় মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও রামায়ণের শ্রীরামকে আকাশের সূর্য্যের সহিত অভিন্ন মনে করা হইত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম নামক কোনও কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের প্রচলিত উপাসনাই বৈদিক সূর্য্যোপাসনার পৌরাণিক বিবৃতি মাত্র মনে করা হইত। হিন্দুপত্রিকার সুপরিচিত লেখক এবং আমাদের প্রিয়বন্ধু স্বর্গীয় কালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্, মহাশয় বহু যুক্তি ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে হিন্দু-দিগের দেবদেবী প্রায় সমস্তই গ্রহনক্ষত্রাদির পৌরাণিক আকার মাত্র। বৈদিক সোম বা চন্দ্র আমাদের আকাশে নিত্যদৃষ্ট চন্দ্র হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহেন, এবং তাঁহার অশ্বিনী-ভরণী-কৃত্তিকা-রোহিণী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি গৃহিণী আমাদের নিত্যদৃষ্ট অন্তরীক্ষ-মণ্ডলের সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৌরাণিক রাম বা কৃষ্ণ ঐরূপ বৈদিক বিষ্ণুর রূপান্তর এবং বৈদিক বিষ্ণুও আকাশের নিত্যদৃষ্ট সবিতৃদেব ভিন্ন অন্য কেহই নহেন। গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারাও উহাই সমর্থিত হয়। ঐরূপ ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি আকাশের সপ্তর্ষি-মণ্ডলস্থ নক্ষত্রসপ্তক ভিন্ন আর কিছুই নয়। শ্রীরাম-পত্নী হিন্দুর আদর্শ-রমণী সীতা বৈদিক সীতা অর্থাৎ লাঙ্গলের ফালের চিহ্ন ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে।

রামপত্নী সীতা আর রমণী-মস্তকের সীতা বা সীঁথি (সীমন্তরেখা) এবং লাঙ্গলের ফালের চিহ্ন সবই মূলে এক। এই শ্রেণীর মতবাদ ভিন্ন অন্য এক শ্রেণীর মতবাদ আছে; তাহা এই যে—এই সমস্তই আধ্যাত্মিক কল্পনা—অর্থাৎ আমাদিগের উপাস্য বা স্পৃহণীয় বা চিদ্‌রাজের বস্তু সমূহ (সাধারণের বোধ-গম্য করিবার জন্য) পুরাণ রামায়ণ মহাভারতাদিতে কবিদিগের হস্তে নানা-বিধ আকার ধারণ করিয়াছে। আর এক শ্রেণীর মতবাদ এই যে, পৌরাণিক বা রামায়ণ মহাভারতের বর্ণিত বৃত্তান্ত-সমূহ কল্পনা বা অতিরঞ্জন হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত সত্য ঘটনা। ঐ সকল গ্রন্থে বর্ণিত অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ঘটনা সমূহও তাঁহাদের মতে সম্পূর্ণ সত্য। উহার মূলে তাঁহারা ঐশ্বরিক বিভূতি বা অলৌকিক শক্তির খেলা দর্শন করেন, কিন্তু নিরপেক্ষ-ভাবে চিন্তা করিলে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারেন যে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে অর্থাৎ বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থেই বহুপ্রকার সামগ্রী বর্ত্তমান আছে। উহাতে কবির কল্পনা আছে, মুক্ত-পুরুষের অপরোক্ষ অনুভূতি আছে, সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তরীক্ষের গ্রহনক্ষত্রাদির বর্ণনা এবং বহুবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, মনোবিজ্ঞান, রূপক এবং প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা সমস্তই এরূপ বিজড়িতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণা করা সময় সময় সুসাধ্য হইলেও অনেক সময়ে দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে।

চন্দ্র ও ২৭ নক্ষত্রের সম্বন্ধে পুরাণ-বর্ণিত রূপক অতি স্থূলবুদ্ধি লোকেরও বুদ্ধিগম্য। চন্দ্র প্রতিতিথিতে অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি এক এক নক্ষত্রে অবস্থিত থাকিয়া পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করেন। এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। এখন যদি চন্দ্রকে দেবতারূপে বর্ণনা করিয়া এবং যে সমস্ত নক্ষত্রে তাঁহার অবস্থিতি হয় তাহাদিগকে তাঁহার গৃহ বা গৃহিণীরূপে বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে এ কল্পনা দ্বারা কোনও বুদ্ধিমান্ লোকেরই ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অনেক সময় কল্পনা এতই জটিল আকার ধারণ করে যে তাহা হইতে প্রকৃত ব্যাপার নিষ্কাসন করা তত সহজ-সাধ্য হয় না।

এক্ষণে রামায়ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য নিম্নে বিবৃত করিব। রামায়ণে অনেক অতিপ্রাকৃত ঘটনা বর্ণিত আছে, কোনও সম্প্রদায় রামায়ণকে একেবারে ইতিহাসের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া দিয়া উহাতে কোনও

স্থানে সুসংলগ্ন কোনও স্থানে অসংলগ্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা প্রথমে তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইব যে রামায়ণ সত্যসত্যই রাম নামক অযোধ্যার কোনও রাজার কীর্ত্তিকাহিনী। ঐ কীর্ত্তিকাহিনী নানাবিধ কল্পনা ও অতিপ্রাকৃত বর্ণনা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, অলঙ্কৃত ও অতিরঞ্জিত হইয়াছে। আমরা প্রথমে কেবলমাত্র আমাদের প্রতিজ্ঞা বা প্রমাণের বিষয়টী সকলকে স্বীকার করিয়া লইতে বলিতেছি। তাহার পর আমরা রামায়ণ হইতেই উহার পোষক প্রমাণ উপস্থিত করিব। অতএব সর্ব্বপ্রথমে মানিয়া লউন যে সূর্য্যবংশে দশরথ নামক কোনও পরাক্রান্ত ও ধার্ম্মিক চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন।

এই সূর্য্যবংশ কথা বলিতেই কাহারও কাহারও মনে উদয় হইতে পারে যে অতিপ্রাকৃত বংশাবলীর সহিত ঐতিহাসিক সম্বন্ধ কিরূপে সমঞ্জস হইবে! এ সম্বন্ধে সকল বুদ্ধিমান্ এবং প্রাচীন ইতিহাসতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির জানা আছে যে প্রাচীন কালে সর্ব্বদেশেই মনুষ্যের উৎপত্তিস্থানরূপে আমাদের সুপরিচিত এবং নিত্যপদতলস্থিত ভূমি কল্পিত হয় নাই। বিশেষতঃ মানবের মধ্যে যাহারা বলে, বুদ্ধিতে বা ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাদের উৎপত্তি অতি-প্রাকৃত-ভাবেই বর্ণিত ও গৃহীত হইয়া আসিতেছে। যীশুখৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন। জাপানের মিকাডোরাজবংশ সূর্য্য বা স্ত্রীরূপী সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরাদি দেবতার ঔরসে উৎপন্ন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অলৌকিক। বুদ্ধের জন্মও তদ্রূপ। ইক্ষ্বাকুবংশও ঐরূপ সবিতৃদেবের বংশ বলিয়া পরিচিত। কাহারও কাহারও মতে যাঁহারা সূর্য্যকেই দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন তাঁহারা সূর্য্যবংশোদ্ভূত বলিয়া কথিত হন এবং যাঁহারা চন্দ্রকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশধরেরাই চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। অতি প্রাচীনকালে সূর্য্যকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না, এখনও হিন্দুরা ত্রিসন্ধ্যা সবিতৃদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন। ঐ সঙ্গে ক্রমে সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পরব্রহ্মের চিন্তাও আরব্ধ হইয়াছে। গ্রহ নক্ষত্র যিনি যতই বৃহৎ বা মহৎ হউন্ না কেন, পৃথিবীস্থ জীবের সঙ্গে সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অপর কাহারও সহিত সেরূপ নহে। চন্দ্র-সূর্য্য অপেক্ষা বহুলক্ষ গুণ বৃহৎ বৃহৎ জ্যোতিষ্ক থাকা সত্ত্বেও আমরা অনন্তমহিম ভগবানকেও "শশিসূর্য্যনেত্র" বলিয়া বর্ণনা করি। সুতরাং এই শশী ও সূর্য্য আদিম মানবের নিকট সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত

হইবার সম্ভাবনা। পৃথিবীর জীবনের সঙ্গে সূর্য্য ও চন্দ্রের সম্বন্ধ যে অত্যধিক তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ বিষয়টীর আরও অধিক বিবৃতি অনাবশ্যক।

কেহ কেহ বলেন যে যাহারা সৌর মাস এবং সৌর বৎসর গণনার পক্ষপাতী তাহারাই সূর্য্যবংশ এবং যাহারা চান্দ্রমাস এবং চান্দ্রবৎসর গণনার পক্ষপাতী তাহারাই চন্দ্রবংশীয়। যাহারা নিজেদের চন্দ্রবংশ-সম্ভূত বলিয়া মনে করেন তাহাদের চান্দ্রমাস-ব্যবহার স্বাভাবিক, আর যাহারা নিজেদের সূর্য্যবংশ-সম্ভূত মনে করিতেন তাহাদের সৌরমাস-ব্যবহার স্বাভাবিক, সুতরাং এই দুইটী ব্যাপার এক সঙ্গে আলোচনা করিলে সামঞ্জস্যের বাধা হয় না। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজন্যবর্গ—আধুনিক এবং প্রাচীন—সকলেই হয় চন্দ্রবংশ, নয় সূর্য্যবংশ হইতে উদ্ভূত। শুধু ইহাই নহে, শাস্ত্রের প্রমাণে মানব মাত্রেই সূর্য্যবংশ-সম্ভূত বলা যাইতে পারে। তবে রাজন্যবর্গের সূর্য্যবংশোদ্ভূততা যেমন পরিস্ফুট, তেমন সকলের নহে।

মহারাজ দশরথ রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন, অর্থাৎ তদানীন্তন ভারতবর্ষের সমস্ত রাজারাই তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। প্রাধান্য স্বীকার করিতেন বলিয়া সকলেই যে তাঁহাকে কর-দান করিতেন এ কথা বলা যায় না। কেহ বা কর দিতেন; কেহ বা কেবল অধীনতা স্বীকার করিয়া উৎসবাদির সময় উপঢৌকনাদি প্রদান ও প্রতিগ্রহণ করিতেন। দশরথের নিজস্ব রাজ্য ছিল কোশল। কোশল রাজ্যের আয় হইতেই প্রধানতঃ রাজ্যের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইত। প্রাচীনকালে যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করা রাজাদের একটী নিয়মিত কার্য্য ছিল, এবং তাহার জন্য বর্ষাতেই সাজসজ্জা করা হইত। যদি কোনও সময় কোনও প্রাদেশিক রাজা অধীনতা-স্বীকারে অসম্মত হইতেন, তবে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা হইত এবং সেই রাজ্য জয় করিয়া করদরাজ্যে পরিণত করা হইত। দশরথের অধীনে এইরূপ মিত্র অকরদ এবং করদ বহু রাজা ছিলেন। মহোৎসবাদিতে ইঁহারা সকলেই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিত হইতেন।

প্রাচীন রীত্যনুসারে রাজাদিগের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রী থাকিতেনই থাকিতেন যথা—মহিষী, বাবাতা ও পরিবৃক্তি। দশরথেরও এই ত্রিবিধ স্ত্রী ছিল। এবং এতদ্ভিন্ন অন্য অনেক স্ত্রী ছিল। তিন স্ত্রী থাকার কারণ এই ছিল যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের সহিতই রাজার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সং... হইত। রাজাদিগের ব্রাহ্মণী স্ত্রী থাকা তৎকালীন সমাজের চক্ষে প্রশস্ত

বিবেচিত না হইলেও উহা একেবারে বিরল ছিল না। যাহা হউক, দশরথের কোনও পত্নী ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সরযূনদীর উত্তর তীরে অবস্থিত অযোধ্যানগরে দশরথের রাজধানী ছিল। ঐ নগর অতি প্রাচীন, এবং ইক্ষ্বাকুবংশের আদিপুরুষ মনু দ্বারা স্থাপিত বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধি। যিনিই অযোধ্যাপুরীর স্থাপয়িতা হউন্ না কেন, ইক্ষ্বাকুবংশের কোনও প্রাচীন রাজা যে উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নগরে সর্ববর্ণ ও সর্ব্ব-ব্যবসায়ী লোক বাস করিতেন, এবং তাঁহারা সকলেই সুসমৃদ্ধ ছিলেন। নগরে অনেক বিমান অর্থাৎ ইষ্টক এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ ছিল। অতি সাধারণ লোকদিগেরও কিছু না কিছু স্বর্ণালঙ্কার ছিল। নগর পরিখা, দুর্গ এবং শালবন দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। দুর্গের উপর শতঘ্নী প্রভৃতি অস্ত্র-সমূহ সুসজ্জিত থাকিত। অযোধ্যা সার্থকনাম্নী ছিল। অন্য রাজন্যবর্গ অযোধ্যাধিপতির সহিত সমরে প্রতিযোগিতা করিতে সাহসী হইতেন না। দশ যোজন দীর্ঘ ও দুই যোজন বিস্তৃত নগরটী সুপরিষ্কৃত ও সুপরিচ্ছন্ন থাকিত। নগরটীর আকার দ্যূতফলকের ন্যায় ছিল। উহা সমভাবে এবং সরলভাবে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের বাসস্থানরূপে বিভক্ত ছিল। নিত্যজলসিক্ত সুসজ্জিত রাজপথগুলি প্রশস্ত ও নানাবিধ পুষ্প ও ফল বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত ছিল। নগরের কেন্দ্র স্থানে রাজপুরী অবস্থিত ছিল এবং রাজপুরীর চতুঃপার্শ্বে বৃত্তাকারে রাজধানী-রক্ষার্থ চতুরঙ্গ সেনা এবং তাহাদের নিবাসস্থান ছিল। এতদ্ব্যতীত দাস দাসী এবং বহুবিধ পণ্য-ব্যবসায়ী পুরীর মধ্যে চতুর্দ্দিকে স্থান পাইত। বহু উদ্যান সরোবর প্রভৃতি এই পুরীর মধ্যে ছিল। প্রত্যেক রাজ্ঞী, রাজপুত্র, ও রাজবংশীয়গণের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাসগৃহ সকল থাকিত। ফলকথা, দশরথের সময় ভারতবর্ষের সর্ববিষয়ে যেরূপ উন্নতি দেখা যায় তাহা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের এবং অশোকের সময় পর্য্যন্ত যে বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়াও অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইতেছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তৎকালে রাজ্য-শাসনের সুবন্দোবস্ত ছিল। সমর, রাজস্ব প্রভৃতি বিভাগ উপযুক্ত সচিবের হস্তে ন্যস্ত ছিল, এবং তাঁহারা সকলেই সমবেত হইয়া রাজা বা প্রধান রাজমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রণা করিতেন। কোনও গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে প্রজাগণের সভা আহূত হইত; এবং প্রয়োজন বোধ হইলে করদ ও অকরদ মিত্র রাজগণকেও আহ্বান করা হইত।

দশরথ বহু পত্নী লইয়াও প্রৌঢ়কাল পর্য্যন্ত অপুত্রক ছিলেন। কৈকেয়ীই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠা পত্নী ছিলেন। কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণের সময় দশরথ

কৈকেয়ীর পিতা কেকয়রাজের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে কৈকেয়ী কনিষ্ঠা রাণী হইলেও তাঁহার গর্ভে পুত্র জন্মিলে সেই পুত্রই রাজা হইবেন।

মানুষ বহু অভিলাষ করে। কিন্তু ভগবান্ তাহার সকলগুলি পূর্ণ করেন না। দশরথ বহুকাল পুত্রলাভে বঞ্চিত রহিলেন। দৈবে বিশ্বাস হিন্দুর অস্থি-মজ্জাগত। পুত্রলাভার্থ দৈবক্রিয়ার জন্য বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনা হইল।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথ-কন্যা শান্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপুত্রক অঙ্গরাজ লোমপাদ দশরথ কোশলাধিপতি দশরথের মিত্র ছিলেন। তিনি অপুত্রক বিধায় দশরথের নিকট শান্তাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করায় দশরথ তাঁহাকে শান্তা কন্যা প্রদান করেন। উভয়ের সমান নাম হইলে মিত্রতা থাকিবার প্রথা এ দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে।

অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। যজ্ঞে বহু রাজন্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন, মুনি ঋষি—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগ-দান করিয়াছিলেন, এবং সকলেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উপযুক্ত সময়ে দশরথের স্বনাম-প্রসিদ্ধ চারি পুত্র জন্মিলেন। কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করিলেন। দশরথের পুত্রগণ উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত গুরুর নিকট অস্ত্র ও রাজ-পুত্রোচিত শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিলেন। রাণীদিগের মধ্যে সপত্নীসুলভ ঈর্ষ্যাদ্বেষের একেবারে অভাব না থাকিলেও বিশেষ কোনও বিবাদ ছিল না। বহু পত্নী থাকায় যে অশান্তি তাহা দশরথকে বিশেষ ভোগ করিতে হইত না। সুমিত্রা কৌশল্যার অনুগতা ছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত যুবতী এবং ভবিষ্য রাজার মাতা ও দশরথের প্রেয়সী এই জ্ঞান কৈকেয়ীর মস্তিষ্ক যে একেবারে বিলোড়িত করিয়াছিল না, তাহা নয়। রামচন্দ্রের জন্মের পরে তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র ও মাতৃগণের প্রতি একান্ত ভক্তি দ্বারা কৈকেয়ীর উদ্বাহকালে দশরথের প্রতিজ্ঞা-বিষয়ক পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল।

ইক্ষ্বাকু-কুলের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হন; এবং যিনি রাজা হইবেন তাঁহাকে রাজা হইবার পূর্ব্বেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে হয়। রাজার জীবদ্দশায় যুবরাজ সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যোগ্যতা লাভ করেন এবং রাজার মৃত্যুর পরে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এইরূপ নিয়ম ইক্ষ্বাকুবংশের চিরাগত।

সীরধ্বজ জনক এবং তাঁহার ভ্রাতা কুশধ্বজের চারি কন্যার সহিত দশরথের

চারি পুত্রের বিবাহ হয়। রামের সহিত সীতার, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর, লক্ষ্মণের ...ত ঊর্ম্মিলার এবং শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হয়।

জনক বৃহদারণ্যক উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞ রাজা ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বন্ধু ও প্রতিপালক ছিলেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধে মিথিলা ও অযোধ্যা উভয় রাজ-কুলই পরস্পর গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

শত্রুঘ্ন ভরতের ও লক্ষ্মণ রামের অনুগত ছিলেন। বস্তুতঃ চারি ভ্রাতার মধ্যেই সৌহার্দ্দ ছিল, সাধারণ বৈমাত্র ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার ছিল না। রামচন্দ্র কৈকেয়ীকে কৌশল্যার মতই ভক্তি করিতেন, সাধারণ বিমাতা মনে করিতেন না। কৈকেয়ীও রামকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

চারি ভ্রাতার বিবাহ সম্পন্ন হইবার পরে ভরতের মাতুল যুধাজিৎ ভরত ও শত্রুঘ্নকে কেকয় রাজ্যে লইয়া যান। ভরত ও শত্রুঘ্নের কেকয় রাজ্যে গমনের পর দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গের সহিত তাঁহার এ বিষয় পরামর্শ হয়। প্রজাবর্গের সভাও আহূত হয়, এবং রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাই স্থিরীকৃত হয়।

কৈকেয়ী দশরথের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইলেও দশরথের মন হইতে উহা অপগত হয় নাই, তাঁহার চিত্তের উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ছিলেন—কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রকেই রাজা করিবেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইতে চলিল। রাজা সত্যবাদী ছিলেন, সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হওয়াতে তাঁহার চিত্ত বিচলিত না হইয়া পারে না। অথচ রাম সর্ব্ব-গুণাক্রান্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইক্ষ্বাকুকুলের চিরন্তন প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনের অধিকারী। রামচন্দ্র প্রজাদিগেরও প্রিয়তম ছিলেন। এ বিষয়ে কৈকেয়ী এবং ভরতের পক্ষ হইতেও প্রতিবন্ধক হইবার সম্ভাবনা নাই এবং যদিও কেকয় রাজার পক্ষ হইতে কোনও আপত্তি হইতে পারে তাহাতে ভরত বিচলিত হইবেন না এরূপ বিশ্বাসও তাঁহার ছিল না তাহা নয়। তবে প্রত্যেক পরিবারে বিশেষতঃ রাজপরিবারে কুপরামর্শদাতা পরিচারক পরিচারিকা কিংবা দূরসম্পর্কিত ব্যক্তির অভাব নাই। এ আশঙ্কাও তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। এই আশঙ্কা-হেতুই ভরতের অনুপস্থিতি-কালে তাঁহার অনুপস্থিতি বিজ্ঞাপন করিয়া রামচন্দ্রের নিকট যৌবরাজ্যের অভিষিকের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার বিষয় রামচন্দ্রও অবিদিত ছিলেন না, কিন্তু তিনি পিতৃ-ব্যবস্থায় প্রতিবাদ ক..ন নাই।

কৈকেয়ী জানিতেন যে সিংহাসনে তাঁহার পুত্রের অধিকার। কিন্তু রামচন্দ্রের প্রতি অনুরক্তি হেতু সে অধিকারের দাবি করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল যে যখন ভরতই রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ তখন রামচন্দ্রের পরে ভরতই রাজা হইবেন। অন্তঃপুরে এ বিষয়ে রাণীদিগের মধ্যে আলোচনার অভাব হয় নাই। মন্থরা বুদ্ধিমতী এবং কৌশল্যার প্রতি বিদ্বেষবতী। মন্থরা বয়োজ্যেষ্ঠা এবং পিতৃকুলের দাসী, বিবাহের সময় কৈকেয়ীর সহিতই আসে। মন্থরা রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের কথা কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত করিলে এবং রাজার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলে কৈকেয়ী তাহাকে এই বলিয়া বুঝান যে ভরত যখন রামচন্দ্রের ছোট, তখন রামচন্দ্রের পরেই ভরত রাজা হইবেন, এবং রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় ভরতই যুবরাজ হইবেন, সুতরাং ভরতের সিংহাসন-প্রাপ্তির বাধা নাই, কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে মাত্র। কিন্তু মন্থরা বুঝাইয়া দিল যে রঘুকুলের প্রথাই এই যে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হয়, সুতরাং রামচন্দ্র একবার রাজা হইলে তাঁহার বংশধরগণই রাজা হইবে, সে বংশ বিলুপ্ত না হইলে ভরতের বা তাহার বংশীয়গণের রাজা হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। রামচন্দ্র এখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে দশরথের দেহাবসানে রামচন্দ্রই রাজা হইবেন। ভরতের রাজ্য-লাভের কোনও সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং ভরতের ন্যায্য দাবী এই সময়েই রাজার সমক্ষে উপস্থিত করা আবশ্যক। মন্থরার কথাটা ঠিক, এবং তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই ছিল না। কৈকেয়ী কতকটা উদারতা দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ভরতের ন্যায় তাঁহার হৃদয় এত প্রশস্ত ছিল না যে তিনি পুত্রের ভবিষ্যৎ রাজ্যলাভের দাবী একেবারে পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার অন্তঃকরণ টলিল। পুত্রস্নেহ বলবান্ হইল। কিন্তু স্বামীর নিকট সহসা একথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। ক্রোধাগারে গেলেন।

রাণীদিগের সেকালে এক একটী ক্রোধ-প্রকোষ্ঠ ছিল। তাহার নাম ছিল ক্রোধাগার। ক্রোধাগারে থাকিলেই রাজারা বুঝিতেন কোনও বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। দশরথ কৈকেয়ীকে ক্রোধাগারে দেখিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইলেন। কিন্তু কৈকেয়ী যে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন এরূপ আশঙ্কা তাঁহার মনে হয় নাই। কৈকেয়ীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দশরথ বহু চেষ্টা করিলেন, কৈকেয়ীকে অদেয় কিছুই থাকিল না। বিশাল রাজ্যের সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তু তাঁহার অনায়াসপ্রাপ্য—ইত্যাদি বুঝাইতে থাকিলেন। ক্রোধের

কারণ জানিতে চাহিলেন। সময় বুঝিয়া কৈকেয়ী পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাহার বিরুদ্ধে দশরথের বলিবার কিছুই থাকিল না। বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র প্রভৃতিকে সকল জানাইলেন, তাঁহারা কোনও প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের পূর্ব্বসম্মতি যে যে অবস্থায় হইয়াছিল, সেই সেই অবস্থার ব্যতিক্রম হইয়াছিল। কৈকেয়ীর প্রতিবন্ধকতা একটী নূতন অবস্থা আনিয়া ফেলিয়াছিল। রঘুকুলের রীত্যনুসারে দশরথের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারিতেন এবং প্রজাবর্গও তাহাতে একমত হইত এবং কৈকেয়ীর বাধাও অভিষেকের কোনও বাধা জন্মাইতে পারিত না, এ সমস্ত জানিয়াও তাঁহারা রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকে অনুমোদন করিতে পারিলেন না। কেননা, উহা করিলে মহারাজ দশরথকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করিতে হয়। সত্য তৎকালীয় লোকের মনের উপর এতই আধিপত্য বিস্তার করিত যে অন্য কোনও কারণই তাহার প্রতিযোগিতা করিতে পারিত না। সমস্ত বিশ্ব এক দিকে, আর সত্য আর একদিকে। রামচন্দ্র সত্যসন্ধ, তিনিও পিতাকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া নিরয়গামী করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং রামের রাজ্যাভিষেক স্থগিত হইল। দশরথ উপায়ান্তর না দেখিয়া কৈকেয়ীকে নিরস্ত থাকিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও, এমন কি চরণ-ধারণ পর্য্যন্ত করিয়াও, কিছুই করিতে পারিলেন না। কৈকেয়ীর মনে নূতন আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি রামের চরিত্র জানিতেন, কিন্তু তথাপি আশঙ্কা করিলেন যে যদি ভরতের অভিষেকের সময় অনুরক্ত প্রজারা বাধা দেয়, তাহা হইলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। কিন্তু রাম-চন্দ্র যদি অযোধ্যা হইতে কিছুদিন অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে এ কার্য্যে বিঘ্ন হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তিনি রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন রাজাজ্ঞা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাতে এক অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইল। প্রজাগণ বিরোধী হইল, লক্ষ্মণ বিরোধী হইলেন, কিন্তু রামচন্দ্র রাষ্ট্র-বিপ্লবের ভাবী সূচনা দেখিয়া নিজেই অযোধ্যা-পরিত্যাগের সংকল্প করিলেন, এবং প্রজাগণকে নানাবিধ উপদেশ দ্বারা শান্ত করিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিলেন। এইরূপ স্থলে ঋষি-গণের আশ্রমে বাসই যথেষ্ট নির্ব্বাসন বলিয়া বিবেচিত হইত।

এ দিকে শোকতপ্ত দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে কেকয়রাজ্য হইতে আনা হইল। তিনি অভিষিক্ত হইতে অস্বীকার করিয়া মাতা ও মাতৃদাসী মন্থরাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া মাতৃগণ, মন্ত্রিবর্গ ও সৈন্যসামন্ত সহিত রামচন্দ্রকে

পুনর্ব্বার অযোধ্যায় আনিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিবার জন্য মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। রামচন্দ্র তাঁহাকে ভরত-মাতামহ কেকয়-রাজের নিকট দশরথের বিবাহকালীন প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং ভরত রাজ্য-গ্রহণ না করিলে পিতা দশরথকে নিরয়গামী করা হইবে ইত্যাদি বলিয়া নিরস্ত করিলেন। ভরত অসাধারণ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রামকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার পাদুকা লইয়া অযোধ্যার উপকণ্ঠে রামের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। নিজে সিংহাসনে না বসিয়া রামের পাদুকা তাহাতে স্থাপন করিলেন।

দাক্ষিণাত্যে এই সময় অনার্য্যজাতির নিবাস ছিল। অগস্ত্য, সুতীক্ষ্ণ, অত্রি প্রভৃতি ঋষিদিগের নেতৃত্বে আর্য্যেরা দাক্ষিণাত্যে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনার্য্যভূমিপতিরা কেহ কেহ অযোধ্যার শাসন স্বীকার করিয়াছেন, কেহ বা করেন নাই। লঙ্কার প্রবল পরাক্রান্ত রাজা রাবণ অযোধ্যার অধীনতা স্বীকার করেন না। এবং দাক্ষিণাত্যে রাজ্য-সংস্থাপনের জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টাবান্ ছিলেন ও এই উদ্দেশ্যেই কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। খরদূষণের সেনাপতিত্বে চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্যের সাহায্যে তাঁহার বিধবা ভগিনীকে নাসিকের রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এ দিকে বালীর সহিত সন্ধি থাকাতে খরদূষণের অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে কেহ সমর্থ হইত না। যদিচ রামচন্দ্র অযোধ্যার বাহিরে বাস করিতেছেন তথাপি তাঁহার ক্ষত্রিয় কর্ত্তব্য এবং রাজোচিত ধর্ম্ম মন হইতে একেবারে চলিয়া যায় নাই। আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের প্রতি অত্যাচার তাঁহার কর্ণকুহরে নিত্য প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। নূতন কর্ত্তব্যবোধ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে ভরতকে অনার্য্য-উপদ্রবের প্রতিবিধান করিতে বলিতে পারিতেন, কিন্তু যে কারণেই হউক, আর্য্য-মর্য্যাদারক্ষার্থে হউক কিংবা নিজ বাহুবলে নবরাজ্য অধিকার করিয়া কৃতিত্ব-লাভ করিবার জন্যই হউক, তিনি দাক্ষিণাত্যের অনার্য্য রাজন্যবর্গের সাহায্যে রাবণের অত্যাচার বিদূরিত করিতে, এমন কি—লঙ্কা-বিজয় করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। সীতা তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন এবং এই অভিনব সাহসিককার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রাম ঋষিদিগের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, আর পশ্চাৎপদ হইতে পারেন না—ইহা বুঝাইয়া সীতাকে নিরস্ত করিলেন। যুদ্ধ বাধিল। খরদূষণ হত হইল। রাবণের ভগিনী সূর্পণখা অবমানিত্য

হইলেন—চাই যুদ্ধক্ষেত্রে হউন—চাই অন্য প্রকারেই হউন, অবমানিতা হউন বা না হউন—রাজ্যভ্রষ্টা হইলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজ্যভ্রষ্ট ও অবমানিত দুইই হইয়াছিলেন বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সূর্পণখা ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া স্বজনসহ লঙ্কায় গমন করিয়া ভ্রাতৃসন্নিধানে সমস্ত কথা জানাইলে রাবণের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। তিনি কৌশলে সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় বন্দী করিলেন। রামচন্দ্র অন্যান্য রাজন্যগণের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদের সাহায্যে লঙ্কা আক্রমণ করিলেন এবং রাবণ-ভ্রাতা বিভীষণের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া লঙ্কা জয় করিয়া তাঁহাকেই রাজা করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। লঙ্কা অবরুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষের বহু সেনা নষ্ট হইল। রাম লঙ্কা অধিকার করিলেন, সীতার উদ্ধার হইল। বিভীষণ রাজা হইলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণ, সীতা ও অনার্য্য রাজবর্গ এবং তাহাদের রাণী ও স্বজনসহ অযোধ্যায় আসিলেন। এদিকে ভরত যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দাক্ষিণাত্যাভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু লঙ্কা-জয় হইয়াছে শুনিয়া যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। রামচন্দ্র প্রত্যাবৃত্ত হইলে ভরত তাঁহাকে রাজা করিলেন। এবং রামচন্দ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র রাজা হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। রাজত্ব-কালেও কেকয় প্রভৃতি দেশ হইতে বিদেশীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া ভারতবর্ষের শান্তি স্থাপন করিয়া, আর্য্য অনার্য্য উভয় জাতির সম্মিলন সাধন করিয়া, এক অভিনব ভারতীয় নূতন জাতি গঠন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তৎপুত্রগণ ও তদ্‌ভ্রাতৃপুত্রগণ এবং তাঁহাদের বংশধরগণ বহুদিন ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া কালের অপ্রতিরোধী গতির অধীনতায় ক্রমে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া সুমিত্র রাজার সময়ে লোপপ্রাপ্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

দিব্য-দর্শন ও গোপী-প্রেম

লেখক—অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, পি এইচ, ডি।

কর্ম্ম-জীবনের অবসন্নতা দূর করিয়া কয়েক দিন শান্তি উপভোগ করিবার মানসে নীলাম্বু ও নীলব্যোমের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া যে স্থানে নিত্য মধুর মিলনের আনন্দ-বংশীধ্বনি নিত্য নিত্য অপুর্ব্ব ঝঙ্কার দেয়, যে স্থানে পাদহীন গতিহীন নীলাচলের নীল ঠাকুরের রথগতির পশ্চাতে পশ্চাতে সহস্র সহস্র নর-নারী আকুল প্রাণে ধাবিত হয়, যে স্থানে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া মানব-প্রাণ দেবতার পদ-চুম্বনের জন্য উন্মত্তপ্রায় হয়, প্রকৃতির ও পুরুষের নিত্য লীলার সেই মিলন স্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে সারদা-মঠাধিপতি সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীশ্রীশ্রীস্বামী ত্রিবিক্রম তীর্থ ও তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীশ্রীস্বামী বিষ্ণুতীর্থ।

দেবতার স্থানে গিয়াছি দেবতা দেখিতে। কিন্তু চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা ত দেবতা দেখা যায় না। দেবতা দেখা যে কত কঠিন, তাহা যাহারা দেবতা দেখিবার অভিলাষ মনে রাখেন, তাহারাই কেবল তাহা বুঝিতে পারেন, অন্যে নহে। আমার মত সাধারণ মানুষের কথা কি, যে ভক্ত ও বীর অর্জ্জুন কর্ম্মজ্ঞান, যোগ ও ভক্তির উপদেশ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনিও চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দিব্যরূপের দর্শন পান নাই। উহা প্রাপ্ত হইবার জন্য তাহার পক্ষেও কৃপাকটাক্ষ ও দিব্যস্পর্শ প্রয়োজন হইয়াছিল।

সকলে অর্জ্জুনের ন্যায় ভাগ্যবান নহে, তবে ভগবৎ-কৃপা সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র মানবকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু বহু মানবের কর্ম্ম এমনি যে কৃপার ধারা বহিতে বহিতে হঠাৎ থামিয়া যায়। কেবল মাত্র যাহারা তাঁহাকে অনন্যমনে বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের উপরে তাঁহার কৃপা শতধারায়

* হিন্দু-পত্রিকার পুজনীয় সম্পাদক মহাশয় খুলনা জেলার মানসা গ্রামে ভগবদ্ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু ভগীরথ সেন মহাশয়ের বাটীতে স্থানীয় সর্ব্ববর্ণের হিন্দু-সমাজের আহূত সভায় নানাবিধ ধর্ম্মালোচনার ভিতর পুরীধামে তাঁহার নিজের দৃষ্ট ভক্ত ব্রাহ্মণ মহিলার গোপী-প্রেমের যে বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাঁহারই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। লেথক।

বঞ্চিত হয়। যাহারা তাঁহাকে বরণ করিতে সমর্থ হন নাই, তাহারা তাঁহার কৃপাপাত্র হইতে পারেন না।

ভক্ত যেমন ভগবানকে চান, ভগবানও তদ্রূপ তাঁহার প্রিয় জনের মধ্যে বিশিষ্টভাবে থাকিতে চান। জ্ঞানীর ব্রহ্মে সমস্ত বিশ্ব বিধৃত, ভক্তের ভগবানেও সমস্ত বিশ্ব বিধৃত, কিন্তু ভক্তের ভগবানে আর একটু বিশেষত্ব আছে। ভক্তের ভগবান নিজ জন নিজেই খুঁজিয়া লয়েন। ভক্তের ভগবান ভৃঙ্গের ন্যায় ভক্তের হৃদয়-কমলে বসিয়া প্রেমমধু পান করেন—এবং উহা পানে যে আনন্দ সেটি ভগবানের নিজস্ব। ভক্তের আনন্দ আত্ম-নিবেদনে, ভগবানের আনন্দ উহা গ্রহণে। এইটী হইল ভক্তির গৌরব ও বিশেষত্ব।

ভক্তির শক্তিতেই নিত্যধাম বৃন্দাবনের স্পন্দন ভক্তের জীবন আকম্পিত করে। উহার জন্য ভক্ত আদৌ ব্যস্ত নহেন, কারণ তাহার জানা আছে যে কর্ত্তা স্বয়ংই তাহার অনুসন্ধানে আছেন।

দেবতা কোথায় আছেন, কোন্ পর্ব্বত-চূড়ায়, বা কোন্ আকাশের পৃষ্ঠে তিনি আছেন, কোন্ দিব্যলোকে তাঁহার নিত্য লীলার অভিব্যক্তি, কোন্ আনন্দধামে তাঁহার রক্তবর্ণ হস্তস্থিত ভুবন-ভোলান বংশী, এ সব অনুসন্ধান ভক্তের প্রাণ আদৌ উদ্বেলিত করে না। ভক্ত জানেন যে ভগবান যেখানেই থাকুন না কেন, তাহাকে না পাইলে তাঁহার পূর্ণ তৃপ্তি নাই। যে আকুল-প্রাণে নবীন নটবরের বংশীধ্বনি শুনিয়া, তাঁহার নৃত্য দর্শন করিয়া আপনাকে প্রেমস্রোতে ভাসাইয়া দেয়, তাহাকে না পাইলে ভগবানের তৃপ্তি নাই। ভক্ত জানেন তিনিই ভগবানের প্রকৃতি।

একক ত কোন বিলাস হয় না। তাই ভক্তের যেমন ভগবানে টান, ভগবানেরও তেমনি ভক্তে টান। ভক্ত ইহা জানেন বলিয়া তিনি দেবতা খুঁজিতে বাহির হন না, তিনি কেবল খুঁজেন ভক্তি-পুষ্প। ভক্তের প্রেমাশ্রু, আত্ম-নিবেদন, মিলনের অমৃত-লহরী—এ মরজগতে দিব্যদর্শন। যাহার দিব্যদর্শন হইয়াছে, তিনি যথার্থই ভাগ্যবান। দিব্যস্পর্শ অমৃতের ন্যায় মৃতকে সঞ্জীবিত করে। দিব্যস্পর্শ এক নিমেষে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দেয়, সংশয় ছিন্ন করে, এবং আনন্দের আশায় যে অন্তরের অন্তরে জীব জাগ্রত রহিয়াছে, সেই স্থানে সাড়া পৌঁছাইয়া দেয়।

জগন্নাথের দিব্যদর্শন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুরই হইয়াছিল। দর্শনে তাঁহার কি ভাব হইয়াছিল, কোন্ ভাষা দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রী

বাজিয়া উঠিয়াছিল, এবং তিনি কি দেখিয়াছিলেন, তিনিই তাহা জানেন মৌনই উহার একমাত্র অভিব্যক্তি। আমি জগন্নাথকে দেখিতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার কৃপায় যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। জগন্নাথকে দেখিতে পারি নাই সত্য, কিন্তু কৃপা করিয়া তিনি একখানি হৃদয় দেখাইয়া দিয়াছিলেন—যে হৃদয়ে তিনি বিশিষ্টভাবে উপবিষ্ট ছিলেন।

ত্যক্তৈষণ শান্তমূর্ত্তি স্বামী বিষ্ণুতীর্থ ও আমি আরতির সময় মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। সহস্র সহস্র নরনারীর ভক্তির উচ্ছ্বাস, কাতরোক্তি, প্রেমাশ্রু শুষ্কপ্রাণও বিগলিত করে। মন্দিরের মধ্যে ভক্তির বন্যায়—ভাসিয়া যাওয়া ভিন্ন তাহার গতিরোধ অসম্ভব। কোন কারণ বশতঃ পুরীর রাজাজ্ঞায় কয়েক দিন দেবদাসীদিগের নৃত্য গীত বন্ধ হইয়াছে, অথচ সম্মুখেই একটি যুবতী-কণ্ঠের হৃদয়োন্মাদন সঙ্গীত শুনিতে পাইলাম—সঙ্গীত হিন্দি ভাষায়, ভক্তিরস-পরিপূর্ণ, তাল-লয়-সমন্বিত। তিনি গান গাহিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যও করিতেছেন। সে নৃত্য যে দেখে নাই, তাহাকে কিছুতেই তাহা বুঝান যায় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে যেন স্বর্গকে মর্ত্ত্যে আনা হইতেছে। স্থানীয় মহামহোপাধ্যায়—যিনি আমাদিগের সঙ্গেই ছিলেন—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেবদাসীদিগের গান বন্ধ আছে, তবে এই যুবতী কে, যিনি গান করিতেছেন? তিনি বলিলেন উনি দেবদাসী নন, জগন্নাথ-দাসী, উনি যুবতী নন, অশীতিবর্ষের অধিক উহার বয়ঃক্রম। উনি অযোধ্যা প্রদেশের কোন ব্রাহ্মণ-বংশীয়া রমণী। জগন্নাথকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া এইস্থানে প্রায় ৪০ বৎসর বাস করিতেছেন, মন্দিরে উহার অবাধ প্রবেশ।" আমি জগন্নাথ-দাসীর পশ্চাদ্‌ভাগে ছিলাম, তাঁহার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া ও নৃত্যোচিত মূল্যবান সাটিন কিংখাপের পোষাক ও নৃত্য দেখিয়া তাহাকে যুবতী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। বৃদ্ধার নৃত্য দেখিয়া ও সঙ্গীত শুনিয়া তাহাকে ষোড়শী আখ্যা না দিয়া পারা যায় না। সঙ্গীত শুনিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু আরতির শেষভাগে গোলমালের মধ্যে তাহার নিকট পৌঁছিতে পৌঁছিতে তিনি অন্তর্ধান করিলেন; দেখা পাইলাম না। অশীতিবর্ষের নারীর এত আনন্দ, এত পুলক, এমন সুস্বর, এমন ভাবময় নৃত্য,—ইনি ত সাধারণ রমণী নহেন। পরদিন স্বামী বিষ্ণুতীর্থ ও আমি তাহার মঠ খুঁজিয়া বাহির করিলাম। বল্লভাচার্য্যের মঠে থাকেন। প্রকাণ্ড মঠ—বহু প্রকোষ্ঠ, তাহার এক প্রকোষ্ঠে তিনি রাত্রিতে আরতির পর আসিয়া শয়ন করেন। সংবাদ পাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। আমরা উভয়েই

প্রণাম করিলাম। তিনি স্বামীজির হাত ধরিয়া বসিলেন ও বলিলেন "আপনি মহা-যোগী পুরুষ, আপনি আমাকে প্রণাম করিতে পারিবেন না।" আমার সৌভাগ্য—প্রণাম ও পদরজঃ হইতে বঞ্চিত হইলাম না। আমার কাছে হিন্দি ভাষাতে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার মাতা জীবিতা ও বয়স তাঁহারই ন্যায় শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাকে কেন পুরীধামে আনি নাই। বলিলাম তিনি জগন্নাথদেব দর্শন করিয়াছেন, এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ—স্থানান্তরে গমনাগমন সুবিধাজনক নহে।

বলিলেন "এই দেখ আমার এত বয়স কিন্তু আমি প্রত্যূষে উঠিয়াই স্নান করিয়া মন্দিরে যাই। এবং সেখানে নৃত্যগীত করিয়া অপরাহ্নে আসি। দুই এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়াই আবার সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে মন্দিরে গিয়া নৃত্যগীত করি, আর প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় আসিয়া শয়ন করি—আর তোমার মাতা এখানে আসিতে পারেন না? তিনি নিশ্চয়ই পারেন, তুমি তোমার নিজের সুবিধার জন্য তাঁহাকে আন নাই; কেমন তাই না? আমি বলিলাম কতকটা তাও বটে, আর আমি স্বামীজিদিগের সহিত হঠাৎ বিনা সঙ্কল্পে রওনা হইয়াছিলাম; আসিবার সময় তিনি আসার কথা বলেন নাই, আমিও বলি নাই। তৎপরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনার উপাসনা-প্রণালীর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

জগন্নাথদাসী—কেন পারিবে না? আমি কোন তন্ত্র-মন্ত্র, যোগ-যাগ কিছুই জানি না—নিজে লিখিতে পড়িতেও জানি না, জানি কেবল একমাত্র জগন্নাথ, সকলই তিনি, তাঁহারই নাম জপ, তাঁহারই রূপ ধ্যান, তাঁহার সেবা—ইহা ছাড়া জীবনে আর কিছুই নাই, কেবল একমাত্র জগন্নাথ, আর যাহা সব ঐ জগন্নাথের মধ্যে।

আমি—জগন্নাথের প্রতি আপনার ভক্তি কিরূপে হইল?

জগন্নাথ-দাসী—সে এক লম্বা কথা। শুন্‌বে, তবে শুন। আমার নিবাস অযোধ্যা প্রদেশে—জাতিতে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। সংসারে শাশুড়ী আছেন, স্বামী আছেন, আমা অপেক্ষা ৪।৫ বৎসরের বড়; দুইটি পুত্র বড় বড়। আমার বয়ঃক্রম তখন প্রায় ৪০ বৎসর। মাঝে মাঝে স্বপ্নে জগন্নাথদেবের দর্শন পাইতাম। কেন জগন্নাথের দর্শন পাইতাম জানি না। পটে জগন্নাথের যে মূর্ত্তি দেখিতাম, ঠিক সেই মূর্ত্তি। পুরীতে আসিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু স্বামীর অনুমতি পাইতাম না। ক্রমে জল আনিতে যাইবার সময়, একাকী রন্ধনশালায় বসিয়া পাক

করিবার সময়, কিম্বা গভীর রাত্রিতে কোন সময় গৃহের বাহিরে আসিলে, মানুষজন দেখিতে পাইতাম না, অথচ শব্দ শুনিতাম ; "কই তুই ত এলি না"—মাঝে মাঝে এইরূপ শুনিতাম, বিশ্বাস করিতাম জগন্নাথদেব আমাকে ডাকিতেছেন। স্বপ্নেও ঐরূপ ডাক শুনিতাম। শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বলিলে তিনি বলিলেন, "বউ, তোর মাথায় ঠাণ্ডা তৈল্‌ দে, তোর পরিশ্রম করে করে মাথা খারাপ হয়েছে।" স্বামীকে বলিলাম যে আমি জগন্নাথ-ক্ষেত্রে যাইব। তিনি বলিলেন পতি-সেবাই সর্ব্বতীর্থ-দর্শন। অবশেষে গ্রামের অনেক লোক জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইতেছেন—দেখিয়া আমার বিশেষ নির্ব্বন্ধহেতু পতির নিকট হইতে আসিবার অনুমতি পাইলাম। কিন্তু পুত্রেরা কিংবা পতি কিংবা শ্বাশুড়ী কেহ আসিলেন না। কলিকাতায় রেলে আসিয়া সেখান হইতে অন্যান্য যাত্রিসহ পদব্রজে পুরী আসিলাম। সেই অবধি পুরীতেই আছি।

আমি—আপনার স্বামী কি এখনও জীবিত আছেন? হাতে অলঙ্কার দেখিতেছি!

জগন্নাথদাসী—(সহাস্যে) আমার মানুষ পতি অনেক দিন স্বর্গে গিয়াছেন। পুত্র দুইটি এখনও জীবিত কিন্তু তাহারাও বৃদ্ধ। বাবা, জগন্নাথ এখন আমার পতি। তিনি ত জীবিত। সুতরাং আমার সধবার বেশ, বুঝলে?

আমি—পুত্রেরা কখনও আপনাকে লইতে আসেন নাই?

জগন্নাথদাসী—হাঁ দুইবার আসিয়াছিলেন। বলিলেন মা, তুমি জগন্নাথদাসী হইয়াছ, ভিক্ষা করিয়া খাও, উহাতে আমাদের সমাজে বড় গ্লানি হয়। তুমি বাড়ী ফিরিয়া চল। আমি বলিলাম—তোরা মূর্খ, আমি জগতের পতির পত্নী, ইহাতে তোদের শ্লাঘা হওয়া উচিত। তোরা যে আমার পুত্র, সে আমার গর্ভে জন্মিয়াছিলি বলিয়া নয় ; ঐ জগন্নাথের সম্পর্কে। পুত্রেরা নিরুত্তর হইয়া চলিয়া যায়।

আমি—যে সব যাত্রীদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহারা আপনাকে লইয়া গেল না?

জগন্নাথদাসী—তাহারা অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, শেষে না পারিয়া কিঞ্চিৎ খরচ দিয়া চলিয়া যায়।

আমি—মন্দিরে আপনার সাটিন ও কিংখাপের পোষাক দেখিলাম, উহা পাইলেন কোথায়?

জগন্নাথদাসী—দেখ, আমি কখনও সঙ্গীত অভ্যাস করি নাই। পিত্রালয়ে

সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত যে নাচ গান করিতাম এইমাত্র। এখানে আসিয়া জগন্নাথকে পতিরূপে বরণ করিলাম—সেই সময় নাচ ও গান করিতে আরম্ভ করিলাম। সুরও নাই, তালও নাই, যা মনে আসে তাই গাই, যেরূপ মনে হয় নৃত্য করি। লোকে পাগলিনী বলিয়াই সাব্যস্ত করিল। মন্দির হইতে সময় সময় বাহির করিয়া দিত। কিন্তু ক্রমে যখন দেখিল যে আমি নিজেই পাগল, কাহারও কোন ক্ষতি করি না, তখন মন্দিরে আমার অবাধ গতি হইল। মহাপ্রসাদ একমাত্র সম্বল—কোনদিন পেট ভরে, কোনদিন ভরে না। এইরূপ যায়; ক্রমে দেখি লোকে দাঁড়াইয়া আমার গান শুনে, একমনে নাচ দেখে। বিজয়নগরের রাণী একবার গান শুনিলেন, বলিলেন মা, তোমার এমন সুন্দর গান ও নাচ, যে আমার ইচ্ছা হয় তোমাকে নাচের ভাল পোষাক দেই। আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। পরদিন নিজে আসিয়া পোষাক পরাইলেন; আমি ছেঁড়া কাপড় ছাড়িয়া আজ পতির সম্মুখে বহুমূল্য পোষাক পরিয়া নাচ গান করিলাম। বলিলাম নাথ, তোমার ইচ্ছা যে আমি ভাল পোষাক পরি, বেশ তাই পরিলাম। দিনকতক পরে কে যেন তাহা চুরি করিয়া লইয়া গেল। আমি বলিলাম বেশ হয়েছে, যাহার দরকার জগন্নাথ তাহাকেই দিয়াছেন। আবার কাশীর রাজ-পত্নী এক পোষাক দেন, শেষে কত লোকে দিয়াছে; আমিও আর যত্ন করি না। শেষে যে পোষাক আছে, উহাও পুরাতন হইয়াছে।

আমি—এই মঠে কি সূত্রে?

জগন্নাথদাসী—ওহে দেখ, আমি জগন্নাথের মন্দিরের প্রাঙ্গনেই থাকিতাম, বল্লভাচার্য্য-পত্নী বলিলেন মা, তোমার দীক্ষার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তোমার দেহের সৎকার ত চাই। যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হও, তাহা হইলে দেহের সৎকারের ব্যবস্থা হইবে না। অতএব তুমি আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হও, ও এই মঠেই থাক। সেই অবধি এইখানেই আছি।

আমি—আপনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু আপনার ত রাগ-রাগিণী বিশুদ্ধ, এবং তাল-লয়ও ত ঠিক।

জগন্নাথদাসী—তা দেখ, ও তাঁরই কৃপা। আমি যে সব গান করি, তাহাও ঈশ্বর কৃপা। কিন্তু আমি তোমাদের লেখাপড়ার ধার ধারি না। তোমার মা কি লেখাপড়া জানেন?

আমি—না, তিনি লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু তাঁহার নিকট আমি অনেক কথা শিখিয়া থাকি।

জগন্নাথদাসী—গান শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে, কেমন ?

বিষ্ণুস্বামী—সে কথা আমরা সাহস করিয়া কি করিয়া বলি। এই কথা হইতে হইতে তিনি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, জগন্নাথের সম্মুখে যে পোষাক পরিয়া নৃত্য করেন, তাহা পরিয়া নূপুর পায় দিয়া নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। আমি ও বিষ্ণুস্বামী তন্ময়ে সেই গান শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে দুইটী গান হইল, তৃতীয় গানের মধ্যেই তিনি আবেশে ভূমিতে দড়াম দিয়া পড়িয়া গেলেন—আমি ধরিতে গেলাম। মঠের এক সাধু নিষেধ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য হইল। সেই পুলক, সেই অশ্রু, সেই গদগদ ভাষা, কখনও ভুলিব না। নূতন এক জগতে আসিয়া পৌঁছিলাম। কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে আছি। কারও মুখে কোন সাড়া নাই। সন্ধ্যা আগত-প্রায়। হঠাৎ জগন্নাথদাসী বলিলেন—"বাবা, ডাক পড়েছে। আরতির সময় হইল, আবার কাল এস"—আমি বলিলাম, ভাগ্যে আর আপনার সহিত দেখা হয় কিনা জানি না—কিছু চাই, খালি হাতে বাড়ী যাইব না। "বাবা, আমি ত ভিখারিণী, আমার ত কিছুই নাই! এই বলিয়া আমাকে কোলে বসাইয়া মাথায় ও বক্ষে হাত দিয়া বলিলেন বাবা, জগন্নাথই সব, তিনিই গতি, তিনিই স্থিতি। তখন শ্যামল সন্ধ্যার ছায়াপাতে, বিশ্ব-মানবের হৃদয়তীর্থে প্রকৃতির আরতির গীত—ভূলোক দ্যুলোক ঝঙ্কৃত করিয়া বলিয়া গেল—জগন্নাথই পরম স্থিতি।

পূজ্যপাদ স্বামী বিষ্ণুতীর্থের চোখেও জল আসিল। আমাকে বলিলেন, তুমি ভাগ্যবান, আমিও ভাগ্যবান। আজ গোপীপ্রেম যে কি, তাহার আভাস পাইলাম।

আগমনী।

লেখক—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

(১)

এস মা আনন্দময়ি! বঙ্গ-নিকেতনে
সুখময় শরতের প্রসন্ন প্রভাতে,—
সুন্দর শেফালি-কুঞ্জ, নিকুঞ্জ কাননে
রচেছে কুসুমাসন, শিশির-সম্পাতে!

(২)

বরষার ধারাপাতে সজীব শীতল
সাজিয়াছে নববেশে প্রকৃতি-সুন্দরী।
বল্লরী, বিটপী, শষ্প, নবীন নির্ম্মল
জাগায় সবার প্রাণে আনন্দ-লহরী।

(৩)

তব আগমনে মাগো, বিশ্ব-চরাচর
হাসিছে, ভাসিছে অই স্নেহের সরসে;
হরিৎ ধান্যের ক্ষেত্র, মরুৎ মন্থর,
পুলক-চঞ্চল তব আশীষ-পরশে!

(৪)

এস মা করুণাময়ি, দীন বঙ্গভূমে।
কি দিয়া পূজিব তব ও রাঙ্গা-চরণ,
সাজায়ে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, ভকতি-কুসুমে
সমাদরে করিলাম অঞ্জলি অর্পণ!

নৈষ্ঠিকী ভক্তি।

লেখক—শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত-সেবয়া,
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতী নৈষ্ঠিকী।

প্রতিনিয়ত ভাগবতশাস্ত্র বা ভগবৎপরায়ণ সাধু মহাত্মাদিগের সেবার অভদ্র

অর্থাৎ কামাদি বাসনা বা কুপ্রবৃত্তিনিচয় বিনষ্ট হইলে পর, উত্তমশ্লোক ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। হৃদয়ে নিশ্চলা ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে আর তথায় কুপ্রবৃত্তিনিচয় থাকিতে পারে না। আলোক আঁধার একত্র অবস্থান করে না। রজঃ ও তমঃ হইতে উৎপন্ন কামাদি তিরোহিত হইলে মন সত্ত্ব-গুণাশ্রিত হইয়া প্রসন্ন হয়। তখন শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ ভগবান তাদৃশ মনে প্রতিবিম্বিত হন। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি যে কোন পথ দিয়া যাও না, এইখানেই সবারই বিশ্রান্তি। দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে সাধনা না করিলে অনন্ত জন্ম ধরিয়া বিচার করিলেও বস্তু লাভ হইবে না। একমাত্র ধর্ম্মই এই ভারতের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। ভারতের মেরুদণ্ড সুদৃঢ় বিধায়; ভারতীয় হিন্দুজাতি, নিরবচ্ছিন্ন অর্থপরতায় চিত্তের সুখ শান্তি হারায় নাই। নিরাশার দাবদাহে ভস্মীভূত হয় নাই, বা ইতরজন-সংঘের হৃদয়-শোণিত-পানে লোলুপ হয় নাই। সত্য বটে সংসারিক জীবের অর্থ নিয়ত প্রয়োজন-সাধন। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "ধর্ম্মার্থ-কামাঃ সমমেবসেব্যা, যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ।" ধর্ম্মার্থ-কাম সমভাবেই সেবা করিবে, যে একতরে আসক্ত সে নিন্দনীয়। অর্থ ও কামের এতই প্রবল আকর্ষণ শক্তি যে, একবার কেহ সে স্রোতের টানে পড়িলে আর অব্যাহতি পায় না। বিশেষতঃ ভারতীয় হিন্দুজাতি, বৈরাগ্য বা ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছেন। দুই নৌকায় পা দিলে মৃত্যু ভিন্ন নিস্তার নাই। আর যদি মুক্তিই জীবের কাম্য হয়, তবে অবশ্যই তাহাকে বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে হইবে। শান্তি-প্রয়াসী ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুজাতি অর্থের দাসত্ব স্বীকার না করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। আর, জগতের লোক সবাই যে এক পথের পথিক হইবে, ইহা কি সম্ভব? জগতে যদি কেহ স্বীয় আত্মার উৎকর্ষ-বিধান করিতে পারে তাহাতে বাধা দিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হউক বা নাই হউক, শ্রেষ্ঠ-বৃত্তি দেবতুল্য মনুষ্য-জীবন কি প্রার্থনীয় নহে? আর যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা যে সংসারের বাহিরে, ইহাও সত্য নহে। বরং ধার্ম্মিকেরাই জগতের সমধিক কল্যাণ-সাধন করেন। শাস্ত্রকার ঋষিগণ দুইটী পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির পথ দুঃখ-সঙ্কুল সুখ, আর নিবৃত্তির পথ ঐহিক পারত্রিকের সুখের হেতু। কথামাত্রেই মানব ধার্ম্মিক হইতে পারে না। ধর্ম্মের সৌধে উঠিতে হইলে তাহার অনেকগুলি সোপান আছে। তাহার একটী সোপানে আরোহণ করিতে হইলেই অনেকের দীর্ঘজীবন গত হইয়া যায়। বৃথা বাগাড়ম্বরে কোনই ফলোদয় নাই।

কামিনী-কাঞ্চন একদিকে, ধর্ম্ম তাহার বিপরীত দিকে। বিপরীত-ধর্ম্মী দুটী বস্তু একই সময়ে অধিগত হওয়া সুদুর্লভ। যাঁহারা ধর্ম্মই মানবের একমাত্র সুহৃদ্ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত পদার্থ উপভোগ দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন কোন বস্তুতেই দুঃখশূন্য সুখ নাই। সমস্তই পরিণাম-বিরস। শুধু তাহাই নহে, যাহা অধিক প্রিয় বোধ করা যায়, তাহাই অধিক যাতনাপ্রদ। সবাই নিজের বুকে হাত দিয়া বলুন সত্য কি না? সুখই যদি মানবের বাঞ্ছিত হয়, তবে বিরাম-বর্জ্জিত সুখই মানবের অভীষ্ট হইবে। যদি বল তাহা অসম্ভব, অপার্থিব স্বর্গীয় সুখও দুঃখ-মিশ্রিত। তবে, মানব আর তাদৃশ সুখ কোথায় পাইবে? বহু দিন ধরিয়া মানব তাদৃশ সুখ অনুসন্ধান করিল; পাইল না। তখন নির্জ্জন গিরি-গুহা হইতে প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল। "যমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, তৃপ্তো ভবতি, আনন্দীভবতি স এবায়মাত্মা শ্রোতব্যো মন্তব্যশ্চেতি।" যাঁহাকে জানিতে পারিলে মানব মৃত্যুর অতীত হয়, তৃপ্ত হয়, সুখী হয়, সে এই আত্মা। শ্রুতিবাক্য হইতে তাঁহার স্বরূপ শ্রবণ কর, তাঁহার বিষয় চিন্তা কর, তাঁহাকে অনুসন্ধান কর। মানব অনন্তকাল ধরিয়া যাহা খুঁজিতেছিল, কোথাও যাহার অনুসন্ধান পায় নাই; এত দিনে তাহার সন্ধান পাইল। নিধি গৃহেই ছিল, সন্ধান করিয়া দিবার লোক মিলে নাই। যাহা নাই এমত বস্তু কেহই দেখাইয়া দিতে পারে না। এমত হইতে পারে যে বস্তু আছে, কিন্তু আমার জানা নাই, অন্যের জানা আছে। সেই জ্ঞাতা ব্যক্তি অবশ্যই সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন। অনন্ত অখণ্ড আনন্দ-সমুদ্র আছে, তাহা চেষ্টা করিলে আমরা পাইতে পারি, ইহা আমাদিগকে কে বলিয়া দিল? প্রত্যক্ষ ধর্ম্মদ্রষ্টা ঋষিগণ! যাঁহারা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই ঋষি-পদবাচ্য। এখন ভাবুন যাঁহারা সেইরূপ সুখ চাহেন, তাঁহারা অনুসন্ধানে বা যত্ন করিতে ক্ষান্ত হইবেন কেন? যত্ন করিলে রত্নলাভ অবশ্যই একদিন হইবেই।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা না একটা বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই বিভিন্ন পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। আমরা হিন্দু, আমরা বলি অনন্ত পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে মানুষের জীবন একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে। কারণ, অনন্ত অতীতকালের কর্ম্ম-সমষ্টিই বর্ত্তমান আকারে প্রকাশ পায়। আর আমরা বর্ত্তমানের যেমত ব্যবহার করি, তদনুসারেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে। এই কারণে দেখা যায়, এই পৃথিবীতে

জাত প্রত্যেক ব্যক্তিরই একদিকে না একদিকে বিশেষ ঝোঁক থাকে। তাহাকে সেইভাব অবলম্বন করিতেই হইবে। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন, ব্যক্তির সমষ্টি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতির একটা-না-একটা বিশেষ ঝোঁক্ থাকে। প্রত্যেক জাতিরই যেন বিশেষ বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। প্রত্যেক জাতিকেই যেন সমগ্র মানব-জাতির জীবনকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার জন্য কোন এক ব্রত-বিশেষ পালন করিতে হয়। রাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন-কালে আমাদের জীবনোদ্দেশ্য নহে। কখনও ছিল না, ভবিষ্যতেও কখনও হইবে না। ধর্ম্মই আমাদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য হারাইলেই আমরা বিনষ্ট হইব। যদি কেহ বলেন, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই ভারত অধঃপাতে গিয়াছে, তবে তিনি ভ্রান্ত। ধর্ম্ম যেমন আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে, আমাদেরও সেইরূপ ধর্ম্মকে ধরিয়া রাখা অত্যাবশ্যক। ধর্ম্ম বলিতে কয়েকটী ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান মাত্র বুঝিতে হইবে না। ধর্ম্ম আমাদের দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, আত্মার সহিত নিয়ত সম্বন্ধে সম্বন্ধ। ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিলে অচিরাৎ আমাদিগকে ধ্বংসপুরে গমন করিতে হইবে। শাস্ত্রবাক্য সরলভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, গোঁড়ামী একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আত্মহত্যা হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতে হইবে। যাহারা সকল দিক রক্ষা করিয়া চলিতে অক্ষম, তাহাদিগকে একমাত্র ভগবানের রাতুল চরণে শরণ লইতে হইবে। সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর চরণে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তাহাতে দ্বিধাভাব থাকিলে ভাবগ্রাহী মধুসূদন চরণে স্থান দিবেন না। সমস্ত হৃদয়খানা বিশুদ্ধ ভক্তিবারি-বিধৌত করিয়া পবিত্র ও স্বচ্ছ করিয়া তাহাতে প্রাণ-সিংহাসন স্থাপন করিয়া হৃদয়-রাজ্যের ঈশ্বর প্রাণগোবিন্দকে বসাইয়া নির্নিমেষ নয়নে সেই ভুবনমোহন রূপ-মাধুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক এই দেহ, গেহ, জীবন, মন, জনম, চরিতার্থ করিতে হইবে। ইহাই জীব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য, হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যদি এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া এই পাঞ্চভৌতিক দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারি, তবে জন্মান্তরে সেই সংস্কার-বশে সাধন-পথে আর একটু অগ্রসর হইতে পারিব। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে অবশ্যই এক দিন গোপীজন-বল্লভ, প্রাণ-গোবিন্দের শ্রীচরণ-পল্লব দর্শন পাইব। যেন কোন মতে উদ্দেশ্য হারা না হই। বিষ্ঠার কৃমি হইয়াও প্রাণবল্লভের ফুল্লেন্দীবরকান্তি মূর্ত্তি যেন বিস্মৃত না হই। তাহা হইলেই জীবন জনম ধরম করম সফল জ্ঞান করিব।

আমরা কাল দেশ নিমিত্তের অন্তর্ব্বর্ত্তী, জড়ের সহিত মিলিত। আমার নিরাকার সূক্ষ্মতত্ব ভাবিতে পারি না। আমরা সগুণ সুতরাং আমরা সগুণ ঈশ্বরই প্রার্থনা করি। তিনি প্রেমময়, রসময়, আনন্দ-ঘন-স্বরূপ, ইহাই আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থ, দুষ্টের দমনার্থ জগতে মানব-রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। তবে যে, যে ভাবে তাঁহাকে চাহে, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দেখা দেন। নচেৎ জগতে তাঁহার শত্রু মিত্র কেহই নাই। সবাই প্রেম-ময়ের প্রেম-পাত্র, সবাই তাঁহার অনুগ্রহ-ভাজন। সাম্না জীবন মতামত লইয়া দলাদলি দ্বেষাদ্বেষি করায় কোনই ফল নাই। যে কোনরূপে ভগবৎ-সাক্ষাৎ-কার-পূর্ব্বক চরিতার্থ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাঁহাকে খুঁজিতে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে হইবে না, তিনি হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন। ধরিতে শিখিলেই তিনি ধরা দিবেন। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি, প্রেমিকের প্রণয়িনীর প্রতি, দীর্ঘ প্রবাসীর গৃহের প্রতি, ধেনুর বৎসের প্রতি, তৃষ্ণাতুরের জলের প্রতি যেমন প্রবল অনুরাগ হয়, ভগবানের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ বা মনের টান্ যেদিনে হইবে সেই দিনেই জীবন-জনম সফল হইবে। কাচ-তুল্য ক্ষণভঙ্গুর এ জীবন, প্রকৃত ব্যবসায়ী হইলে, সে চিন্তামণির সহিত বিনিময় করিয়া লইতে পারে। অব্যবসায়ী হইলে কাচ-মূল্যে কাঞ্চন-বিক্রয় করিয়াও বুঝিতে পারে না যে, তাহার কতটা ক্ষতি হইয়াছে। আমরা সবাই অব্যবসায়ী, নতুবা কেন এমন অমূল্য জীবন-রতন তুচ্ছ বিষয়-ভোগের আশায়, আহার-নিদ্রায় ক্ষয় করিব? যদি শত বর্ষ জীবিত থাকি, তথুও আহার, নিদ্রা, ধনার্জ্জন, বিষয়-ভোগ প্রভৃতি কার্য্যে তাহার সমস্ত অংশ ব্যয় করি। পরিণামে পরিতাপ যদি ঘটে, তবে তাহার জন্য আমি ভিন্ন আর দায়ী কে? নিজের খনিত পয়ঃ-প্রণালী-সলিলে যদি নক্র আসিয়া আমায় গ্রাস করে, তজ্জন্য কে অনুশোচনা করিবে? ঈশ্বর, নিষ্ঠুর বা পক্ষপাতী নহেন; আমাদের ভাগ্য আমরা নিজেই গঠিত করি, তজ্জন্য অপর কেহই দোষী নহে। গুরু, শাস্ত্র, বিবেক, হিতৈষী বান্ধব, এই সকলের হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যদি আমরা অনলে আত্ম-সমর্পণ করি, তজ্জন্য অপরে নিমিত্ত-ভাগী হইবে কেন? আমরা নিজেকে অতি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মনে করি, কিন্তু ষোল-আনা জীবনটা লোক্‌সান্ যাইতেছে, এবেলা মূর্খতা দেখাই কেন? বেচা কেনার বাজারে যে ঠকে, সেই মূর্খ। পশু হইতে মানব যখন সর্ব্বাংশে

শ্রেষ্ঠ, তখন তাহার মূর্খতা প্রকাশ হইবে কেন? "যা লোকদ্বয়-সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।" যে চাতুরী-বলে ইহলোক পরলোক জয় করা যায় সেই চাতুরী প্রকৃত চাতুরী।

এই মানব-দেহ ভগবৎ-প্রাপ্তির অনুকূল শ্রেষ্ঠ সাধন। দেবগণও ভগবৎ-প্রাপ্তির আশায় মানব-দেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন। এই দেহ রক্ষার জন্য যতটুকু যাহা বিষয়ের সহিত সম্পর্ক প্রয়োজন, তাহাই করিবে। তাতোধিক সম্পর্ক করিতে গেলে সাধনের ব্যাঘাত ঘটিবে। চরিতার্থতা সম্পন্ন হইয়া গেলে, তখন সর্ব্বভূতে ভগবৎ-সত্তা অনুভূত হয়। সুতরাং তখন আপনা হতেই সর্ব্বভূতে দয়া জন্মে। তখন দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যা, মান অপমান বোধ, অহঙ্কার, যশোলিপ্সা কিছুই থাকে না। তখন নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক ভগবান ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। তখন "ন স পুনরাবর্ত্তেত" সে আর ফিরিয়া এ জগতে আইসে না। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ঘটিলে মানবের ঐহিক জন্মান্তরীণ, ফলোন্মুখ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়। কর্ম্মই সুখ-দুঃখাদিজনক কর্ম্মের প্রয়োজক। সেই কর্ম্ম সমূলে বিনষ্ট হইলে আর বন্ধের কারণ কিছুই থাকে না। সুতরাং এ জগতে আর আসিবার কারণ থাকে না। যাঁহারা ভগবানের নিত্য পার্ষদ, তাঁহারা লীলার্থে ভগবানের সহিত অবতীর্ণ হইলেও তাঁহারা অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। মায়াবদ্ধ জীববৃন্দ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না। যদি বল, ভগবানের অবতারের আবশ্যকতা কি? অতিদুর্গম, বিঘ্ন-সঙ্কুল, ভীতিপূর্ণ, তিমিরাবৃত পথের উপযুক্ত পথপ্রদর্শক নায়কের অবশ্য প্রয়োজন আছে। তাঁহারই আলোক-বর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া আমরা সে পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ। ভগবান স্বয়ং কি বলিতেছেন দেখুন "যদ্যপ্যহং নবর্ত্তেয় জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ, উৎসেদেয়ু রিমে লোকা, ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং" অনলসভাবে যদি আমি কখনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই, তাহাহইলে জগতের এই মনুষ্যগণ উৎসন্ন হইয়া যাইবে। ভগবানের কর্ম্মের বিরতি নাই। অনন্ত সৌরজগৎ, বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, সর্ব্বত্র, অণু পরমাণু মধ্যে তাঁহারই অনন্তশক্তির কার্য্য চলিতেছে। যে চক্ষুমান, সেই তাহা দেখিতে পায়। ইহা ভিন্ন তিনি ভক্তের কাতর প্রার্থনায়, তাঁহাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশার্থে এবং দুষ্টের দমনার্থ এ ধরাধামে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

মৎস্য, কূর্ম্ম, বুদ্ধ, বামন প্রভৃতি কেহ সেই পুরুষের অংশ বা কলা, আর কৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন বিভু।

সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পাপময় কলিযুগে পতিত নিরুপায় নর-কুলের উদ্ধারের জন্য শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি লইয়া "অন্তঃ কৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ" ভুবন-মোহনরূপে শ্রীশ্রীশচী মাতার উদরে নিষ্কল পূর্ণচন্দ্ররূপে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পতিত-উদ্ধারের নিমিত্ত, প্রিয় গৃহিণী ও জননীকে দুস্তর শোক-সাগরে ভাসাইয়া জগতে ঘরে ঘরে হরিনাম-সুধা বিতরণ করিয়া জগৎ পবিত্র করিয়াছেন। তাঁর রূপ-মাধুরী নির্নিমেষ-নয়নে দেখিলেও তৃপ্তি হয় না।

রূপং স্বর্ণানুরূপং বিদধদিহ গয়াগঙ্গয়া সেবিতাঙ্ঘ্রিঃ।
কৃষ্ণঃ সম্ভূয় ভূয়ো ভুবি বিমলকুলে গৌরবর্ণো বিবর্ণঃ।
স্মারং স্মারং প্রিয়ার্ণং যুগনয়ন-গলদ্বারিধারা-ধরোঽয়ং।
তীর্থং তীর্থং সতীর্থৈ রটতি রটতি হা রাধিকারাধিকেতি ॥

রূপ স্বর্ণানুরূপ, গয়া গঙ্গা তীর্থ কোটি তাঁহার চরণাশ্রিত, এবং সেই রাধা-রমণ শ্রীকৃষ্ণই পুনরায় গৌররূপে বিমল ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণ-নিবন্ধন প্রভুর অপরূপ রূপ, বিকৃত হইয়াছিল। প্রিয়া রাধিকার প্রেম-ঋণ নিরন্তর স্মৃতি-পথে উদিত হওয়ায় জলবর্ষী মেঘবৎ প্রতীত হইতেন। সমপাঠীদিগের সহিত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেন এবং হা রাধিকা! এইরূপ বিলাপোক্তি করিতেন। যাহারা ঋণ শোধ করিতে পারে না, মহাজন তাহা-দিগের নামে ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ করিলে, তাহাদিগের দেওয়ানী জেল হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রিয়া রাধিকার ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায়, স্বয়ংই নবদ্বীপ অর্থাৎ দ্বীপান্তররূপ কারা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন "অধিকা কারা আরাধি" অর্থাৎ অতিরিক্ত কারা বরণ করিয়া লইয়াছি, এমত অর্থও ঐ শ্লোক হইতে আসিতে পারে। আর একটি অর্থও উক্ত শ্লোক হইতে আসিতে পারে। অধিকা কা আরাধি? অর্থাৎ হে প্রিয়তমে রাধে! তোমা ভিন্ন আর কোন্ রমণীকে আমি আরাধনা করিয়াছি? আর কাহাকেও নহে, অর্থাৎ একমাত্র তুমিই আমার প্রার্থনীয়া। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভক্তির বিভিন্ন ভাব বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচারিত আছে। কিন্তু, প্রেমময় মধুর ভাব, অর্থাৎ প্রেমভক্তি, মহাপ্রভুই জগতে প্রচার করেন। এজন্যই চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ" বহুদিন হইতে এই প্রেমভক্তি জগতে কেহই অর্পণ করে নাই। তাহাই বিতরণ করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপধামে

সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদসহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি জগতের দুঃখ দেখিয়া অবিরত অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন, জগৎও তাঁহার জন্য দর-বিগলিত ধারে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছে। কাম-কিঙ্কর বিষয়ী মানবের হৃদয় বিগলিত করিয়া সেই হৃদয়ে নামবীজ অঙ্কুরিত করা এই গৌর অবতার ভিন্ন অন্য যুগে সাধিত হয় নাই। হৃদয়ের শক্তিতে অন্যদীয় হৃদয় বিনীত করা এক বৌদ্ধাবতারে আর এই গৌরাঙ্গ অবতারেই সিদ্ধ হইয়াছে।

যদি কেহ মনে করেন, শাস্ত্রে কথিত আছে "বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ। অপকার্য্য-শতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যো মনুরব্রবীৎ" বৃদ্ধ পিতামাতা, সতী স্ত্রী, শিশুপুত্র, ইহাদিগকে শত কুকার্য্য করিয়াও পালন করিবে, ইহা মনু বলিয়াছেন। অতএব বৃদ্ধা জননী ও সতী স্ত্রী ত্যাগে শচী-নন্দন পাপ-ভাগী হইবেন না কেন? এ ব্যবস্থা গৃহীর পক্ষে বটে, কিন্তু বিরাগীর পক্ষে নহে। স্মৃতি অপেক্ষা শ্রুতিই বলবতী, সেই শ্রুতি কি বলিতেছেন, শুনুন। "যদহরেব বিরজ্যেত, তদহরেব প্রব্রজেদিতি" যে মুহূর্ত্তে বৈরাগ্যের উদয় হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। তাহাতেই পিতৃলোক দেবলোক কৃত-কৃতার্থ হইবেন। এবং তাহাতেই সর্ব্বশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে। অলৌকিক ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে, জগৎবাসী তাঁহার জন্য কাঁদিবে কেন? যাঁহারাই অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারাই জগতের সমক্ষে আত্মবলি প্রদান করিয়াছেন। যিশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক ইঁহারা সবাই আত্মবলি দিয়া জগতের গুরু হইয়া চিরপূজ্য হইয়াছেন। অর্থ দিয়া, ভূমি দিয়া, অন্ন দিয়া, মানবের যে হিত সাধন করা যায়, তাহা অতি তুচ্ছ। যিনি প্রকৃত জ্ঞানদান পূর্ব্বক গন্তব্য পথ দেখাইয়াছেন, তিনিই নর-কুলের বরেণ্য এবং তিনিই প্রকৃত জীব-হিতৈষী। অন্ধকে যিনি হাত ধরিয়া প্রকৃত পথে লইয়া যান, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। এই উদ্দেশ্যেই অবতারগণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যাহারা ভাগ্য-বান্, তাহারাই তাঁহাদিগকে চিনিতে ও ধরিতে পারে। কঠোর তীব্র ত্যাগ, তীব্র বৈরাগ্য প্রদর্শন না করিলে, কেহই গুরুর আসনে বসিতে সক্ষম হয় না। মহাপ্রভুর বৈরাগ্য অতি তীব্র, পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত। তিনি বিষয়ীর প্রদত্ত অন্ন-জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার মতে কামিনী ও কাঞ্চন চিত্তে স্থান দেওয়াও মহাপরাধ। পাছে, অণুপরিমাণ পাপ-বিষ-জীবাণু শরীরে সংক্রমিত হইয়া দেহ, মন পতিত করে, এই ভয়ে তিনি পাপের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং সতত বিষয়াভিমুখী,

তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিলে আর কি সেই মন দ্বারা সাধন ভজন হইতে পারে? এই জন্যই তিনি অত্যন্ত কঠোরতা প্রকাশ করিতেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক প্রিয়-সুহৃদকেও ত্যাগ করিতে হইয়াছে। সমস্তই লোক-শিক্ষার জন্য। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে মন নানাগামী হইয়া যেন ব্যভিচারী না হয়। এই হৃদয়-রাজ্য একমাত্র প্রাণবল্লভ শ্রীগোবিন্দের অধিকার। আর যেন কেহ এ রাজ্যে আধিপত্য-বিস্তার না করিতে পারে। সেই শ্রীগোবিন্দের রাতুল চরণ ছাড়া এ জীবন যেন আর অন্যত্র বিক্রীত না হয়। দিবারাত্রি তাঁহারই গুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন যেন জীবনের ব্রত হয়। তিনি আমাদের, আমরা তাঁহারই, ইহাই যেন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়।

(ক্রমশঃ)

জন্ম ও মৃত্যু।

লেখক—শ্রীপশুপতি সরকার।

জীবনের মাঝে মরণে হেরিয়া
কেন কাঁপে তোর বুক?
ছিন্ন বসন ত্যজিয়া কাহার
নব বাসে হয় দুখ?

(২)

রজনীর শেষে দিবস আসেই
রাত্রি আসে পুনঃ ফিরে,
জনমের মাঝে মরণ আসিয়া
জীবনে দাঁড়ায় ঘিরে।

(৩)

দেহের মাঝারে কৌমার যৌবন
তার পর আসে জরা,
মৃত্যু তেমনি আত্মার কেবল
নূতনের কোলে চরা।

(৪)

সুপ্তির পর চেতন যেমন
সূর্য্য উঠার আগে,

আত্মার তেমনি করম-স্পৃহা
　　নূতন করিয়া জাগে।

(৫)

জন্মের যে রে নাইক মরণ
　　না হলে কর্ম্মের শেষ,
কায়ার কেবল অদল বদল
　　আত্মার ভ্রমণ দেশ।

(৬)

জনম মরণ ধাতার নিয়ম
　　নিবারিবে তাই কে রে,
শঙ্কা কি ভাই, হাসিমুখে তুই
　　মরণে বরিয়া নে রে।



সংবাদ ও মন্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

কবিরাজ—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

আমি আনন্দের সহিত সকলকে জানাইতেছি যে নিম্নলিখিত ঔষধটী মহামারী প্লেগের মহৌষধ। আমি যে যে ক্ষেত্রে এই ঔষধটী প্রয়োগ করিয়াছি, সর্ব্বত্রই সফলতা লাভ করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ঔষধ ব্যবহার করিলে সকলেই আশানুরূপ ফল পাইবেন। ঔষধটী এই—

পূর্ণ-বয়স্কের জন্য—

১। উৎকৃষ্ট মকরধ্বজ ১ রতি উত্তম মধুসহ মাড়িয়া কাঁচা হলুদের রসসহ সেবনীয়। প্রাতে, বৈকালে এবং রাত্রি দশটা ঔষধের সেবনকাল।

ছোট ছেলেদের জন্য এবং বৃদ্ধাদির জন্যে রোগীর বলাবল বিচার করিয়া ঔষধের মাত্রা-ব্যবস্থা করণীয়।

২। ফণী মনসা গাছের ভিতরের শাঁস বাটিয়া অগ্নিতে গরমকরতঃ ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় গলার, কুচকীর, বগলের ও অন্যান্য ফোলা গ্রন্থির উপর প্রলেপ দিয়া ভালরূপে বাঁধিয়া দিবেন। দিবসে ২।৩ বার প্রলেপ ব্যবস্থা।

৩। পুরাতন গব্য ঘৃতসহ কর্পূর মিশাইয়া মস্তকে ও কপালে মালিস করিবেন।

৪। পিপাসায় বাইবিড়ঙ্গের সহ জল সিদ্ধ করিয়া উক্ত ঈষৎ উষ্ণ জল পান করিতে দিবেন।

কবিরাজ—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।
Specialist in Insanity
Malda. (Bengal)

পদ্মাগর্ভে রাজবাড়ীর ৩০০ বৎসরের মঠ লোপ।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর স্বনাম-ধন্য হিন্দু রাজা চাঁদ রায় ও কেদার রায় কর্তৃক তাঁহাদের মাতৃদেবীর চিতা-ভস্মের উপর বহু-কারুকার্য্য-খচিত এই মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনশত বৎসর যাবৎ এই মঠটী প্রকৃতির সঙ্গে বহু যুদ্ধ করিয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া সেই সাধ্বী সতী রমণীর মাতৃত্বের চিহ্ন-স্বরূপ সগর্ব্বে উন্নত-শিরে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু আজ তাহার সে গর্ব্ব চিরতরে কীর্ত্তিনাশার অতলসলিলে নিমজ্জিত হইল। বিক্রমপুরের শেষ প্রাচীন কীর্ত্তিং লোপ পাইল।

সন্দেশ-সম্পাদকের অকাল মৃত্যু। সুকুমার রায় বিগত ২৪শে ভাদ্র সোমবার বেলা ৮ ঘটিকার সময় পুত্র, ভ্রাতা, মাতা, সহধর্ম্মিণী, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকে অকুল শোক-সাগরে ভাসাইয়া চিরশান্তি-নিকেতনে চিরশান্তির আশায় গমন করিয়াছেন। তিনি হাস্যোদ্দীপক অথচ শিক্ষাপ্রদ, নীতিমূলক কবিতা করিতে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ তিনি প্রতিভাশালী সুলেখক। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। ভগবান তাঁহার আত্মার সদগতি বিধান করুন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সান্ত্বনা প্রদান করুন—ইহাই কামনা।

নিঃস্ব-হিতৈষিণী সভা ও অনাথ-আশ্রম। আগামী ২৯শে ভাদ্র শনিবার তারিখে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ১৮২নং বহুবাজারস্থ ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুল ভবনে সভার ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। কলিকাতায় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা সভার সাফল্য কামনা করি

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

৬০শ বর্ষ, ৩০শ খণ্ড
৭ম সংখ্যা।

কার্ত্তিক।

১৩৩০ সাল।
১৮৪৫ শকাব্দাঃ

অশোকের প্রতি সীতা।

লেখক—সম্পাদক।

হে অশোক! দিতে আজি শোকে শান্তি মম,
আসিয়াছ হেথা অকপট মিত্র সম।
কতই বাসিতে ভাল অযোধ্যা ভবনে,
ছিনু যবে পতি-গেহে—তোমার কাননে।
ভাল বাসিতেন মোরে পিতা দশরথ,
দেবর লক্ষ্মণ, প্রিয় শত্রুঘ্ন, ভরত।
মাণ্ডবী উর্ম্মিলা আর শ্রুতকীর্ত্তি মোরে,
সদাই রাখিত নিজ বুকের ভিতরে।
কন্যাসম পালিতেন যত শ্বশ্রূগণ—
করিত আদর কত পুরবাসী জন।
আর রসনায় নাহি আসে তাঁর নাম,
যাঁর চিন্তা মাত্র প্রাণে উপজে আরাম।

কেমনে বলিব সে প্রেমের গভীরতা,
অণুমাত্র ক্লেশে মম পাইতেন ব্যথা।
ছায়াসম মোরে নিত্য সহচরী করি,
রাখিতেন নিজ পাশে দিবস শর্ব্বরী।
কোথা আজি প্রাণারাম, কোথা মাতৃগণ?
দেবর, ভগিনী কোথা—অযোধ্যা-ভবন?
মাতৃসম সেবিত সে প্রাণের লক্ষ্মণ—
নাহি জানি আজ কত করিছে রোদন!
ঝরিছে নয়ন মম, নহে মম তরে,
স্মরিয়া তাঁদের দুঃখ হৃদয় বিদরে!
এসেছ সান্ত্বনা দিতে সকলের হয়ে,
তাঁহাদের পুঞ্জীভূত স্নেহরাশি লয়ে।
অশোক-মূরতি তুমি, তব অঙ্গে অঙ্গে—
আনন্দের শিহরণ, কুসুমের রঙ্গে!
হায় বিধি! একি দেখি! অশোক যে জন,
মম দুঃখে ঝরিতেছে তাহারো নয়ন!
অথবা আমার শোক এতই গভীর—
যাহে অশোকেরো নেত্রে আনে অশ্রুনীর!!

স্বপ্ন।

লেখক—সম্পাদক।

স্বপ্ন শব্দে নিদ্রাও বুঝায়, এবং নিদ্রাকালে আমাদের মনে যে চিন্তার উদয় হয়, তাহাও বুঝায়। জাগ্রত অবস্থায় আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করি, সে আমাদিগের মন দ্বারাই লাভ করি। অন্যমনস্ক হইলে, কোন বিষয় আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন যে কোন এক বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত থাকিলে, চক্ষু, কর্ণ বা নাসিকা যাহা দেখে শুনে বা আঘ্রাণ করে, তাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। ত্বক্ ও জিহ্বার সম্বন্ধেও

ঐরূপ হয়। নিবিষ্টচিত্তে কোন শারীরিক অনিষ্ট সম্ভাবনার কার্য্য সম্পাদন সময়ে, সামান্য শারীরিক অনিষ্ট সংঘটিত হইলে, তাহার জ্ঞান জন্মে না। অন্যমনস্ক হইয়া আহার করিলেও, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন হয় না। কোন এক বিষয়ে নিবিষ্ট-চিত্ততার তারতম্যানুসারে আমাদের বিষয়ান্তরের জ্ঞানের তারতম্য হইয়া থাকে।

মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান আমরা—কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্যে নিযুক্ত করি। চক্ষুর দ্বারা কোন আহার্য্য বস্তু দেখিলাম, পদ ও হস্তের ব্যবহারে উহা সংগ্রহ করিলাম, পরে মুখ দ্বারা উহা আহার করিলাম। আহারের সময় রসনা দ্বারা উহার স্বাদ করিলাম—নাসিকা দ্বারা উহার সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ অনুভব করিলাম। তাবৎ ক্রিয়াই এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

জাগ্রতাবস্থায় মনের স্বাধীনতা নাই। আমি মনে করিলাম আমি এই সময় নিদ্রা যাইব না, নিদ্রা আসিল না। এই আমি লিখিতেছি, আমি লিখিব মনে করিয়াছি বলিয়া আমার মন আমার হস্তের দ্বারা লিখিতেছে। মনে করিলাম, লিখিব না, অমনি হস্ত লেখনী ত্যাগ করিল। মনকে যে সংযত করে. তাহাকে আমরা আত্মা বলি, এই আত্মাই আমি, এই আত্মা সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা। মনকে আত্মার প্রধান মন্ত্রী বলিলে বলা যায়। রাজা যে কোন কার্য্য করেন, মনের দ্বারাই করান। কিন্তু মন মন্ত্রী অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বড় অনুগত। তাহারা মনকে অনেক সময় কুপথে লইতে চেষ্টা করে। চক্ষু একটী সুন্দর বস্তু দেখিল, দেখিয়া মনকে উহার সংবাদ দিল। উহা পরস্ব, উহা তৎস্বামীর অনুমতি ব্যতীত আমার লইবার অধিকার নাই; কিন্তু মন অসংযত হইলে অমনি লোভ বশতঃ উহা অপহরণ করিতে অভিলাষ করিল। এই সময় মনকে সংযত করা প্রয়োজন হয়। অনেক সময় মন এতই দুর্নিগ্রহ হয়, যে উহাকে সংযত করা কঠিন। পুনঃ পুনঃ শাসন দ্বারা উহাকে আজ্ঞাধীন করিতে হয়। না করিতে পারিলে, মহা অনিষ্ট সংঘটিত হয়।

জাগ্রত অবস্থায় মনকে সম্যক্ বা আংশিক ভাবে সংযত করা যায়, কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় মনের অবাধ ক্ষমতা। তখন মন আপন মনে কার্য্য করিতে থাকেন। জাগ্রত অবস্থাতেও অনেক সময় আমরা স্বপ্ন দেখি। মনের শাসক হাল ছাড়িয়া দিয়া বসেন। কিন্তু মনকে যদি ক্রমশঃ সংযত করা যায়, তাহা হইলে নিদ্রিত অবস্থাতেও সে পূর্ব্বাভ্যাস ও সংযম বশতঃ বিশেষ কোন অনিষ্টকর কার্য্য করিতে পারে না।

হয় ত কোন বালক স্বপ্নে বৃক্ষ আরোহণ করিয়া পাখীর ছানা পাড়িতেছে। এই স্বপ্নের কারণ দুই প্রকার হইতে পারে। হয় সে নিজে জাগ্রত অবস্থায় পাখীর ছানা পাড়িয়া থাকে, এবং তাহাতে তাহার মনের তন্ময়ত্ব হইয়া গিয়াছে, অথবা অন্য বালককে সে পাখীর ছানা পাড়িতে দেখিয়া, তৎবিষয়ে তাহার বিশেষ আসক্তি জন্মিয়াছে। যেই সে নিদ্রিত হইল, তাহার মন তখন পাখীর ছানা লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে গাছে চড়িল হঠাৎ পড়িয়া গেল— এ সব স্বপ্নের খেলা। সে গাছে চড়ে নাই, পাখীও নাই, গাছও নাই, যথার্থ পড়িয়াও যায় নাই, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় পড়িয়া যাইবার প্রাক্‌কালের যেরূপ এবং পড়িয়া গেলে, হৃৎপিণ্ড যেরূপ কম্পিত হয় তাহার তাহা সবই হইল। শারীরিক ক্রিয়া সব হইল। বৃক্ষ হইতে পড়িলে বা পড়িবার সময় তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলেও অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার হৃৎকম্প হইতে থাকিল। এও হইতে পারে, এবং অনেক সময় প্রকৃত হইয়াছে যে বালক নিদ্রিতাবস্থাতেই গাছে চড়িয়া পাখীর ছানা পাড়িয়া উহা পিঞ্জরে রাখিয়া নিজ শয্যায় পুনর্ব্বার আসিয়া শুইয়াছে—অথচ পরদিন তাহার সে বিষয়ে কোন জ্ঞানই নাই। যা কিছু করিয়াছে স্বপ্নের ঘোরে করিয়াছে এবং পরে সেই স্বপ্ন ভুলিয়া গিয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্তও আছে যে কোন কোন গণিতজ্ঞ নিদ্রাবশে—জাগ্রত অবস্থায় যে কঠিন অঙ্কের সমাধন করিতে পারেন নাই, স্বপ্নে তাহার সমাধান করিয়া কাগজে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, অথচ সে বিষয়ে তাহার জ্ঞান নাই। লেখক যখন ১৮৮৩ সালে আরা গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তখন তাহার গৃহে তাহার একটী বন্ধু বাস করিতেন। ঐ বন্ধু স্থানীয় কোন গভর্ণমেণ্ট আফিসে চাকরি করিতেন। একদিন প্রত্যূষে তিনি আমাকে একটি লিখিত ইংরাজী বক্তৃতা শুনাইলেন, বলিলেন দেখুন দেখি আপনি ইহা কখনও শুনিয়াছেন কি না। আমি বলিলাম যে ঐ বক্তৃতার ভাব ও ভাষার সহিত আমার ভাব ও ভাষার এত সাদৃশ্য দেখিতেছি যে উহা আমার বক্তৃতা বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু আমি ত এইরূপ বক্তৃতা কখনও দেই নাই, কিম্বা উহার পাণ্ডু-লিপিও প্রস্তুত করি নাই, কিন্তু আমার ঈষৎ ভাবে মনে হয় যেন কাল স্বপ্নে আমি কি বলিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন যে আমি নিদ্রিতা-বস্থায় সজোরে কথা বলিতে লাগিলাম, তখন তিনি জাগ্রত ছিলেন। কথাগুলি অসম্বদ্ধ নহে দেখিয়া তিনি কাগজ কলম লইয়া—যাহা বলিতে লাগিলাম, তাহাই লিখিয়া লইয়াছেন, এবং তিনি আমার সেই বক্তৃতা পড়িয়া আমাকে

শুনাইলেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের বা বন্ধু বান্ধবের জীবনে এরূপ অনেক ঘটনা দেখিয়া থাকিবেন, অনেককেই স্বপ্নে কথা বলিতে শুনা যায়। বোবায় ধরা ব্যাপারটা অনেকেরই পরিজ্ঞাত। স্বপ্নে কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ভয়েতে শব্দ বাহির হইতেছে না, কেবল গো গো শব্দ করিতেছে। স্বপ্নে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আমাদের সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়েরই ক্রিয়া হইয়া থাকে। অনেকে স্বপ্নাবস্থায় আহার করেন, এবং মল মূত্রাদি ত্যাগ করেন। ইহার বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তি জাগ্রত হইবা মাত্র যদি তাহার স্বপ্ন সমুদয় লিপি বদ্ধ করে, তাহা হইলে তাহার জীবনের গতি উর্দ্ধ দিকে বা অধোদিকে হইতেছে, সে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তির স্বপ্ন পরদ্রব্যাপহরণ বা পরদারাভিমর্ষণ বা প্রাণিহত্যাদিমুখী হয় তাহা হইলে তাহার মনের অবস্থা যে সমল, তাহা অনুমান করা অন্যায় হইবে না। স্বপ্ন আত্ম-পরীক্ষার একটি উপায়। এতৎ সম্বন্ধে ১৯০০ সালে আমি মৎসম্পাদিত ব্রহ্মচারী নামক ইংরাজী পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

Dream and Self-Examination.

WE ARE all dreamers, more or less. Dreams are no doubt unrealities, but they are not so to the dreamer. To him, dreams are more real than realities themselves. They take a firmer hold of the dreamer than even his waking experience. So long as one dreams, his surroundings are more real, more impressive, than those which he percieves, when awake. Supernaturalists, psychologists and physiologists have all approached the subject from their respective points of view. The savage regards dreaming as no less real an objective experience than waking, To him the vision of a dead ancestor is nothing but the vision of his duplicate. If he fights in a dream, it is second self that fights. The dream-world to him is but a duplicate of the waking world, and a reality. Even people advanced in civilisation have not been able to completely discard the theory of the reality of dreams. In higher stages of religious thought, it is conceived something like a divine revelation. It is a message from supernatural agencies, direct or indirect. Modern scientists have explained dreams as purely natural events, According to them, dream is deducible from three causes;—(1) impressions and ideas lately received, (2) present state of the body, (3) association; and its exciting causes are central and peripheral stimulation.

Sometimes there may be no external stimulation, and there may be only subjective sensations, which are due to certain actions on the peripheral as well as central regions of the nerves. They may be also due to the conditions of muscles during sleep. Our cerebral excitations, direct or indirect, give rise to many dreams, and they do not arise through bodily stimulations. Such are the various theories of dream. Whatever the worth of these theories be dream is a mental phenomenon, the importance of which can not be over-estimated. In dreams, there is almost, if not total, suspension of the will. We are no longer our masters when we are dreaming. We are then playthings of our fancies. Even if the will is not wholly dormant in sleep, it at least loses its hold upon our faculties. In waking consciousness, the central force, the *ego* spontaniety, is supreme ; while in sleep the activity of the *ego* becomes purely receptive. It ought to be noted here, that many modern philosophers and almost all modern physiologists agree with our ancient writers that dreaming is only an occasional incident of sleep, and that we may enjoy dream-less or sound sleep called *sushupti* in Sanskrit Thus we have three states of conciousness,—waking, sleeping but dreaming, and sleeping but not dreaming. Just as a man of a strong will is master of himself when awake, so he is also partially a master of himself when dreaming. It is also the man of strong will that can enjoy *sushupti* or sound sleep. Where the will is weak, the thought loses its categories and we see incoherent dreams. Imagination, no longer under the control of the ego, roves in an unrestrained manner A man is best seen in his waking state when he is off his guard. We can see him through and through. We can similarly see the real man, the real movement of his life, when he is dreaming. We centralise, as it were, in our brain the result of all our actions. Dreams decentralise them, and show to us in clear light what we really are. A man is more or less what he dreams, whether awake or asleep We have no means of knowing other people's dreams and so it affords us no help in studying the lives of other men. It is however an invaluable agency in studying ourselves. We are seldom off our guard even to ourselves when awake ; but while dreaming, our stored *karma* has its full and uninterrupted play. Let us then from day to day note down our dream-visions and see what course our thought-currents are taking. If they appear to take us away from our ideals, then let us closely search every nook and corner of our mind, and root out the weeds which hamper the growth of the tree of life. It is

often a make-believe with us that we are at harmony with Universal Harmony, while in reality we are at discord with it. Dreams like Rontgen rays, penetrate into our inner selves, and expose to our view our real nature. So to whatever cause a dream may be due, it is an invaluable scientific instrument for the examination of our own selves, and when we see how weak and sinful we ourselves are, we cease to be impatient of the transgressions of our brothers. *Om Santi, Om Santi, Om Santi.*

পরের স্বপ্ন আমাদের জানিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু নিজের স্বপ্ন আমরা অনেক সময় ধরিতে পারি। আমার স্বপ্ন ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, আমি স্বপ্ন দেখিব কি না দেখিব—ইহা আংশিকভাবে এবং পূর্ণ সংযত ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণভাবে আমাদের আয়ত্ত।

স্বপ্নের কারণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সুষুপ্তি সময় স্বপ্ন দর্শন হয় না। স্বপ্ন সব সময় অলীক হয় না। অনেকেই জানেন যে অনেক আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে মৃত্যু সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই স্বপ্নে উহা দেখা গিয়া থাকে। ভবিষ্যৎ অনেক ঘটনাও স্বপ্নে দেখা যায়। আমি এরূপ ব্যাপার নিজের ও পরের সম্বন্ধে অনেক দেখিয়াছি এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তিও দেখিয়াছেন। স্বপ্নজ্ঞ ব্যক্তিরা নানাবিধ স্বপ্নের নানাবিধ ফল ব্যক্ত করেন, তাহা কোন সময় ফলে, কোন সময় ফলেও না। মনে করুন একজন স্বপ্নে দেখিল তাহার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে। জানা গেল যে স্বপ্ন দেখিবার সময় সে ব্যক্তি জীবিত, কিন্তু ইহাও হইল যে ঐ স্বপ্ন দেখিবার সপ্তাহ পরেই যথার্থই তাহার মৃত্যু হইল। আবার অনেক সময় কাহারও পিতার মৃত্যু হইল, তিনি অতি দূর দেশে থাকিয়াও সেই রাত্রিতেই উহা স্বপ্নে দেখিলেন। পরে পত্রের দ্বারা অবগত হইলেন যে স্বপ্ন যে রাত্রিতে দেখিয়াছেন, তাহার অল্প পূর্ব্বেই পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছে। ইহা কার্য্য কারণ সম্বন্ধ অর্থাৎ মৃত্যু হইয়াছে, এবং তজ্জন্য স্বপ্ন দর্শন, না মৃত্যুও হইয়াছে, স্বপ্নও দেখিলাম—কাকতালীয় মাত্র। যদি স্বীকার করিয়া লয়েন যে আত্মার গতি অবাধ, তাহা হইলে স্থূলদেহ-বিহীন আত্মার দ্বারা ঐ ঘটনা দৃষ্ট হইবার কোন বাধা নাই, এবং তাহা নিদ্রিত অবস্থায় মনের গম্য হওয়ায় উহা স্বপ্ন মধ্যে পরিগণিত। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিদিগের জাগ্রত অবস্থাতেও দূর প্রদেশের কোন কোন ঘটনা দেখার বৃত্তান্ত বিরল নহে। আমাদের শাস্ত্রে ইহার বহু দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এ সমস্ত অনুভূতিগম্য, ইহার মীমাংসা তর্কের দ্বারা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ

নিদ্রাবস্থায় সত্য ঘটনা অবগত হওয়াকে ঠিক স্বপ্ন বলা যায় না; উহা আত্মা দ্বারা বস্তুতঃ কিছু দেখা; জাগ্রত অবস্থাতেও উহা হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। আমরা স্বপ্ন বলিতে যাহা বুঝি উহা মনে যে সমস্ত ভাব আমরা পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিয়াছি; তাহাদের লইয়া মনের খেলা; কিম্বা শরীরের অবস্থা হেতু আমাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়া; কিম্বা মানসিক চিন্তার সাহচর্য্য ও পারম্পর্য্য লইয়া মনের ক্রিয়া।

কিন্তু অনেক সময় আমরা যে সত্য ঘটনা দেখিতে পারি; উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞান এবং উহা নিদ্রাবস্থায় যেরূপ হইতে পারে জাগ্রত অবস্থায়ও সেইরূপ হইতে পারে। অমুক স্থানে অমুকের মৃত্যু হইলে, তৎক্ষণাৎ মানসিক তারের দ্বারা ঐ সংবাদ আমি পাইতে পারি; চাই আমি নিদ্রিত থাকি চাই আমি জাগ্রত থাকি।

স্বপ্ন যতই অলীক হউক না কেন, উহার ফলাফল কিন্তু অলীক নহে এবং স্বপ্ন দ্বারাই আমরা আমাদিগকে ভাল করিয়া চিনিতে পারি। এক হিসাবে এই সমস্ত বিশ্বই স্বপ্ন। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি; ততক্ষণ স্বপ্ন অলীক নহে, কিন্তু নিদ্রা ভাঙ্গিলেই স্বপ্ন অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আমাদের বর্ত্তমান জাগ্রত অবস্থার যে কেবল মাত্র ব্যবহারিক সত্তা আছে, উহার তত্বতঃ যে কোন অস্তিত্ব নাই, তাহা তত্বজ্ঞান দ্বারা জাগরিত না হইলে বুঝিবার সাধ্য নাই। যখন তত্বজ্ঞান হয় তখন এই জগৎ স্বপ্নের ন্যায় অলীক জ্ঞান হয়, এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু যেমন স্বপ্ন স্বপ্ন-কালে সত্য, এবং তাহার উপকারিতা ও ভাল মন্দ আছে, তদ্রূপ যত-দিন ব্যবহারিক জগৎ থাকিবে, ততদিন তাহার সম্বন্ধ ও ভাল মন্দ থাকিবে।

পথিকের প্রতি।

লেখক—সম্পাদক।

পথিক-প্রবর! কোথা হতে এলে?
কোথা যাবে পরে,—কেনবা আসিলে?
যদি নাহি জান, চিত্তে কি কখন
জন্মে অভিলাষ, জানিতে সে সব?

সুখ-দুঃখ-স্রোত বহে অনিবার
সর্ব্বদা সচল জীবন তোমার!
কভু কি বাসনা হয় তব মনে
অচল পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'তে?
ধন, যশ, মান, সৌন্দর্য্য, যৌবন
কভু কি পেরেছে তোমা শান্তি দিতে?
যদি নাহি পারে;—কভু কি হয়েছে
সংসারে বিরাগ মনেতে তোমার?
যদি হয়ে থাকে, তবে কার প্রতি
তব অনুরাগ, বল দেখি মোরে!
তিনি কেবা হন, কিবা তাঁর গুণ,
কিবা রূপ তাঁর—জান কিহে তুমি?
যদি নাহি জান, কভু কি করেছ
সন্ধান তাহার? যদি ক'রে থাক,
বল তবে মোরে, কি পেয়েছ তুমি?
যদি পেয়ে থাক, দেখাতে কি পার
তোমার সে ধন? যে ধনের লাগি
হয়েছ বৈরাগী, পথিক-প্রবর!

সমাধি।

লেখক—শ্রীরাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

সমাধির প্রকারভেদ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সমাধিটী একটি চিত্তধর্ম্ম। চিত্তের এই ধর্ম্মটী প্রসুপ্ত ভাবে থাকে, প্রযত্ন দ্বারা ইহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হয়। ইহাই যোগশাস্ত্রের মর্ম্ম। প্রযত্নের ফলে সমাধি লাভ হইলে তাহা ক্রমে পরিপক্ক হইয়া অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, বা নির্বীজ

সমাধিতে (নির্ব্বিকল্প সমাধিও বলা হয়) পরিণত হয়, এবং তৎপরেই মুক্তি হয়। এই মুক্তি লাভের উপায় নির্দ্দেশ করাই যোগ-শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সমাধি-প্রজ্ঞা ও তজ্জ সংস্কারসহ চিত্ত যখন স্বকারণ প্রকৃতিতে প্রতি-লোম ক্রমে লীন হইয়া যায়, আর স্বাধিকারে প্রবৃত্ত না হয়, অর্থাৎ একে-বারে নষ্ট হইয়া যায়, তখন পুরুষ স্বরূপে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হন, ইহাই মুক্তি, সর্ব্ব দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা পরমানন্দ সমাপত্তি। চিত্তনাশই মোক্ষ,— পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। সমাধি যে চিত্তেরই ধর্ম্ম, তাহাতে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। যোগ-মীমাংসকগণই ইহা বলিয়া গিয়াছেন। নিরোধটীও একটী চিত্তধর্ম্ম।

"যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্ব্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্ম্মঃ ॥"

ব্যাসভাষ্য, পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ ১ সূত্র।

অর্থঃ। যোগ শব্দের অর্থ সমাধি। ইহা চিত্তের একটী সর্ব্বভৌম ধর্ম্ম। চিত্তস্য দ্বয়ে ধর্ম্মাঃ পরিদৃষ্টাশ্চাপরিদৃষ্টাশ্চ, তত্র প্রত্যয়াত্মকাঃ পরিদৃষ্টাঃ, বস্তুমাত্রাত্মকা অপরিদৃষ্টাঃ, তেচ সপ্তৈব ভবন্তি অনুমানেন প্রাপিত বস্তু-মাত্র সদ্ভাবাঃ,

নিরোধ ধর্ম্মসংস্কারা পরিণামোঽথ জীবনম্।
চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্ম্মাদর্শনবর্জ্জিতা ॥

ব্যাসভাষ্য, পাঃ দঃ বিভূতিপাদ, ১৫ সূ।

ভাবার্থঃ—নিরোধ চিত্তের একটী অপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম।

প্রশ্ন হইতে পারে চিত্তেরই ধর্ম্ম, অথচ তাহা স্বাভাবিকক্রমে জাগরিত বা পরিস্ফুট হয় না কেন? তাহার জন্য এত আয়াস বা প্রযত্ন করিতে হয় কেন? ইহা সর্ব্বদাই প্রসুপ্ত (dormant বা latent) কেন?

এইরূপ অনুযোগ যুক্তিযুক্ত নহে। অনুশীলন ব্যতীত কোনও বৃত্তিই ত তীক্ষ্ণ বা শাণিত হয় না। এই যে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক জগদীশ, অনুশীলন ব্যতীত তাহারও কি প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে? সুতরাং এইরূপ অনুযোগের অবসর দৃষ্ট হয় না। যে সমাধি-ধর্ম্ম চিত্তে বিকশিত হইলে, জগদাপ্যায়িত, চিত্ত পরম পরিতৃপ্ত, দুঃখরাশি সমূলে বিনষ্ট, জীব পরমানন্দ ধারায় চিরতরে আপ্লুত হইয়া যায়, সেই পরমা শান্তিধারা প্রাপ্ত হইতে কোনও যত্নের প্রয়োজন হইবে না, কোনরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না, ইহা অলস তামসিক জনের মনোরথ মাত্র। প্রশ্নটী একেবারেই বিচারসহ নহে।

যোগ শব্দটীর পারিভাষিক বিভিন্ন অর্থও সোঽহংগীতোক্ত প্রথম কবিতায় ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যদি ব্যাপক, সর্ব্বগ্রাসী, সুন্দর কোন সংজ্ঞা দিতে হয়, তবে মহর্ষি দ্বৈপায়ন-কৃত ভগবদ্গীতায় বর্ণিত, শ্রীকৃষ্ণ মুখবিনিঃসৃত সংজ্ঞাটীর উল্লেখ করিলেই হয়—

"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।"

ভগবদ্গীতা, ২য় অঃ, ৫০ শ্লোক।

যে কোন কর্ম্ম-নিষ্পত্তির কৌশলকেই যোগ শব্দে আখ্যাত করা যাইতে পারে। তখন "পুম্প্রকৃত্যো র্বিয়োগোঽপি যোগসংজ্ঞিতম্" বলিতে, 'বিয়োগে' যোগবুদ্ধির বিস্ময় অপসারিত হইবে।

ফলতঃ পুরুষকে প্রকৃতির কার্য্য চিত্তবন্ধন হইতে বিযুক্ত বা মুক্ত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় বা কৌশলের নাম যোগ বা সমাধি। পরিদৃষ্ট প্রত্যয়াত্মক বৃত্তি নামক চিত্তধর্ম্মের নিরোধ দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া, তাহা মুখ্যতঃ যোগশাস্ত্র-কথিত উপায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া, যোগশব্দে অভিহিত। আর বিশুদ্ধ ঔপনিষদাত্মতত্ত্ব-শ্রবণাদি দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম বা চিৎস্বরূপে উৎপন্ন চিত্তের বৃত্তি ব্যাপ্যতারূপ জ্ঞান ধারার দিকে লক্ষ্য করিয়া (বেদান্ত মতে "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়") সেই পথ বা উপায় বা কৌশলকে জ্ঞান-পথ, বা জ্ঞানযোগ বা শুধু জ্ঞান নামে (ভগবদ্গীতোক্ত সাংখ্য নামে) আখ্যাত করা হয়। যোগ-পথাবলম্বিগণ যাহাই বলুন, তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক প্রামাণিক পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত কিন্তু বেদান্তের বিশুদ্ধ জ্ঞান পথেরই পরিপোষক।

পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদোক্ত ৫৫ সূত্র, ও তাহার ভাষ্যটী আলোচনা করিলেই এতৎ সম্বন্ধে সংশয়-নিরাশ হইবে।

"সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি"

পাঃ, বিভূতিপাদ, ৫৫ সূত্র॥

"যদা নির্ধূতরজস্তমোমলং বুদ্ধিসত্ত্বং পুরুষস্যান্যতা প্রত্যয়মাত্রাধিকারং দগ্ধ-ক্লেশবীজং ভবতি তদা পুরুষস্য শুদ্ধিসারূপ্যমিবাপন্নং ভবতি, তদা পুরুষস্য উপচরিত ভোগাভাবঃ শুদ্ধিঃ, এতস্যামবস্থায়াং কৈবল্যং ভবতীশ্বরস্যানীশ্বরস্য বা বিবেকজজ্ঞানভাগিন ইতরস্য বা, নহি দগ্ধক্লেশবীজস্য জ্ঞানে পুনরপেক্ষা কাচিদস্তি, সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণৈতৎ সমাধিজমৈশ্বর্য্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চোপক্রান্তম্, পরমার্থতস্তু জ্ঞানাদর্শনং নিবর্ত্ততে, তস্মিন্নিবৃত্তে ন সন্ত্যুত্তরে ক্লেশাঃ, ক্লেশাভাবাৎ কর্ম্ম-বিপাকাভাবঃ চরিতাধিকারাশ্চৈতস্যামবস্থায়াং গুণা ন পুরুষস্য পুনর্দৃশ্যত্বেনোপতিষ্ঠন্তে, তৎপুরুষস্য কৈবল্যং, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্র জ্যোতিরমলঃ কেবলীভবতি॥"

ভাবার্থ—চিত্ত যখন শুদ্ধ বা নির্ম্মল হয়, তখন অবিদ্যা দগ্ধ হইয়া যায়। সমাধি হইতে উৎপন্ন অণিমাদি ঐশ্বর্য্য ও বিবেকজ তারকজ্ঞানের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে উহারা চিত্তশুদ্ধি জন্মাইয়া দিতে সক্ষম। তবে অণিমাদি সিদ্ধি হউক বা না হউক, বিবেকজ তারক জ্ঞানলাভ হউক বা না হউক, অবিদ্যা-নাশ হইলেই কৃতকৃত্যতা হয়। অবিদ্যা নাশ হইলেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অন্য কিছুরই তখন অপেক্ষা থাকে না। জ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য্য।

ইহা হইতে কি সেই উপনিষদ্বাণীর প্রতিধ্বনি শ্রুত হয় না? "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।"—আত্মস্বরূপ জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র কারণ, মুক্তিলাভের অন্য পথ নাই।

এখানে আর এক সমস্যা উপস্থিত। সর্ব্বোপনিষৎসার ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

ভগবদ্গীতা ৫ম অঃ, ৫ শ্লোক।

ভাবার্থঃ—জ্ঞাননিষ্ঠগণ যে মোক্ষপ্রাপ্ত হন, যোগিগণও সেই মোক্ষই প্রাপ্ত হন। তবে "নান্যঃ পন্থাঃ" বলা যায় কিরূপে? ইহার সমাধান শ্রীমৎ শঙ্কর ভাষ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন—

" × × × যৎ সাংখ্যৈঃ জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং, তৎ যোগৈরপি জ্ঞান-প্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন ঈশ্বরে সমর্প্য কর্ম্মাণি আত্মনঃ ফলমনভিসন্ধায় অনুতিষ্ঠন্তি যে তে যোগিনঃ, তৈরপি পরমার্থজ্ঞান-সংন্যাস-প্রাপ্তিদ্বারেণ গম্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ × × × × "

ঐ, ঐ, ভাষ্য।

ফলিতার্থ এই, যোগানুষ্ঠান জ্ঞানলাভের উপায়, এবং জ্ঞান হইলেই মোক্ষ অবধারিত।

পাতঞ্জলপ্রোক্ত যোগানুষ্ঠান পরিনিষ্পন্ন হইলে ফল স্বরূপে পরিণামে "অণিমাদি ঐশ্বর্য্য" ও "বিবেকজ তারক জ্ঞান" উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা চিত্তসত্ত্ব নির্ম্মল হইলেই হওয়ার সম্ভব। কিন্তু তখনও চিত্ত একেবারে রাজোমল-বিরহিত হয় নাই। চিত্তসত্ত্ব হইতে পুরুষ একেবারে স্বতন্ত্র এই জ্ঞান চিত্তে আহিত না হইলে প্রকৃষ্ট সত্ত্বোদ্রেকের সম্ভাবনা নাই। ইহাকেই যোগশাস্ত্রে বিবেকখ্যাতি নামে অভিহিত করা হয়। এই বিবেক খ্যাতির প্রশান্তবাহিতা

সুস্থিতা হইলেই ধর্ম্মমেঘাখ্য সমাধি হইয়া থাকে ; এবং ইহাকেই যোগিগণ পর-প্রসংখ্যান বলিয়া থাকেন। এইটীই আবার প্রকারান্তরে দেখিতে গেলে, বেদান্তের জ্ঞানপথ। এই পথই যোগের চরম উদ্দেশ্য। এই পথে আরোহণ করিতে না পারিলে, প্রকৃত অসম্প্রজ্ঞাত (নির্বীজ, বা নির্ব্বিকল্প) সমাধি লাভের আশা সুদূর-পরাহত। এই পথে আরোহণ করিবার উপায় বেদান্তবোধিত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। তাহাই সুরপরম্পরায় পাতঞ্জলে উক্ত হইয়াছে—

"শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বকঃ ইতরেষাম্।"

পাতঃ, সমাধিপাদ, ২০ সূত্র।

অর্থাৎ এই উপায়ে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নিষ্পন্ন হয়। ইহা জ্ঞান পথেরই নামান্তর মাত্র। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি মাত্রেই সালম্বন সমাধি। কিন্তু সালম্বন সমাধি নির্বীজ সমাধি উৎপন্ন করিতে পারে না। সালম্বন-সমাধি-সিদ্ধ চিত্তে নব নব সংস্কার আহিত হয় ; যোগীর নানাবিধ সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। কিন্তু সেই সমস্ত নিরুদ্ধ করিতে হইবে, নতুবা সেই মুক্তিপ্রদ নির্বীজ সমাধি উৎপন্ন হইবার আশা নাই। আবার নির্বীজ সমাধিও দুই প্রকার। "ভবপ্রত্যয়"-নামক অসম্প্রজ্ঞাত যোগ মুক্তি প্রদান করিতে সক্ষম নহে।

মুক্তি পরম বিঘ্নবহুল। যোগশাস্ত্র সেই মুক্তি-পথ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, এক হিসাবে বিঘ্নরাশির বাহুল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য—এই দুইটীই যোগ লাভের প্রধান উপায়। "অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।" পরে আমরা এ বিষয়ে আরো বিস্তার করিব। যোগ-পথের নিম্নস্তরে যে সমস্ত বিভূতি বা সিদ্ধির সন্ধান বলা হইয়াছে ; তাহা লাভ করিতে ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক। সামান্য সুখ লাভের জন্য জীব যেরূপ লালায়িত, এই সিদ্ধি-লাভ স্থিরতর, এইরূপ জ্ঞান হওয়া মাত্র যোগী তদুদ্দেশ্যে উধাও হইয়া ছুটিবে, তাহার সংশয় নাই। সুতরাং প্রথম হইতেই বাসনাবল্লরীর মূলে জলসেক আরব্ধ হইল। তারপর সিদ্ধি লব্ধ হইলে তাহার পরিত্যাগ কত কষ্টকর হইবে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। জীব সামান্য ধন জনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতেই প্রায়শঃ অক্ষম, তারপর দুর্লভ যোগ-বৈভব লাভ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বহু আয়াসের প্রয়োজন নাই। অথচ তাহা পরিত্যক্ত না হইলেও, তাহাতে বৈরাগ্যোদয় না হইলেও, উচ্চতর অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অধিকারী হওয়া যাইবে না। সুতরাং মুক্তির জন্য যোগ-পথ যে জটিল, তাহা আর বিস্তৃতরূপে

বলিবার প্রয়োজন নাই। অলস, তামস জনেরা অলৌকিক যোগ-সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া চিরাভ্যস্ত আলস্য পরিত্যাগ করিয়া রজোগুণের উৎকর্ষ সাধন করিবে, এবং কিয়ৎপরিমাণে কৃতকৃত্য হইবে, ইহাই কি যোগ-বিভূতি-প্রদর্শনের উদ্দেশ্য? সুধীগণ প্রণিধান করিয়া দেখিবেন। নতুবা মুক্তি-পথে এই বিভূতির কি প্রয়োজন? পাতঞ্জল দর্শনেও ইহা ভঙ্গীক্রমে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ"

পাতঃ, বিভূতিপাদ, ৩৭ সূত্র।

সমাধি কালে প্রাতিভ প্রভৃতি সিদ্ধি উৎপন্ন হইলে তাহা উপসর্গ, কিন্তু ব্যুত্থান কালে উহারা সিদ্ধি নামে আখ্যাত।

মুক্তি-পথে এই যোগৈশ্বর্য্য কত তুচ্ছ, তাহা ঋষিপ্রবর ভগবৎপাদ শ্রীমৎ সোঽহং স্বামী স্বপ্রণীত সোঽহং গীতায় শিব-মুখে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন—

অষ্টসিদ্ধিরূপ মাদক-সেবনে
মত্ত অজ্ঞ যোগী যত।
আত্মানন্দামৃত- পানেতে বিভোর
থাকি আমি অবিরত॥

সোঽহং গীতা, ২য় সংস্করণ, শিব, ৩৫৫ পৃঃ।

অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য মাদক-নেশা; অজ্ঞ যোগীরাই ইহার জন্য, এই নেশার জন্য লালায়িত। তাহারা আত্মানন্দের আস্বাদ লাভে প্রকৃতই বঞ্চিত।

যে পরম-ধনের নিকট অষ্টৈশ্বর্য্যও 'নেশাখুরি' বলিয়া প্রতিভাত হয়; সেই পরমচিন্তামণিধন যাঁহার করায়ত্ত, যিনি সেই পরমা শান্তি ও তৃপ্তির রসাস্বাদ করিতে সক্ষম, তিনি কত মহতো মহীয়ান্, কত উচ্চস্তরে বর্ত্তমান, পাঠক, তাহা একবার অনুমান করুন। সেই আত্মদর্শী ঋষি ত দূরের কথা, সেই পথের পথিকগণও নমস্য।

(ক্রমশঃ)

জন্মাষ্টমী।

লেখক—সম্পাদক।

বাজিছে ঘণ্টা, বাজিছে শঙ্খ
মন্দিরে মন্দিরে,
বাজিছে তুরী, বাজিছে ভেরী
প্রাসাদে কুটীরে,
উঠিছে ধ্বজা, চিত্র পতাকা
তোরণে তোরণে,
শোভিছে পুষ্প, শোভিছে পত্র
অঙ্গনে অঙ্গনে,
শোভিছে ঘট, আম্র-পল্লবে
গৃহ দ্বারে দ্বারে,
কদলী বৃক্ষ মাল্য-শোভিত
শোভে ধারে ধারে,
হতেছে গীত, হতেছে নৃত্য
পল্লীতে নগরে,
বাজিছে বীণা, মৃদঙ্গ বাজে
সুগম্ভীর স্বরে,
হতেছে হোম, উঠিছে ধূম
সুনীল অম্বরে;
পুষ্প চন্দন তুলসী রাজে
আম্র পত্রোপরি।
শোভিছে দীপ, জ্বলিছে ধূপ
সুগন্ধ বিতরি।

কাহার চরণে দিতে উপহার
সংগ্রহ হতেছে এসব সম্ভার?
প্রসন্ন আকাশ, প্রসন্ন অনিল,
প্রসন্ন অনল, প্রসন্ন সলিল,

প্রসন্ন মানব, যাঁহার জনমে ;
ভুঞ্জ তাঁর রস, মরমে মরমে।
রসঃ বৈ সঃ, তিনি আনন্দ-স্বরূপ
ভাগ্যবান ভুঞ্জে তাঁর সেই রূপ।

ভব-কারাগার হ'তে জীবে করিতে মোচন,
কারাগারে লইলেন তিনি আপন জনম।

বঙ্গদেশের—বিশেষতঃ যশোহর প্রভৃতি জেলার নদী।

লেখক—সম্পাদক।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—যে দেশে ধনী, শ্রোত্রিয়, রাজা, নদী ও চিকিৎসক নাই, সে দেশ বাসের অনুপযুক্ত। "ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ। এতে যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ।"

নদীর উপকারিতা বুঝাইবার জন্য বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। নিরুক্তে অর্থাৎ বৈদিক অভিধানে নদীর ৩৭টী নাম পাওয়া যায় যথা—অবনি, যব্হী, (কেষুচিৎ কোষেষু 'যব্যা') খা, সীরা, স্রোত্যা, এনী, ধূনী, রুজানা, বক্ষণা, স্বাদোহর্ণা, রোধচক্রা, হরিৎ, সরিৎ, অগ্রুব্, নভন্ব, বধ্ব, হিরণ্যবর্ণা, রোহিৎ, সস্রুৎ, অর্ণা, সিন্ধু, কুল্যা, বর্য্যা, উর্ব্বী, ইরাবতী, পার্ব্বতী, শ্রবন্তী, উর্জ্জস্বতী, পয়স্বতী, সরস্বতী, তরস্বতী, হরস্বতী, রোধস্বতী, ভাস্বতী, অজিরা, মাতা, নদী। এই সমস্ত নাম বেদে পাওয়া যায়। অমরকোষে তরঙ্গিণী, শৈবলিনী, তটিনী, হ্লাদিনী, ধূনী, স্রোতস্বিনী, দ্বীপবতী, স্রবন্তী, নিম্নগা, আপগা এই কয়টী নাম পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন নদীর আরও অনেক নাম অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। উদারহণ স্বরূপ 'গঙ্গা' বা 'গাঙ্' শব্দ লইতে পারি। আমরা 'নদীর ঘাটে যাই' এই অর্থে 'গাঙের ঘাটে যাই' বলিয়া থাকি। 'গঙ্গা' শব্দ গম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে নদী বুঝাইত, পরে যোগরূঢ় হইয়া নদী-বিশেষকে বুঝাইতেছে।

বেদে নদীর যে সমস্ত নাম পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা নদীর বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের বিষয় যে অবগত ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়।

'অবনি' শব্দের অর্থ 'অবতি জগৎ সা উদকেন,' অব্যতে প্রাণিভিঃ তীরাদি-নির্ম্মাণেন বা। নিজ জল দ্বারা জগৎ রক্ষা করে অথবা যাহাকে প্রাণীরা তীরাদি (Guide Bank) নির্ম্মাণ করিয়া রক্ষা করে, সে অবনি। এই বৈদিক শব্দ দ্বারা আমরা পাই যে নদী রক্ষা করিতে গেলে মানুষের চেষ্টা চাই। নদী রক্ষার জন্য মানুষ কেবল প্রকৃতির উপর নির্ভর করিবে না, নিজের কৃতিত্বের উপরও নির্ভর করিবে—বৈদিকযুগে ভারতবাসী ইহা অবগত ছিল। বর্ত্তমান যুগের বিশেষজ্ঞদিগেরও ঐ মত।

"All deltas require essentially the same treatment,. They are all subject to dreadful evils if unregulated and the rivers left uncontrolled. All are capable of almost incalculable improvements, all cause a far greater expense by their being neglected, than by the execution of the most complete system of works ; all require the same means to be used to regulate their waters, and convert the natural constant succession of flood and drought into a constant and invariable supply of that which makes the whole difference between plenty and famine, comfort and misery, wealth and poverty, so far as material things can do it."

"Upon the regulation of the waters of every country depends, incomparably more than on anything else, its material well-being ; this is especially the case in all tropical and other countries which have defined periodical rains. General Sir Arthur Cotton.

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে আমাদের দেশের নদীর রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা না হইলে নদী জীবিত থাকিতে পারিবে না এবং এ দেশ ধনে ও স্বাস্থ্যে কখনও উন্নত হইতে পারিবে না। নদী-রক্ষার জন্য রাজশক্তি ও প্রজাপুঞ্জের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত রাজপুরুষগণের ও প্রজা-পুঞ্জের তদ্রূপ উপযুক্ত সমবেত বা পৃথক্ চেষ্টা দেখা যায় নাই।

নদীর দ্বিতীয় নাম যব্হী। এই শব্দটী 'যা' ও 'হু' দুইটী ধাতু হইতে উৎপন্ন। প্রাণিগণ যাহা দ্বারা বিভিন্ন স্থানে গমন করে এবং যাহার তীরে যজ্ঞাদি নিষ্পন্ন হয়, সে নদী। কোনও কোনও কোষে 'যব্হী' স্থানে 'যব্যা' নাম

পাওয়া যায়। শব্দটী 'যু' ধাতু হইতে উৎপন্ন। বর্ষাকালে মেঘোদক যাহাতে মিশ্রিত হয় এবং সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যাহার জল আকৃষ্ট হয়, যাহার উপরে সেতুবন্ধন করা যায় অথবা যাহা যবাদি শস্যের হিতকর,—তাহা যব্যা বা নদী।

নদীর তৃতীয় নাম খা। 'খন্' ধাতু হইতে 'খা' শব্দ উৎপন্ন। যাহারা ভূমিকে খনন করিয়া বেগে প্রবাহিত হয়, তাহার খা বা নদী। আমাদের দেশের নদী যে পর্ব্বতাদি হইতে মৃত্তিকা খনন করিয়া বহন করিয়া আনিয়া নূতন স্থলভাগের সৃষ্টি করে এবং ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে ইহা সকলেই অবগত আছেন।

নদীর আর এক নাম সীরা। যাহাতে সেতু প্রভৃতি বন্ধন করা হয় অথবা যাহা শিলাদি দ্বারা রুদ্ধ করা হয় তাহা সীরা বা নদী।

স্রোত্যা স্রোতস্বতী। এনী গতিশীলা। ধূনী যে নিজে গমন সময়ে কম্পিতা হয় ও তীরস্থ বৃক্ষাদিকে কম্পিত করে, সে ধূনী। রুজানা যে কূলকে রুগ্ন করে অর্থাৎ ভগ্ন করে। বক্ষণা যে বর্ষাকালে অত্যন্ত বেগে ক্রোধশীলা হইয়া গমন করে। 'স্বাদোহর্ণা' বেগবজ্জলা অর্থাৎ যাহার জল বেগে প্রবাহিত হয়। রোধচক্রা যে নিজে নিজের তীর নির্ম্মাণ করে। হরিৎ—যে বৃক্ষ গুল্মাদি বেগে হরণ করে। সরিৎ - যে বেগে প্রবাহিত হয়। 'অগ্রূব্' গমনশীলা। নভনু—যে কূলাদির বাধা জন্মায়। 'বধূ'—যে ভূমি বহন করে অথবা যে সমুদ্রের ভার্য্যা। হিরণ্যবর্ণা স্বর্ণবর্ণা অর্থাৎ পর্ব্বতাদি হইতে গৈরিক-মৃত্তিকা গ্রহণ করায় যাহাদের বর্ণ স্বর্ণবর্ণ সদৃশ হয়। রোহিৎ—যাহার জল পাইয়া বীজ অঙ্কুরিত হয়। অর্ণা—গতিশীলা। সিন্ধু—যাহা স্পন্দিত হয়। 'কুল্যা'—কুল-পর্ব্বত অর্থাৎ প্রধান প্রধান পর্ব্বত হইতে যাহারা জন্মে। বর্য্যা—শ্রেষ্ঠা। উর্ব্বী—যে প্লাবনের সময় সকল স্থান আচ্ছন্ন করে। ইরাবতী—বলবতী। পার্ব্বতী পর্ব্বতসম্ভূতা। শ্রবন্তী—গমনশীলা। ঊর্জস্বতী—বলবতী। পয়স্বতী—যাহা পানীয় জল প্রদান করে। সরস্বতী—জলদায়িনী। তরস্বতী—যাহা প্লাবিত করে এবং যাহা পার হইতে হয়। হরস্বতী—যাহাকে পানের জন্য লোকে বহুল পরিমাণে হরণ করে। রোধস্বতী—তীরবতী। ভাস্বতী—দীপ্তিমতী। অজিরা—শীঘ্রগা। মাতা—মাতার ন্যায় প্রাণিগণের রক্ষাকরী। নদী-বহুল দেশকে লোকে 'নদীমাতৃক' বলে। যে শব্দ করে সে নদী। নদীর নাম হইতেই বৈদিক-যুগের কেবল যে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে, উহাতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎকর্ষও দৃষ্ট হয়।

আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমস্ত নদীই হিমালয়ের তুষার-প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে কিংবা আরবসাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গা বঙ্গদেশে আসিবার পূর্ব্বে অন্যান্য বহু নদ নদী দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। যাহা ভাগীরথী নামে পরিচিত তাহাই প্রকৃত গঙ্গা, রাজমহল পর্ব্বতের বাধা পাইয়াই গঙ্গা দক্ষিণাভিমুখী হয়। যে নদী পদ্মানামে খ্যাত, তাহাকে ইংরেজেরা এখন 'গঙ্গা' নাম প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই পদ্মার জন্ম যে ভাগীরথীর অনেক পরে হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অনেক যুক্তি আছে। প্রথমতঃ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পদ্মার জলের কোনও পবিত্রতা নাই। পদ্মায় কেহ গঙ্গা-স্নান করিতে যায় না। বরংচ পদ্মাতীরস্থ লোকেরা ভাগীরথীর জলে গঙ্গা-স্নান করিতে আসেন। সুতরাং যখন গঙ্গানদী দক্ষিণাভিমুখী হয়, তখন পূর্ব্বদিকে তাহার কোনও শাখা ছিল না অনুমান করা যায়, কারণ যদি তখন পূর্ব্বাভিমুখী শাখা থাকিত, তাহা হইলে তাহাও ভাগীরথীর ন্যায় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। ভগীরথের গঙ্গানয়ন-বিষয়ক পৌরাণিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলেও এই সিদ্ধান্ত হয়। কারণ ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষগণ যে স্থানে ভস্মীভূত ছিলেন সেই কপিলাশ্রম ভাগীরথীরই তীরে। অদ্যাপি গঙ্গাসাগর-সঙ্গম তীর্থ ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম স্থলেই প্রতিষ্ঠিত। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রাকৃতিক কারণও আছে। যখন কোনও নদীর খাত কোনও স্থানে উচ্চ হয়, এবং সমস্ত জল তাহা দ্বারা নিঃসারিত হইবার বাধা হয়, তখন তাহার জল অন্যদিকে যাইয়া নূতন নদী সৃষ্টি করে। কালক্রমে সেই নূতন নদীই প্রবল হয়, পদ্মাও সেইরূপে প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে।

বঙ্গের প্রধান নদী গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, রূপনারায়ণ ও দামোদর। এই সকল নদী বহু নদ নদীর দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া নূতন বহু নদীর উৎপত্তির কারণ হইয়াছে।

পদ্মা ও গঙ্গা হইতেই মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহরের সমস্ত নদীর উৎপত্তি। ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী বা খড়িয়া, মাথাভাঙ্গা বা চূর্ণী, গড়ই বা মধুমতী বা বলেশ্বর কিম্বা হরিণঘাটা সমস্তই পদ্মা বা গঙ্গার শাখা। ভাগীরথী গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও চব্বিশপরগণা দিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে, এবং উহাতে পতিত হইবার পূর্ব্বে জলঙ্গী বা খড়িয়া এবং মাথাভাঙ্গা বা চূর্ণী দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। নবদ্বীপ বা নদীয়ার নিম্নে জলঙ্গী বা খড়িয়া

ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ঐ ভাগীরথীর নিম্নাংশ ইংরেজেরা হুগলী নামে অভিহিত করেন। মাথাভাঙ্গা বা চূর্ণীও রাণাঘাটের নিম্ন দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। যমুনা নদী ভাগীরথী হইতে উঠিয়া ইচ্ছামতীর সহিত মিশিয়াছে। দক্ষিণাংশে যমুনাকেই আমরা পাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভৈরব পদ্মা হইতে উঠিয়াছে। এই ভৈরবই মাথাভাঙ্গা ও জলঙ্গীর জন্মের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর ও খুলনার মধ্য দিয়া বলেশ্বরের সহিত মিশিয়া সমুদ্রে গিয়াছে। যখন জলঙ্গীর জন্ম হইল, তখন জলঙ্গী ভৈরবকে ভেদ করিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে পদ্মার যে স্থান হইতে জলঙ্গী উদ্ভূত হইয়াছে, সে স্থানে চড়া পড়িয়া গেল। এবং বর্ষার অন্তে ভৈরবের জলই জলঙ্গীকে জীবিত রাখিতে লাগিল, কিন্তু জলঙ্গীকে জীবিত রাখিতে গিয়া ভৈরব আত্ম-বিসর্জ্জন দিল। বর্ষাকালে জলঙ্গীর শুষ্ক প্রায় মুখ দিয়া পদ্মা হইতে যে যৎসামান্য জল প্রাপ্ত হয় তাহা হইতে এবং স্থানীয় বৃষ্টির জল দ্বারা নদীয়া জেলায় ভৈরব কোনও প্রকারে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে। ঐ ভৈরব পরে মাথাভাঙ্গায় প্রবেশ করে। ভৈরব মাথাভাঙ্গায় প্রবেশ করিয়া মাথাভাঙ্গারই উপকার সাধন করে। মাথাভাঙ্গাও ভৈরব অপেক্ষা পশ্চাৎ উদ্ভূত নদী। মাথাভাঙ্গাও ভৈরবকে ভেদ করিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে। মাথাভাঙ্গা বর্ত্তমানে নদীয়ার সুবলপুর ও সুলতান-পুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ভৈরবের প্রাচীন খাত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ভৈরব ঐ সুলতানপুর অর্থাৎ পূর্ব্ব বঙ্গ রেলের 'দর্শনা' ষ্টেসনের নিকটে ও তৎপরে নদীয়ার জীবননগর দিয়া যশোহর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু উহার প্রায় ২।৩ মাইল স্থান সমভূমি হইয়া গিয়াছে, খাতের কোনও চিহ্ন নাই। পরে ভৈরব খালিশপুর, মহেশপুর, কোটচাঁদপুর, তাহেরপুর, কৃষ্ণভাঙ্গা, চূড়ামণ-কাটী, যশোহর, রূপদিয়া, সিঙ্গিয়া, নপাড়া দিয়া বর্ত্তমান খুলনা জেলায় প্রবেশ করিয়া বলেশ্বরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কপোতাক্ষ তাহেরপুরের নিকট ভৈরব হইতে উৎপন্ন হইয়া ঝিকরগাছা, ত্রিমোহনী, সাগরদাঁড়ী, কপিল-মুনি, রাড়ুলী কাটীপাড়া প্রভৃতি স্থান দিয়া সমুদ্রাভিমুখে গিয়াছে।

যশোহরের পূর্ব্বাংশ-বাহিনী গড়ই কুষ্ঠিয়ার নিকট পদ্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া মধুমতী, বলেশ্বর ও হরিণঘাটা নাম পাইয়া নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও বরিশাল দিয়া সাগরে পড়িয়াছে। যশোহরের কুমার, চিত্রা, নবগঙ্গা সকলেই মাথাভাঙ্গা হইতে উদ্ভূত, কিন্তু এখন মাথাভাঙ্গার সহিত সংযোগ নাই;

মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মধুমতী এখন প্রকাণ্ড নদী কিন্তু পূর্ব্বে অতি ক্ষুদ্র-কায় ছিল, তখন নবগঙ্গারই প্রাধান্য ছিল। যশোহরের অন্যান্য নদী—যেমন হরিহর, ভদ্রা, মুক্তিশ্বরী, হানু, বেগবতী, বেত্রবতী, আফ্‌রা, গোবরা, ঘোড়াখালি, আত্রাই, মুজৎখালি ইত্যাদি সমস্ত নদীই পূর্ব্বোক্ত নদী সমুদয়ের শাখা। যশোহরের পূর্ব্বাংশের বারাসিয়া নদী এখন মৃত-প্রায়, বর্ত্তমানে তাহার উভয় মুখেই মধুমতী। যশোহরের অধিকাংশ নদীর জীবনই মাথাভাঙ্গার জীবনের উপর নির্ভর করে। মাথাভাঙ্গার সহিত যদি পদ্মার অবাধ সংযোগ থাকে এবং যশোহরের কুমার, চিত্রা, নবগঙ্গা, ভৈরব প্রভৃতির সহিত যদি মাথাভাঙ্গার অবাধ সংযোগ থাকে তাহা হইলে যশোহরের এই সকল নদীর মরণের ভয় থাকে না।

যশোহরের স্বাস্থ্যের ও ধনসম্পদের যে এত অবনতি তাহার প্রধান কারণ যশোহরের নদীগুলির অকাল মৃত্যু কিম্বা মৃত-প্রায় অবস্থা। এ বিষয়ে বর্ত্তমানে মতদ্বৈধ নাই বলিয়া ইহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক মনে করি না।

১৮৮১ সালে যশোহরের লোক-সংখ্যা ছিল ১৯৩৯৩৭৫ জন। ১৮৯১ সালে যশোহরের লোকসংখ্যা ১৮৮৮৮২৭ জন, ১৯০১ সালে ১৮১৩১৫৫, ১৯১১ সালে ১৭৫৮২৬৪, এবং ১৯২১ সালে ১৭২২২১৯ জন। সুতরাং ১৮৮১ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত এই ৪০ বৎসরে যশোহরের লোকসংখ্যা হ্রাস পাইল ২১৭১৫৬ জন।

ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনও সভ্য দেশে এরূপ ভাবে লোক সংখ্যা কমিতে থাকিলে সেখানে রাজা প্রজা কেহই তাহার প্রতিকার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ১৯২০ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত যশোহরের জন্ম-মৃত্যুর তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি। ঐ তালিকা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয়ে সাধারণতঃ ভয়ের সঞ্চার হইবে, এবং আশা করি সকলের মনেই যশোহরের দুর্গতির কারণ দূর করিবার এবং আত্ম-রক্ষার জন্য তীব্র চেষ্টা হইবে। দেশের নদীগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিলেই আমাদের জীবিত থাকার আশা হয়, অন্যথা নয়। সাধারণতঃ নদীসমূহ পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া সাগরে পতিত হয়, কিন্তু সাগরে পড়িবার পূর্ব্বে তাহারা মানুষের অনেক উপকার সাধন করে। তবে বদ্বীপস্থ নদীগুলিকে যদি সুশাসিত ও সংযত না করা যায় তাহা হইলে তাহারা মানুষের অনিষ্টই সাধন করে। অনেক সময় তাহারা সুন্দর সুন্দর জন-পদ ধ্বংস করিয়া ফেলে, অনেক সময় প্লাবন দ্বারা শস্যাদি নষ্ট করে, অনেক প্লাবনে বহু মনুষ্য এবং অন্যান্য প্রাণী বিনষ্ট হয়।

প্রকৃতির উপর আধিপত্য-বিস্তারেই মানবের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব। এই আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারিলে, মানব অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় চির-কাল একই অবস্থায় থাকিত। মানুষের মানুষ থাকিতে হইলে, প্রকৃতিকে তাহার কার্য্যে লাগাইতে হইবে। প্রাকৃতিক উৎপাত চিরকালই থাকিবে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধি-বলে উহার প্রতিকার করিতে না পারিলে, সে অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

নদী আমাদের কি কি উপকার করে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। নদী হইতে আমরা পানীয় জল প্রাপ্ত হই। যে দেশে নদী নাই, সে দেশে স্নান-পানাদির জলাভাবে মানুষের যে কি কষ্ট, তাহা চোখে না দেখিলেও কল্পনা করা যায়।

নদী আমাদের গমনাগমনের সুবিধা করিয়া দেয়। রেল অপেক্ষাও নৌকায় বা ষ্টিমারে যাওয়া সুবিধাজনক। রেল চালাইতে রাস্তা প্রস্তুত করিতে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু দেবখাত নদীই রাস্তার কার্য্য করে। যেখানে সেখানে আরোহী উঠিতে ও নামিতে পারে। খরচ কম; স্বাধীনতা অধিক। সংক্রামক রোগের ভয় কম। রাত্রি দিন যে সময় ইচ্ছা নিজের নৌকায় বা যাত্রীর নৌকায় যাওয়া যায়। ষ্টেসনে যাইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। মাল আনার পক্ষেও নদী বেশী সুবিধাজনক। দেশে যে এত রেল হইয়াছে, তথাপি মালের জন্য নদীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। রেল অনায়াসে নষ্ট করা যায়, নদীর পথ রোধ করা কঠিন। দেশে যত মাল, রেল সে পরিমাণে নাই। রাণীগঞ্জের কয়লার খনি হইতে যদি খাল থাকিত, তাহা হইলে কয়লা এত দুর্ম্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য হইত না। নদী-পথে মাল বহনের খরচও অনেক কম।

নদীর দ্বারা মানব ও গৃহ-পালিত পশ্বাদির আহারের সংস্থান হয়—রেলের দ্বারা হয় না। নদী স্বীয় বক্ষে যে সার বহন করে, তাহার দ্বারা শস্যক্ষেত্র সিঞ্চন করিয়া উহার উর্ব্বরা শক্তি অনেক বৃদ্ধি করে। অনেকেই জানেন, যে জমিতে পলি পড়ে তাহাতে অন্য সারের প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টির জলের অল্পতা বা অভাবে নদীর জল দ্বারা ক্ষেত্র সিঞ্চন করিয়া শস্য রক্ষা করা যায়। যে ক্ষেত্র জল দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তাহাতে প্রচুর শস্য জন্মে ও উহা সতেজ হয়। কূপ ও পুষ্করিণীর জল অপেক্ষা নদীর জল শস্যের পক্ষে অধিক উপকারী। নদী থাকিলে, দেশে জল-প্লাবন দ্বারা শস্যাদি নষ্ট হয় না, নদী দিয়া জল নির্গত হইয়া যায়। নদী বা খালের অল্পতা ও নদীগর্ভে চড়া পড়াতেই মারাত্মক বন্যা।

হয়। নদী স্রোতস্বতী থাকিলে, তাহাতে Anopheles মশা জন্মিতে পারে না, কারণ বদ্ধ জলই তাহাদের জন্ম ও বৃদ্ধির উপযুক্ত স্থান। প্লাবন দ্বারা দেশ ধৌত ও শস্যক্ষেত্র উর্ব্বর করিতে হইলে, স্রোতস্বতী নদীর প্রয়োজন।

এদেশে রেল প্রস্তুতের পূর্ব্বেই কোনও কোনও নদী রক্ষা করিতে East India Company বাণিজ্যের খাতিরে কিছু কিছু চেষ্টা করিতেন, কিন্তু রেল হইবার পর উহার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। আমাদের দেশের লোকও উদাসীন। সুতরাং দেশের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে।

Sir Arthur Cotton বলেন :—

"In this fundamental particular, THE IRRIGATION AND NAVIGATION HAVE BEEN A COMPLETE SUCCESS, AND THE RAILWAYS A COMPLETE FAILURE."

As to increase of productiveness when river water was available for cultivation, "in Godavari we used to reckon that it increased the crop in grain by Rs. 20 an acre at least." In the North-Western Provinces and in Orissa the increase has been put at Rs. 15 per acre.

"This is besides the cheap transit, the drainage, the security from river floods, the abundance of forage, the supply of wholesome drinking water, etc."

"In Godavari the passengers are carried eight miles for a penny, and the canals are crowded with passenger boats. *This perfect liberty of intercourse is the very life of the district.* If all India were supplied with such cheap passenger transport, where the passengers could be taken up and put down anywhere, and every one was free to travel either in his own boat or by any passenger or goods boat, at any hour of the day or night, and at any speed, without having to wait for a train or go to a station, it would be impossible to estimate the benefits it would confer."

"The effects of railways must be stated rather by what they do not do than by what they do do.

"They do *not* provide food for man or beast ;
"They do *not* carry the great traffic of the country ;
"They do *not* carry cheaply enough to answer their main purpose ;
"They do *not* touch the local traffic, either of passengers or goods, perceptibly ;
"They do *not* pay the interest of their cost and debt ;
"They do *not* drain the country ;

"They do *not* provide wholesome drinking water;

"They do *not* prevent fever;

"They no *not* create traffic; and, what is a most important point, in case of disturbance it will be impossible to protect them, because you cannot patrol them with trains of armed men while the ordinary traffic is running."

"In short, as a chief railway engineer said to a friend of mine, they are not suited at all to the circumstances of the country, and India is, at this moment, in as great want of a complete system of water carriage as if no railways existed."

আমরা এতই দুর্ভাগা যে আমরা গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে মরি এবং বর্ষাকালে উহার আধিক্যে মরি। জলাভাবে আশুধান্য শুষ্ক হয়। জল অভাবে আমন ধান্য শস্য নষ্ট হয়, পাট নষ্ট হয়, আবার জলের প্রাচুর্য্যেও শস্য ডুবিয়া যায়। বর্ষান্তে যাহারা জীবিত থাকে, তাহারা আবার জলের অভাবে মরে।

বর্ষাকালে অপরিমিত জল সমুদ্রে চলিয়া যায়, যদি শ্রমশীল ও বুদ্ধিমান হইতাম, তাহা হইলে ঐ জল আমরা খাল, নাল, দীঘি, পুষ্করিণী, কূপে আনিয়া রক্ষা করিয়া উহার দ্বারা স্নান পান ও ক্ষেত্র সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিতাম। যে স্থানে—যেমন বঙ্গ দেশে—অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়, সে স্থানেও জল রক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে:—

"It will be well, perhaps, to remark on some mistakes which are almost universal on this subject. The first is that, if a tract of land has plenty of rain, there is no necessity for irrigation. . . . No quantity of rain will prevent a famine unless it is tolerably distributed. The fact is, that water from irrigation is required in almost every part of India, even to prevent famine. But, further, there is never a season when, at some time or other, additional water would not improve the crop. Again, when we say 'irrigation,' we always mean the complete regulation of the water, that is, including draining; so there is never a season when there is not, at some moment, excess of rain, which requires to be carried off by a system of drains. It is this REGULATION OF WATER that is needed, and which so abundantly repays the cost of works. God gives us rain, but, as in everything ele, He leaves something for us to do, which, if we are too indolent to do, we must suffer for it."

সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে সর্ব্বত্রই নদীর পাহাড়িগুলি পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অপেক্ষা উচ্চ। বর্ষান্তে অর্থাৎ নদীর যখন স্রোত কমিয়া যায়, তখন জলে যে পলী থাকে, তাহা পাহাড়ি ভাসিলে উহাতে পতিত হয়, এবং নদী-গর্ভেও পতিত হয়। নদীর একটী কার্য্যই এই যে সে যে স্থান দিয়া যায়, সেই স্থান ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান উচ্চ করিয়া দিয়া যায়। যদি নদীর জল পাহাড়ি ছাড়াইয়া শস্য-ক্ষেত্র বা বিলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সে স্থানেও পলি ফেলিয়া উহা উচ্চ করে। এই সময় যদি বালি পলী পড়ে, তবে উহা "বালি মুদা" হইয়া যায়। জমিতে বালি পড়িলে উহা কাটিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা উহাতে বাঙ্গি, ফুটি, তরমুজ ভিন্ন অন্য কিছু জন্মে না।

চতুষ্পার্শ্বে পলী পরিত্যাগ করিয়াই নদী তাহার নিজের জীবন রক্ষা করে। চতুষ্পার্শ্বে যত বেশী পলী পড়ে, তাহার নিজ খাতে পলী তত কম পড়ে।

যদি প্রত্যেক নদীর বাঁকে বাঁকে খাল থাকে, এবং সেই খাল পল্লীর মাঝ দিয়া বিলে প্রবেশ করে, তাহা হইলে নদীর বাঁচার উপায় হয়। অনেক সময় নদী নিজেই ঐ খাল করিয়া লয়, অনেক সময় উহা কাটিয়া দিতে হয়। বর্ষার সময় যখন স্রোত খুব বেশী, তখন নদীতে বেশী পলী পড়িতে পারে না, কারণ স্রোতে উহা সমুদ্রে লইয়া যাইয়া, তীরের নিকট সমুদ্র-গর্ভ ক্রমে উচ্চ করিয়া ভবিষ্যৎ জন-পদের সৃষ্টি করে। সমস্ত বঙ্গভূমিই এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু যেই বর্ষার শেষে স্রোত কমিয়া আসিল অমনি নদী-গর্ভে প্রায় সমস্ত পলীই পড়িয়া যায়। এইরূপ হইতে হইতে নদীগর্ভে আর পূর্ব্বের ন্যায় জল ধরে না, তখন বন্যার পরিমাণ অধিক হয়, নদী ঘর দরজা, মানুষ গরু ভাসাইয়া লইয়া ধ্বংসের লীলাখেলা করে। সুতরাং নদী রক্ষা করিতে গেলে, প্রত্যেক নদীর বহু খাল থাকা চাই, ঐ খাল দিয়া জল গ্রামে গ্রামে যাইয়া, পলী ফেলিয়া সেই গ্রামের ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবে, গর্ত্তাদি পূর্ণ করিয়া দিবে, বিলগুলিকে ক্রমে ভরাট করিবে। বর্ষান্তে বিলের পরিষ্কৃত অনেক পরিমাণ জল উভয় তীর হইতে আবার নদীতে ফিরিয়া আসিয়া নদী গর্ভের সঞ্চিত পলি বর্দ্ধিত স্রোত দ্বারা বহন করিয়া, উহার তলস্থ জমি আরও গভীর না করিতে পারিলেও অন্ততঃ পূর্ব্ববৎ রাখিবে।

ভৈরবের জল আসিবে মাথাভাঙ্গা হইতে, মাথাভাঙ্গার সহিত ভৈরবের যোগ নাই। সুতরাং মাথাভাঙ্গার সহিত যোগ সংঘটন না করিলে ভৈরবের কোনই উপকার হইবে না। একথা আমি বহুকাল হইতে অর্থাৎ Sir Stewart

Bailyর সময় হইতে কর্তৃপক্ষীয়দিগকে বুঝাইয়া আসিতেছি, কিন্তু আমি ত বিশেষজ্ঞ নহি, আমার কথা কেহ শুনেন নাই। অবশেষে Lord Ronaldshay কে সব বুঝাইলাম, তিনি বুঝিলেন—তাঁহার চিঠি খানি এইবার পড়িব।

D. O. NO. ২২৩৭.

Government House,
Darjeeling.
২1st September ১৯২০.

Dear Rai Bahadur,

His Excellency asks me to write to you with regard to your enquiries in connection with the Bhairab scheme. Had His Excellency known that he was to meet you on the occasion of his visit to Daulatpur, he would have brought with him the detailed maps of the project to show you. It is difficult to give any detailed description of the scheme without such maps, but the following is a rough sketch of what it is proposed to do, and Lord Ronaldhsay says that he will be glad to show you the detailed maps should you by chance be visiting Darjeeling during the next two or three weeks.

First let me say that the Engineers are in complete agreement with you in your contention that no scheme for improving the Bhairab will be effective unless it provides for its replenishment by the surplus water of the Mathabhanga. The project now nearing completion is in two parts. The first part provides for the restoration of the Bhairab river between the Mathabangha river and Tahirpur. Water to the extent of about 1500 cusecs will be taken from the Mathabangha at Darsena or possibly a point somewhat lower down. This water will flush the Bhairab as far as Tahirpur and will then pass away south via, the Kobadak. In this section of the project the old course of the Bhairab river will be adhered to except in one place where it will be short circuited by means of a cut running west to east, north of the loop which has its southern point near Jbanagar, This discarded loop will be flushed by means of water drawn from the Mathabangha via the Matooha Bhill. The Bhills in a considerable area north and south of the Bhairab will also be brought under control. The second part of the project consists of the introduction of a stream of water from the Nabaganga by a new cut to the Marjat Baor which empties into the head of the lower portion of the Bhairab. This cut will have to cross the Chitra river and there are two alternatives, either to absorb the Chitra in the new cut for a portion of this length

or to siphon the Chitra under the new cut, in which case arrangements would be made to flush the Chitra below the crossing point. The new cut will have a head regulator on the south bank of the Nabaganga and it will be necessary to siphon the drainage from the Bhill north of the Chitra under the new cut. There will also be a tailfall on the Jutrapore khal which leads into the Marjat Baor. The gauge readings show a surplus head of about four feet in the cut which will be absorbed at the tailfall. A portion of the area east of the cut will also be flushed particularly the country between it and the Beng river and this latter river will also be flushed. The water tapped from the Nabaganga will be spill water which comes from the Kumar further north and enters the Nabaganga above Jhenidah. The quantity will depend upon the cost of the project and may amount to as much as two thousand cusecs. The feasibility of this large project depends upon the nature of the sub-soil at the various masonry works and orders have been issued for borings to be put down in order that a final decision with regard to this part of the project may be arrived at.

Such in brief outline is the nature of the project. All levels have necessarily to be worked out with minute care and many other matters which may appear to the layman to be matters of detail have to be considered with equal care lest they upset the elaborate calculations in connection with gradients and volumes of water upon which the success of such schemes depends. Up to last June a sum of approximately Rs 14500 had been spent upon the survey. Lord Ronaldshay is most anxious to see the project pushed on with all possible speed and he hopes that as soon as it is complete with all its details, it will be taken up under the new Bengal Agricultural and Sanitary Improvement Act. For the moment the completion of the project awaits certain data which are being obtained by means of borings as already explained.

His Excellency, when he saw you at Daulatpur expressed the hope that these data would be furnished in the near future and that the project would then be completed without delay. Since then the Government of Bengal have sustained a grave loss in the sudden death of Mr. Cowley and they are about to be further handicapped by the temporary loss of Mr. Addams-Williams who has been ordered by his Medical Advisers to proceed on leave at the earliest possible date. His Excellency does not pretend that these unfortunate circumstances may not result in futher delay, but he asks me to assure

you of his continued personal interest in the Bhairab scheme, and that he will not cease to press on with it with as little delay as is possible under the somewhat difficult circumstances of the present time.

Yours Sincerely,
Sd. Ronaldshay.

Rai Jadunath Mazumdar Bahadur,

আমার প্রস্তাবের একাংশ গৃহীত হইল, আমার প্রস্তাব সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই। আমার প্রস্তাব এই যে মাথাভাঙ্গার উন্নতি করিতে হইবে কারণ নিম্ন মাথাভাঙ্গার অবস্থা ভাল নহে। অবশ্য বর্ষাকালে মাথাভাঙ্গা দিয়া যত জল ভাগীরথীর মধ্য দিয়া সমুদ্রে যায় উহা ভৈরব ও কপোতাক্ষীর জন্য কতক রাখিতে পারিলে অনেক উপকার হইবে বটে, কিন্তু উহাদ্বারা বর্ষান্তে কোনও উপকার হইবে না। বর্ষান্তে মাথাভাঙ্গার জল পাওয়া যাইবে না। মাথাভাঙ্গার সহিত পদ্মার যে স্থানে যোগ, সে স্থানে আরও গভীর করা প্রয়োজন, তাহা হইলে মাথাভাঙ্গায় বেশী জল আসিবে এবং সেই জল, কুমার, চিত্রা, নবগঙ্গা ও তাহাদের শাখা নদীর উপকার করিবে। কিন্তু কার কথা কে শুনে? নদীয়া মুর্শিদাবাদও যশোহরের ন্যায় গতাসু-প্রায়!

আর একটি কথা এই যে মাথাভাঙ্গা বর্ষার সময় অবশ্য গঙ্গা বা পদ্মা হইতে যথেষ্ট জল পায়, কিন্তু অন্য সময় সামান্য, অল্প জলই মাথাভাঙ্গায় আসে। ইহার কারণ গঙ্গার জল হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া কানপুর পর্য্যন্ত প্রায় ক্ষেত্র সেচনের জন্য লওয়া হয়; কানপুরের উজানে গঙ্গার যে বাঁধ হইয়াছে তাহাতে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে সামান্য জলই আসে। সুতরাং গঙ্গাকে ক্ষীণকায় করিয়া বেহারের ও বঙ্গদেশের যথেষ্ট ক্ষতি করা হইয়াছে। যদি বঙ্গ স্বাধীন হইত, তাহা হইলে গঙ্গার জল উজানে আটক রাখিতে দিত না। তবে কি সে সব শস্য-ক্ষেত্রে জল সেচন হইবে না? অবশ্য হইবে। কিন্তু অন্য প্রকারে হইবে। পর্জ্জন্যদেব যখন এদেশে অপরিমিত জল বর্ষণ করেন, তখন বহু খাল এবং উপখাল (Canal & Subsidiary Canal দ্বারা) বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকা বা পুষ্করিণী ও কূপের জল রক্ষা করিয়া উহা দ্বারা শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে ক্ষেত্র সিঞ্চন করা যায়। গভর্ণমেণ্ট তাহা না করিয়া যখন গঙ্গায় জল কম থাকে, সেই সময়ে উহা হইতে জল গ্রহণ করেন, এবং বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে সেই জলের অল্পতা হয় বলিয়া একেবারে গঙ্গার গর্ভে বাঁধ বাঁধিয়াছেন,— যে জল এ দিকে না আসিতে পারে, এবং সেই জল Canal বা খালের দ্বারা

বহু ক্ষেত্রে সিঞ্চিত হয়। ইহাতে গঙ্গায় নৌকা ষ্টিমার যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, পুর্ব্বে কাণপুরেরও উজানে নৌকা ষ্টিমার যাইত তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে অনেক স্থানে দেবখাত নদীকে মানুষ-নির্ম্মিত রেলের জন্য বলি দেওয়া হইয়াছে।

বড় দুঃখেই Sir Arthur Cotton বলিয়াছেন—

It is not the ruinous wars that have kept us poor, but the most unacoountable neglect—a neglect the more extraordinary because it is not endured for a moment in other things. Let any man propose to provide money for wars by leaving buildings to go to ruin, and he would be thought mad; and yet this is only what is systematically done with works upon which the food of the people and the revenue depend.

India is like the field after an Indian battle; there is but one cry; "Water, Water." All that is wanted is water, and this want supplied everything else will almost follow of course. Water for irrigation, and water for transit, will provide for everything else. Water is the universal solvent, and can solve that which has puzzled all the Indian wise men from Lord Cornwallis down to the present day, namely—the revenue settlement question. It has solved that question in Tanjore, the only district where it has been tried. When a man has to pay only twelve shillings a year for an acre of saleable land at four pounds ten shillings, the question is substantially solved, There may be, of course, a thousand questions of trifling importance about it, as there are about everything else; but the essential difficulty is gone. The real difficulty all along has been this - how to get twelve shillings of revenue out of a land on which the total profit was only ten shillings and nothing but water can solve this; and it will assuredly do the same in every district of India where it is applied by the simple process of making the profit on the land one pound or thirty shilings per acre.

ভারতবর্ষ কেন যে দরিদ্র তাহা বলিতে গিয়া Cotton এক স্থানে বলেন—

THE PROPOSED NAVIGATION CANALS THROUGHOUT INDIA.

His lordship then speaks of "the wildest and rashest of all Sir A. Cotton's schemes," viz. :—to construct navigation canals throughout India, at a cost of thirty millions But not one word is said to show in what respect this proposition is wild and rash,

In proposing this scheme, I give the most complete data by which anybody can judge of the case, but I may begin my reply to this charge by showing in what good company I am in recommending canals for navigation Lord Mayo had actually begun a canal by the side of the East India railway for one hundred miles to Raniguni, and when he stopped it, he said "Should the discovery of coal at Midnapur result in a coalfield equal to Rarniguni, one of the principal objects of the Damuda canal will no longer exist, because the coal would be carried by the Midnapur canal to Calcutta." *But when it was reported to Lord Mayo that on the removal of the contractor who had charge of the boring, no more coal appeared, the Damuda canal was not resumed* Thus Lord Mayo first discovered that a canal was essential where £ 25,000 a mile had been spent upon a railway, after twenty years' trial And, of course, if a canal was wanted for coal, it was wanted also for ninety-nine hundredths of the traffic all of which, like coal, require cheapness and not speed Next, we have the late Bengal Government, which says in its last administration report—that for '75 6—speaking of the communication between the Hooghly and the Ganges, "Although some portion of the traffic is taken off by the railways, still the greater portion follows the water highways, notwithstanding they are so tortuous as to be lengthened out to an excessive distance. It is calculated that a boat plying between Eastern Bengal and Calcutta, travels some two hundred or three hundred miles more than it would if there were anything like a straight route by water. *The obvious remedy will be to construct a canal for navigation across the country from Eastern Bengal to Calcutta.*" And thirdly, I must quote the present head railway engineer of India, Mr. Leslie, who as soon as he had finished the extension of the East India railway to Goalundo, the confluence of the Ganges and Burhamputra, wrote a letter to the Calcutta merchants, in which he said, "The fact that the railway company has been in the field twelve years, and has literally acquired only a tithe of the traffic, is an unanswerable argument in favour of the canal. The present eastern traffic is one million nine hundred thousand tons per annum, and it is rapidly increasing. A toll of half a crown on this traffic alone would yield a return of £ 240,000, sufficient to pay all expenses of working and maintenance, and yield a return of eleven per cent. on the capital outlay of £2,000,000. The western traffic would *probably double the receipts* ; at the rate of cost of three shillings and sixpence a ton for tolls and carriage, there would be a saving on the eastern traffic

alone of £840,000 a year, as respects the present cost by rail, steamer, and boat." Thus another *rash* and *wild* engineer calculates that on a line on which £4,000,000 have been spent on a railway (which has been tried for twelve years), if £2,000,000 are spent on a canal there whould be a return on the eastern and wstern ad western traffic together of twenty-two per cent., and a saving to calcutta of £1,750,000 a year, on a line of only one hundred and thirty miles direct distance. And this on the present traffic alone, which is rapidly increasing, without the enormous stimulus that such a great reduction of time and freight would cause. Boats, which carry by far the greater part of the traffic, take six weeks to accomplish the four hundred and twenty miles by the rivers. Now we cannot certainly imagine either Lord Mayo, the late Bengal Government, or the head railway engineer, very violently biassed in favour of canals against their own children—the railways—and if they were, the simple figures given by Mr. Leslie are quite decisive to anybody. Since I was ordered to project a work on this line in 1858, when I recommended a canal, at least £20,000,000 have been lost, besides £4,000,000 spent on the railway in cost and debt. This will give some idea *why India is still a poor country*. If by the grievous mistakes that have been made, £24,000,000 have been thrown away on a line of one hundred and thirty miles, what must be the loss on all India for want of cheap transit, and this leaves out of the calculation nine tenths of the results in the immense traffic that would be created by such effective transit. Of course, what is thus declared to be necessary and practicable on these two lines running out of Calcutta, is equally applicable to all the main lines through similar country.

আর অধিক বলিতে চাহি না। যদি যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, খুলনা জেলাগুলি রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার নদীগুলির সংস্কার করিতে হইবে। অন্ততঃ বর্ষাকালে ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা, গড়ই দিয়া যে জল আসে, তাহা যদি আমরা সবই সমুদ্রে না যাইতে দিয়া অন্যান্য নদী মধ্যে আনিতে পারি, তবেই দেশের মঙ্গল, নতুবা নহে।

এ জন্য ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান সকলেরই সমবেত চেষ্টা চাই, এবং সমবেত চেষ্টা হইলে কোন গভর্ণমেণ্টই তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। কোন ব্যক্তি-বিশেষ যদি দেশের কোন কার্য্যের জন্য চেষ্টা করেন, আর দেশবাসিগণ যদি সেই কার্য্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহা হইলে উহাতে

অধিক ফলোদয় হয়। জন-সাধারণকে এই বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। দরজায় আঘাত মারিলেই দরজা খুলে না। উহাতে উপযুক্ত জোরে আঘাত করা চাই।

সাধারণ রাজস্ব হইতে ইহার জন্য অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। নদী-সংস্কার করিয়া উহাতে কুত বসাইলে, উহার যথেষ্ট আয় হয়। রেল হইবার আগে গভর্ণমেণ্ট নদী-সমূহের জন্য ইংরাজ বাণিকদিগের নির্ব্বন্ধে যাহা কিছু করিতেন, তাহা ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল। নদীগুলি রাখার জন্য এখনও চেষ্টা করিলে দেশ রক্ষা পাইতে পারে। নদীর জন্য গভর্ণমেণ্ট যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে রেলের প্রতিযোগিতার পূর্ব্বে কখনও লোকসান হয় নাই। বর্ত্তমানে নূতন নূতন কলের আবিষ্কার হইয়াছে। নদীগুলির সংস্কার আদৌ কঠিন নহে। আর যদি এ দেশে এমন মস্তিষ্ক-সম্পন্ন Engineer না থাকেন, তাহা হইলে দেশান্তর হইতে Engineer আনা যাইতে পারে। আশা করি দেশের শিক্ষিত লোকমাত্রেই এ বিষয়ে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

ভাগীরথী, জলাঙ্গী, মাথাভাঙ্গার কুত হইতে ১৮৪৭-৪৮ সালে ২৩৮৭৩৩ টাকা আয় হয়,—ব্যয় ৫৮,৪৮২৲।

নিট আয় ১৮০২৫০৲

১৮৭১ হইতে ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত—	গড়ে বার্ষিক ১৪৫৯১৮ টাকা আয়।
১৮৮১ হইতে ১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত—	গড়ে বার্ষিক ৭৭৪৯৫ ঐ
১৮৯১ হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত—	গড়ে বার্ষিক ১৬১৫ ঐ
১৯০১ হইতে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত—	লোকসান গড়ে বার্ষিক ৪৭০৬০

লোকসানের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রেলওয়ের প্রতিযোগিতায় ও নদীর সংস্কার না করাইলে লোকসান হয়। নদীগুলিতে Dredger প্রযুক্ত করা হয় নাই। যদি নদী গভীর রাখা হইত, জাহাজ ও বড় নৌকা চলিতে পারিত, তাহা হইলে লোকসান হইত না।

১৯০৯ সালে Steamer Companyরা এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—কিন্তু ভাগীরথীর মুখ পরিষ্কার করিলে, পাছে পদ্মা ভাগীরথীর খাত দিয়া চলিয়া আইসে, এবং পাছে কলিকাতা ধ্বংস হয়—এই ভয়ে উহার মুখ পরিষ্কার করা হয় নাই। জলাঙ্গী মাথাভাঙ্গার ত কোন কথাই নাই।

বলিবার অনেক আছে কিন্তু অদ্য অনেক বলা হইয়াছে, এই স্থানেই অদ্য ক্ষান্ত রহিলাম।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

৩০শ বর্ষ, ৩০শ খণ্ড
১০ম সংখ্যা।

মাঘ।

১৩৩০ সাল।
১৮৪৫ শকাব্দাঃ

উপাধি।

লেখক—সম্পাদক।

'উপ' পূর্ব্বক 'আ' পূর্ব্বক 'ধা' ধাতু হইতে উপাধি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ধাত্বর্থ অনুসারে যাহা ধারণ করা যায় তাহাই উপাধি। এই বিশ্বে সৎ পদার্থ এক। সেই সৎ পদার্থ নিরুপাধিক এবং অব্যক্ত। নিরুপাধিক সদ্বস্তু যখন আপনাকে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার বহু হইতে হয়—"একোঽহং বহুস্যাম" আমি এক বহু হইব—সৎ পদার্থের এইরূপ ইচ্ছা হইলে তিনি বহু হন। এই অবস্থায়ই সতের মায়ারূপ উপাধি গ্রহণ সংঘটিত হয়। সৎ বা ব্রহ্ম যে পর্য্যন্ত মায়ারূপ উপাধি গ্রহণ না করেন তাবৎ পর্য্যন্ত জগতের কোনও অস্তিত্ব নাই। মায়ারূপ উপাধি ধারণ করিলেই তিনি হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। দার্শনিক সিদ্ধান্ত এই যে নিরুপাধি বা নির্গুণ ব্রহ্ম যে পর্য্যন্ত উপাধি গ্রহণ না করেন সে পর্য্যন্ত জগতের সত্তাও নাই, সুতরাং জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধও নাই। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিবার জন্য ব্রহ্মেরও উপাধি ধারণ আবশ্যক হইয়াছিল।

বাচারম্ভনং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্—শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইবার সময় বলিয়াছিলেন বিকার সমূহের নাশের জন্যই বাক্যের প্রয়োজন। মৃত্তিকাই সত্য বস্তু, ঘটাদি বিকার সত্য নহে। ঘটাদির কারণ যে মৃত্তিকা তাহাতেই ঘটাদি বিলীন হয়। তদ্রূপ জগতের সমস্ত পদার্থেরই মূল ব্রহ্ম, জগতের সকল বস্তুই কার্য্যকারণ পরম্পরায় ব্রহ্মে বিলয়-প্রাপ্ত হয়। অনবস্থা দোষের ভয়ে জগতের একটী চরম কারণ কল্পনা করিতে হয়, মধ্যবর্ত্তী পদার্থগুলি কাহারও কারণ, কাহারও কার্য্য, এভাবে জগৎ কার্য্য-কারণাত্মক। শেষ কারণই সত্য, তদ্ভিন্ন অন্য সমস্তই মূলকারণের তুলনায় অসত্য। যে পর্য্যন্ত ঘট মৃত্তিকায় পরিণত না হয় ততকাল ঘট ব্যবহারিক-ভাবে সত্য—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ঘট যে একেবারেই সত্য নহে—একথা বলা যায় না। তবে ইহার সত্তা দেশ কালের দ্বারা বাধিত।

স্বপ্নকে আমরা মিথ্যা জ্ঞান করি, কেন না যখন জাগরিত হই তখন দেখি স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর কোনও অস্তিত্ব নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমরা নিদ্রিত থাকি ততক্ষণ স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর মিথ্যাত্ব জ্ঞান হয় না, বরং জাগরণ অপেক্ষাও স্বপ্নে আমাদের দৈহিক ক্রিয়া অধিক তীব্রভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু যেই নিদ্রাভঙ্গ হইল, সেই সমস্ত দূরে গেল, স্বপ্নে পর্ব্বতারোহণ, সমুদ্রে পতন, দস্যুহস্তে পতন প্রভৃতি যে সমস্ত ঘটনা উপস্থিত হয়, জাগরণে তাহাদের অসত্যত্ব বোধ হয় বটে, কিন্তু হৃৎকম্প, ভীতি প্রভৃতি জাগরণের পরও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া পরে দূরীভূত হয়।

জাগরিত ব্যক্তির পক্ষে যেমন স্বপ্ন অলীক, তদ্রূপ সদ্‌জ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষেও এই জগৎ অলীক, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হয় ততক্ষণ জগৎকে কাহারও মিথ্যা বলিবার অধিকার নাই। এই জগৎ সৎ ও অসৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম ও মায়া এই দুই পদার্থের ফলস্বরূপ।

নিরুপাধিক ব্রহ্ম মায়ারূপ উপাধি গ্রহণ করাতেই জগতের আবির্ভাব, সুতরাং উপাধি বা মায়া চিরকালই আছে ও থাকিবে। তত্ত্বজ্ঞানের উৎকর্ষে ক্রমে উহা ক্ষীণ হয় এবং পূর্ণজ্ঞান হইলে পরে উপাধির বিনাশ হয়।

এতক্ষণ আমরা দার্শনিক উপাধির কথাই বিবৃত করিলাম, চলিত কথায় যাহাকে আমরা 'উপাধি' বলি তাহাও এই জাতীয়। ইহার সহিত তাহার বিভিন্নতা নাই। মনে কর ঘট একটী পদার্থ, উহাকে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অম্বু

বস্তু হইতে পৃথক করিবার জন্য নাম দিলাম 'ঘট,' উহাই হইল উপাধি। এই উপাধি দ্বারাই উহার বিশেষত্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। একজনের বহুপুত্র জন্মিল, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম হইল, উহাই তাহাদের উপাধি হইল। অনেক সময় দেখা যায়, অদ্য যাহা একজনের নাম, কল্য তাহা তদ্বংশজাত সমস্ত ব্যক্তিরই উপাধি বা পদবী হইল। ব্যাস ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল, কালে ব্যাসবংশসম্ভূত সকল ব্যক্তি নিজেদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামের পরে 'ব্যাস' শব্দ যোজনা করিয়া তাঁহারা যে ব্যাস-বংশজাত তাহা বুঝাইতে লাগিলেন।

এইরূপে আমাদের দেশে—এবং সর্ব্বদেশে উপাধি বা পদবীর সৃষ্টি হইয়াছে। বংশের কোনও এক ব্যক্তি তাঁহার বিদ্যা, দান বা অন্য কোনও সদ্‌গুণের জন্য একটী উপাধি লাভ করিলে ক্রমে তাহা বংশগত হইয়া যায়। পরে ঐ বংশীয় লোকেরা ঐ সমস্ত গুণশালী না হইয়াও ঐ উপাধি ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। 'আচার্য্য' হিন্দু শাস্ত্রানুসারে শ্রেষ্ঠ উপাধি। কিন্তু বর্ত্তমানে আচার্য্যের কোনও গুণ যাহাদের নাই তাঁহাদেরও 'আচার্য্য' উপাধি আছে। মানুষ মাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সমাজে সকলের নিকট সম্মানিত হইতে চাহে। কামনাশূন্য মানুষ অতি বিরল। যাঁহারা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদেরও নামের পূর্ব্বে শতাধিক "শ্রী" ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত আছে। এইরূপে ব্যবহারিক জগতে উপাধির প্রচলন হইয়া আসিতেছে। ঐ উপাধি কোনও সময় রাজা দেন, কোনও সময় আচার্য্য দেন, কখনও বা দেশের লোকে দেন, কিন্তু সকলই উপাধি। হিন্দু সমাজের সর্ব্ববর্ণের উপাধিগুলি এইভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে।

উপাধি কখনও সার্থক হয়, আবার কখনও নিরর্থক হয়। দেশের লোকে মহামতি গান্ধীকে "মহাত্মা" উপাধি দিয়াছেন, এখানে উপাধি সার্থক হইয়াছে, কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি যথার্থ মহাত্মা না হন, আর তাঁহাকে যদি "মহাত্মা" উপাধি দেওয়া যায় তবে সে উপাধি ব্যাধির মত হয়। "মহাত্মা" শব্দ যেমন উপাধি, তেমনি 'গান্ধী' শব্দটীও উপাধিবোধক, সুতরাং মহাত্মারও উপাধি ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা নাই।

উপাধিদাতারা অনেকসময় ভ্রমবশতঃ অনুপযুক্ত পাত্রে উপাধি প্রদান করেন, আবার যোগ্যপাত্রেও দেন। অনেক বিদ্যাশূন্য বিদ্যালঙ্কার দেখা যায়। অনেক মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাশূন্য না হইলেও মহামহোপাধ্যায় উপাধির অযোগ্য। উপাধির সময় সময় অপব্যবহার হয় বটে কিন্তু উপাধি-দান বা উপাধিগ্রহণ

প্রথা যে দোষাবহ একথা মনে করিবার কারণ নাই। যাঁহারা রাজদত্ত উপাধিতে বর্ত্তমানে বীতস্পৃহ, তাঁহাদেরও এই বিরাগের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে উপাধির অপ্রাপ্তিই উহার মূলে বিদ্যমান। উপাধি যোগ্য পাত্রে অর্পিত হইলে উহার সম্মান বা মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, আবার অযোগ্য পাত্রে প্রদত্ত হইলে উহা মর্য্যাদা-হানিকর হয়, অপাত্রে উপাধি-প্রদানের বাহুল্য হইলে ক্রমে লোকের ধারণা হয় যে যখন অধিকাংশ পদ্মলোচন-নামধারী লোকই হীননেত্র, তখন বোধ হয় 'পদ্মলোচন' শব্দের অর্থ লোচনহীনই। এরূপ ধারণা সাধারণের যাহাতে উপস্থিত না হয় তাহার জন্য উপাধিদাতার সাবধান হওয়া প্রয়োজন হয়। মোটের উপর উপাধি মন্দ সামগ্রী নহে, উপাধি যোগ্য পাত্রে অর্পিত হইলে উহা দ্বারা সৎকর্ম্ম ও সদ্‌গুণের পুরস্কার ও জয়ই বিঘোষিত হয়। সংসারে তিরস্কার ও পুরস্কার উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

সৌন্দর্য্য।

লেখক—সম্পাদক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই বিশ্বে আমরা যে সমুদয় পদার্থ গোচর করি, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে "সুন্দর" এবং কাহাকে কাহাকে "কুৎসিত" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি। বস্তুতঃ, এই "সুন্দর" ও "অসুন্দর" আখ্যা প্রদানের একমাত্র কারণ পূর্ব্বসংস্কার। এই সংস্কার প্রথমতঃ আমাদিগের পূর্ব্বজন্মের এবং বর্ত্তমান জন্মের শিক্ষা। মাতৃগর্ভ হইতে আমরা কতকগুলি সংস্কার লইয়া প্রসূত হই। সেই সংস্কার গুলি ইহজন্মের শিক্ষা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্ত্তিত হয়। কোন বস্তুর প্রতি প্রীতি বা অপ্রীতি আমাদের স্বীয় স্বীয় সংস্কার বশতঃই হয় এবং তদ্ধেতুই ব্যবহারিক জগতে ইহাই দৃষ্ট হয় যাহা একের প্রীতিকর তাহা অপরের অপ্রীতিকর। আমরা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ গ্রহণ করি। ঐ শব্দ প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর দুইই হয়। কোন শব্দ একের প্রীতিকর, আবার সেই শব্দই অপরের অপ্রীতিকর হয়। আমার পক্ষেও একরূপ শব্দ প্রীতিকর, এবং অপররূপ শব্দ অপ্রীতিকর। আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা যে রূপ গ্রহণ করি, তাহার সম্বন্ধেও

ঐরূপ মন্তব্য প্রযুজ্য। কৃষ্ণকায় নিগ্রো বা কাফ্রীর রূপ সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান তাহা আমাদের পরিজ্ঞাত নহে। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে যাহারা কৃষ্ণকায় তাহাদের নিজের বর্ণ তাহাদের নিজের নিকট প্রীতিকর নহে বলিয়া বোধ হয়। কারণ, কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদিগকে গৌরাঙ্গীর পাণিগ্রহণের এবং কৃষ্ণকায়া নারী-দিগের গৌরাঙ্গের আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অথচ, কৃষ্ণকায় ব্যক্তি হই-লেই যে কুশ্রী এবং গৌরাঙ্গ হইলেই যে সুশ্রী হইবে, এমন নহে। কিন্তু বর্ণের ইতর বিশেষহেতু সৌন্দর্য্যের তারতম্য করা হইয়া থাকে। অঙ্গসৌষ্ঠবের তুল্যতা অবস্থায় গৌরাঙ্গীর সৌন্দর্য্যই কৃষ্ণাঙ্গীর সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক হয়। বর্ণের অভাবই কৃষ্ণত্ব, এবং সর্ব্ববর্ণের সম্মিলনই শুক্লত্ব; অর্থাৎ যে পদার্থে সপ্তরশ্ম্যাত্মক সূর্য্য-কিরণ প্রতিবিম্বিত হয় সেই বস্তুই শ্বেতবর্ণ আখ্যা-প্রাপ্ত হয়। বস্তুর নিজের কোন বর্ণ নাই। বর্ণমাত্রই সূর্য্য-কিরণের, বস্তু কেবল সেই সূর্য্যরশ্মি সমগ্রভাবে বা আংশিক ভাবে আত্মসাৎ করে।

যে বর্ণটীকে সে আত্মসাৎ করিতে না পারে, সেই বর্ণই তাহা হইতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহার রূপ দান করে এবং সেই বর্ণই তাহার বর্ণ হইয়া যায়। কাচ নামক পদার্থের নিজের কোন বর্ণ নাই এবং উহা সূর্য্যের কোন রশ্মিই আত্মসাৎ করিতে পারে না। সমস্ত রশ্মিই উহা হইতে প্রতিফলিত হয়, উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্যই কাচ শুক্ল বর্ণ প্রাপ্ত হয় ও আমরা তাহাকে "শুক্ল" আখ্যা প্রদান করি। সপ্তরশ্মির একত্র সমাবেশই শুক্লবর্ণ। অঙ্গার কৃষ্ণবর্ণ, কারণ অঙ্গারে সূর্য্যের সপ্তরশ্মি প্রবেশ করে এবং কোন রশ্মিই তাহা হইতে প্রতিফলিত হয় না। কোন রশ্মি প্রতিফলিত না হওয়াতেই উহার কোন বর্ণ থাকে না এবং উহা "কৃষ্ণ" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ, যে বস্তু সূর্য্যের অন্য সকল রশ্মি গ্রহণ করিয়া কেবল রক্তরশ্মি প্রতি-ফলিত করে, তাহাকে আমরা রক্তাখ্যা প্রদান করিয়া থাকি। নীল পীতাদিও ঐরূপ।

সৌন্দর্য্যের এক প্রধান উপকরণ "বর্ণ"। এই বর্ণ সমূহ কোন কোন অব-স্থায় আমাদের প্রীতিপ্রদ হয় এবং কোন কোন অবস্থায় আমাদের অপ্রীতিপ্রদ হয়। যে স্থানে প্রীতিপ্রদ হয়, তখন আমরা উহাকে সুন্দর বলি, এবং যেখানে অপ্রীতিকর হয় তখন আমরা উহাকে কুৎসিত বলি।

প্রভাতে অরুণার্ক-বর্ণ নেত্রের অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। উদয়াচলে অরুণের আবির্ভাব হইলে পৃথিবী সত্য সত্যই এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হয়।

অতি শুষ্ক-হৃদয় ব্যক্তিও ব্রহ্মমুহূর্তে সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়া অভূতপূর্ব্ব নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। এই সূর্য্যোদয় সমুদ্রের মধ্যে আরও মনোহর ভাব ধারণ করে। গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনশৃঙ্গ ও ধবল-গিরির তুষার-মণ্ডিত শিখরে বাল-সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া যে অপরূপ মনোহর দৃশ্য নয়ন-পথে আনয়ন করে, তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয়ে আনন্দের উদ্ভব হয়। ঐরূপ দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইতে হয় এবং চিত্তের এতই একাগ্রতা জন্মে যে বাহ্য সমস্ত বস্তু ভুলিয়া গিয়া ঐরূপেই তন্ময়ত্ব জন্মে। এই বালসূর্য্যের রূপ চক্ষুর অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, উহা দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। নেত্র-প্রীতিপ্রদ অরুণ যখন মার্ত্তণ্ডরূপে মধ্য গগনে বিরাজ করেন, তখন তাঁহার রূপ প্রীতিপ্রদ হওয়া দূরে থাকুক, মানব-চক্ষুর অসহ্য হইয়া থাকে। আবার মার্ত্তণ্ড যখন ধীরে ধীরে অস্তাচলে অধিষ্ঠিত হয়েন, তখনই মানব-চক্ষে তিনি পূর্ব্ববৎ সৌম্যরূপে পরিদৃষ্ট হন। সূর্য্যের উপাদান বা উপকরণের কোনই হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, অথচ অবস্থাভেদে কখন তাঁহার রূপ প্রীতিপ্রদ এবং কখনও বা অপ্রীতিপ্রদ হয়। কিন্তু মার্ত্তণ্ডকে আমরা কি "কুৎসিত" আখ্যা প্রদান করিতে পারি? বোধ হয়, পারি না। মার্ত্তণ্ড প্রীতিপ্রদ নহেন, কিন্তু তথাপি কুৎসিতও নহেন। মার্ত্তণ্ডের তেজের আধিক্যহেতু তাঁহার রূপ আমাদের প্রীতিপ্রদ হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে কুৎসিত বলা যাইতে পারে না। সুতরাং কুৎসিত বলিতে গেলেই আমরা সামঞ্জস্যের অভাব অনুভব করি। কোন প্রভাত-দৃশ্যের চক্রে যদি প্রভাত-গগনে মার্ত্তণ্ডের রূপ অঙ্কিত হয়, তাহা হইলে ঐ চিত্রকে আমরা কুৎসিত চিত্র বলিয়া থাকি। কেন বলি? না, উহা আমাদের প্রকৃতি-জাত সংস্কারের বিরুদ্ধ। কারণ, আমরা প্রত্যহ দেখি যে প্রভাত-সূর্য্য ঐ প্রকার রূপের নহেন। প্রকৃতিই আমাদের সৌন্দর্য্যের দর্শনস্থলী এবং শিক্ষয়িত্রী। রাম-ধনুতেই বর্ণের যথাযথ সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। যে বর্ণের পর যে বর্ণ ন্যস্ত হইলে চক্ষু প্রীতিলাভ করে, রামধনু তদ্বিষয়ে মানবের শিক্ষক। চিত্রে এরূপ বর্ণের অসামঞ্জস্য হইলে উহা কুৎসিত হয়।

বর্ণই যে কেবল রূপের একমাত্র উপকরণ তাহা নহে। সৌন্দর্য্যের সংগঠনে বহুবিধ উপাদান রহিয়াছে। আমাদের প্রাচীন কাব্যাদিতে দেখিতে পাই আজানুলম্বিত বাহু সৌন্দর্য্যের লক্ষণ ছিল। কিন্তু এইরূপ দীর্ঘ বাহু বর্ত্তমানে কোন মনুষ্যের থাকিলে তাহাকে "সুন্দর" আখ্যা দেওয়া যাইবে কিনা—সে বিষয়ে

যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বর্ত্তমানে যাহাদের আমরা আজানুলম্বিত বাহু দেখিতে পাই তাহাদিগের বাহুর দৈর্ঘ্যহেতু সৌন্দর্য্যের কিছু দেখিতে পাই না।

(ক্রমশঃ)



মুসলমানদিগের সহিত স্বরাজদলের আপোষ-মীমাংসা।

লেখক—শ্রীপঞ্চানন কাঞ্জিলাল কবিরত্ন।

ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান সভ্যগণের পৃষ্ঠ-পোষকতা পাইবার আশায় সংপ্রতি স্বরাজদল মুসলমানদিগের সহিত কতিপয় বিষয়ে আপোষ-মীমাংসা করিয়াছেন। পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে ঐ মীমাংসা হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিজনক হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ নগরে হিন্দু মুসলমানের সম্মেলনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান সভ্যসংখ্যা শতকরা ৪০ জন ও হিন্দু সভ্যসংখ্যা ৬০ জন হইবে। বর্ত্তমান মীমাংসায় ঐ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া এইরূপ স্থির হইয়াছে যে বঙ্গ দেশের হিন্দু মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা স্থির করা হইবে; তদনুসারে শতকরা ৫৫ জন মুসলমান ও শতকরা ৪৫ জন হিন্দু হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান বন্দোবস্তে বঙ্গদেশের হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায় শতকরা ১৫টী সভ্যপদ হইতে বঞ্চিত হইলেন; অধিকন্তু সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রণালীও অক্ষুণ্ণ থাকিল।

ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীতে সভ্যসংখ্যা সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে যে, যে জেলায় হিন্দু সংখ্যা অধিক, সে জেলায় শতকরা ৬০ জন হিন্দু ও ৪০ জন মুসলমান সভ্য হইবেন; আর জেলায় মুসলমান সংখ্যা অধিক, তথায় শতকরা ৬০ জন মুসলমান ও ৪০ জন হিন্দু সভ্য হইবেন। ইহাতেও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রণালী অবলম্বিত হইবে।

বর্ত্তমানে কোন্ জেলার হিন্দু ও মুসলমান লোকসংখ্যা কত এবং ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও লোকালবোর্ডে কোন জাতীয় সভ্যসংখ্যা কত, তাহা সরকারী বিবরণী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

জেলার নাম	শতকরা অধিবাসি সংখ্যা।		ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সভ্য-সংখ্যা (শতকরা)		লোকালবোর্ডের সভ্য-সংখ্যা (শতকরা)	
	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান
১। বর্দ্ধমান	৭৮'০০	১৮'৫	৮৮'৯	১১'১	৭৯'৫	২০'৫
২। বীরভূম	৬৮'১	২৫'১	৮১'৩	১৮'৭	৭৫'০	২৫'০
৩। বাঁকুড়া	৮০'৩	৭'৬	৯১'৭	৮'৩	৮৬'৭	১৩'৩
৪। মেদিনীপুর	৮৮'২	০'৩	৯১'৭	৮'৩	৯৪'১	৫'৯
৫। হুগলী	৮১'৯	১৬'১	৮৪'৭	১৫'৩	৮১'৩	১৮'৭
৬। হাওড়া	৭৯'৩	২০'৩	৯৪'৪	৫'৬	৮৭'৫	১২'৫
৭। ২৪ পরগণা	৬৪'২	২৪'৬	৭৬'৭	২৩'৩	৬৬'২	৩৩'৮
৮। নদীয়া	৩৯'১	৬০'২	৮০'০	২০'০	৭১'৩	২৮'৭
৯। মুর্শিদাবাদ	৪৫'১	৫৩'৬	৫৫'৬	৪৪'৪	৫০'৮	৪৯'২
১০। যশোহর	৩৮'১	৬১'৮	৮৩'৪	১৬'৬	৬৬'৭	৩৩'৩
১১। খুলনা	৫০'৬	৪৯'৩	৮১'৩	১৮'৭	৬২'১	৩৭'৯
১২। ঢাকা	৩৪'২	৫৫'৪	৭২'৮	২৭'২	৭০'২	২৯'৮
১৩। ময়মনসিং	২৪'৩	৭৪'৯	৫৪'২	৪৫'৮	৩৯'০	৬১'০
১৪। ফরিদপুর	৩৬'৩	৬৩'৫	৫৮'৪	৪১'৬	৫৪'৬	৪৫'৪
১৫। বাখরগঞ্জ	২৮'৮	৭০'৬	৫০'০	৫০'০	৪৩'৬	৫৬'৪
১৬। চট্টগ্রাম	২২'৯	৭২'৮	৫০'০	৫০'০	৪৩'৩	৫৬'৭
১৭। ত্রিপুরা	২৫'৮	৭৪'১	৪৬'৭	৫৩'৩	৩৪'০	৬৬'০
১৮। নোয়াখালি	২২'৪	৭৭'৬	২৯'২	৭০'৮	৩১'২	৬৮'৮
১৯। রাজসাহী	২১'৭	৭৬'৫	৪৫'৫	৫৪'৫	৩৩'৪	৬৬'৬
২০। দিনাজপুর	৪৪'১	৪৯'১	৬৬'৭	৩৩'৩	৬৭'০	৪০'০
২১। জলপাইগুড়ি	৫৫'০	২৪'৮	৮৫'৭	১৪'৩	৮৮'৯	১১'১
২২। রংপুর	৩১'৬	৬৮'০	৫৫'৬	৪৪'৪	৪৬'৩	৫৩'৭
২৩। বগুড়া	১৬'৬	৮২'৫	৫০'০	৫০'০	৪০'৭	৫৯'৩
২৪। পাবনা	২৪'১	৭৫'৮	৫৮'৩	৪১'৬	৫২'৮	৪৭'২
২৫। মালদহ	৪০'৬	৫৯'৫	৬৬'৭	৩৩'৩	...	...
বঙ্গদেশে মোট ...	৪৩'৭	৫৩'৬	৬৭'০	৩৩'০	৬০'৮	৩৯'২

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় বর্ত্তমান সভ্য-সংখ্যার শতকরা ৪৪'৬ হিন্দু ও ২৮'৭ মুসলমান।

এক্ষণে বঙ্গদেশের মধ্য, উত্তর ও পূর্ব্ববাংশের কয়েকটী জেলা লইয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক স্বরাজদলের মীমাংসার ফল হিন্দুদিগের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টজনক হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলায় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৭৮ জন এবং মুসলমান সংখ্যা ১৮। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সভ্যদিগের মধ্যে শতকরা ৮৮ জন হিন্দু ও ১১ জন মুসলমান। স্বরাজদলের চুক্তি অনুসারে হিন্দু-সংখ্যা কমিয়া ৬০ জন হইবে অর্থাৎ বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে শতকরা ২৮ জন কম হইবে এবং মুসলমান-সংখ্যা বাড়িয়া শতকরা ৪০ জন হইবে অর্থাৎ বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে ২৯ জন অধিক হইবে।

মেদিনীপুর জেলায় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৮৮ জন এবং মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৬·৮ জন। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে হিন্দু সভ্যসংখ্যা শতকরা ৯১ জন ও মুসলমান সভ্যসংখ্যা শতকরা ৮ জন। স্বরাজদলের চুক্তি অনুসারে হিন্দু সভ্যসংখ্যা কমিয়া ৬০ জন হইবে অর্থাৎ বর্ত্তমানে যত আছে তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমিবে। এবং মুসলমান সভ্যসংখ্যা বাড়িয়া শতকরা ৮ জনের স্থলে ৪০ জন হইবে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সভ্যসংখ্যার ৫ গুণ হইবে।

যশোহর জেলার অধিবাসিসংখ্যার শতকরা ৩৮ জন হিন্দু ও ৬১ জন মুসলমান। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে শতকরা ৮৩ জন হিন্দু ও ১৬ জন মুসলমান সদস্য আছেন। নূতন মীমাংসা অনুসারে হিন্দু সদস্যসংখ্যা কমিয়া শতকরা ৮৩ স্থলে ৪০ হইবে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সংখ্যার অর্দ্ধেকেরও কম হইবে। আর মুসলমান সদস্যসংখ্যা বাড়িয়া শতকরা ১৬ স্থলে ৬০ হইবে, অর্থাৎ প্রায় চতুর্গুণ বাড়িবে।

ঢাকা জেলার অধিবাসীদিগের শতকরা ৬৫ জন মুসলমান এবং ৩৪ জন হিন্দু। বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সদস্য-সংখ্যার শতকরা ৭২ জন হিন্দু এবং ২৭ জন মুসলমান। স্বরাজদলের ব্যবস্থানুসারে মুসলমান সদস্য সংখ্যা হইবে শতকরা ৬০ জন অর্থাৎ দ্বিগুণেরও অধিক; এবং হিন্দু সদস্য-সংখ্যা কমিয়া শতকরা ৭২ স্থলে হইবে ৪০ জন, অর্থাৎ বর্ত্তমান সদস্য-সংখ্যা হইতে শতকরা ৩২ জন কম।

রাজসাহী জেলায় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ২১ জন ও মুসলমান সংখ্যা শতকরা ৭৬ জন। বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সদস্য-সংখ্যার শতকরা ৪৫ জন হিন্দু ও ৫৪ জন মুসলমান। স্বরাজ দলের নূতন ব্যবস্থামত হিন্দু সদস্য-সংখ্যা ৪৫ হইতে ৪০ এ নামিবে অর্থাৎ বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে শতকরা ৫ জন কমিবে, কিন্তু মুসলমান সদস্য-সংখ্যা ৫৪ স্থলে ৬০ হইবে অর্থাৎ শতকরা ৬ জন বাড়িবে।

মালদহ জেলার জনসংখ্যা শতকরা ৪০ জন হিন্দু ও ৫১ জন মুসলমান। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে হিন্দুসভ্য সংখ্যা বর্ত্তমানে শতকরা ৬৬ জন ও মুসলমান সভ্যসংখ্যা

শতকরা ৩৩ জন। স্বরাজদলের নবব্যবস্থানুসারে হিন্দুসভ্য সংখ্যা কমিয়া ৪০ জন হইবে অর্থাৎ শতকরা ২৬ জন কমিবে ও মুসলমান সদস্য-সংখ্যা শতকরা ৬০ জন হইবে, অর্থাৎ শতকরা ৩৩ জন বাড়িবে সুতরাং বর্ত্তমান সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ হইবে।

লোকালবোর্ডের সদস্য-সংখ্যাও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডেরই অনুরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড প্রভৃতিতে হিন্দু-সদস্য-সংখ্যা অভাবনীয়-রূপে কমিয়া যাইবে এবং মুসলমান-সংখ্যা কল্পনাতীত-ভাবে বাড়িয়া যাইবে। ফল যাহা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এইরূপ অভাবনীয় হ্রাস-বৃদ্ধিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যের গুরুতর ক্ষতি হইবে, কারণ সভ্য-দিগের গুণানুসারে নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে সম্প্রদায়গত নির্ব্বাচন হইবে। সুতরাং স্বায়ত্তশাসনের যে বিশেষ অনিষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চিত। কিছুদিন পূর্ব্বে কলি-কাতা করপোরেশনে যখন মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ, মুসলমানদিগের সহিত আপোষ-মুলে, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তখন বিপ্লববাদীরা সুরেন্দ্রনাথের নিন্দায় শতমুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের মফঃস্বলের মিউ-নিসিপ্যাল বিলে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের নাম গন্ধও নাই। এখন স্বরাজদল সর্ব্বত্রই সেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রণালীর সমর্থন করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ মাত্র নয় বৎসরের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু মিঃ দাস চিরদিনের জন্য বঙ্গের ১১৬টী মিউনিসি-প্যালিটীতে ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে উক্তরূপ নির্ব্বাচন প্রণালীর প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী। স্বরাজদল হিন্দু ভোটারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

চাকরী সম্বন্ধে কিরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছে, দেখুন। বর্ত্তমান নিয়মে এক-তৃতীয়াংশ পদ মুসলমানদিগকে দিবার ব্যবস্থা আছে। স্বরাজদল স্থির করিয়াছেন শতকরা ৫৫টী পদ মুসলমানেরা পাইবে। অর্থাৎ মুসলমানেরা কার্য্যদক্ষ ও শিক্ষিত হউক বা না হউক, অধিকাংশ সরকারী চাকরী তাহাদিগকে দিতে হইবে। দেশের কাজকর্ম্ম এ প্রণালীতে যে খুব উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা পাঠকগণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন! চাকরীর বেলায় জাতিগত ব্যবস্থা অতীব অন্যায়। শিক্ষিত ও কার্য্য-কুশল লোক—হিন্দুই হউন বা মুসল-মানই হউন—চাকরী পাইবার যোগ্য এবং দেশের মঙ্গলের জন্য ঐরূপ জাতি-নির্ব্বিশেষে নিয়োগ একান্ত আবশ্যক। স্বরাজদল শুধু যে কাউন্সিল ভঙ্গের পক্ষ-

পাতী তাহা নহেন, সর্ব্বপ্রকার উন্নতিজনক ব্যবস্থারই বিরোধী বলিয়া বোধ হইতেছে।

স্বরাজ দলের মীমাংসায় হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি হওয়া দূরে থাকুক ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ নবীভূত হইবার আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ হইয়াছে। মুসলমানেরা ধর্ম্মকার্য্যে অবাধে গো হত্যা করিতে পারিবেন, হিন্দুরা উহাতে বাধা দিতে পারিবেন না—এমন কি, খাদ্যের জন্য মুসলমানেরা গো-হত্যা করিতে পারিবেন, হিন্দুরা উহার নিবারণ কল্পে ব্যবস্থা পরিষদে কোন আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিতে পারিবেন না। মুসলমানদিগের মসজিদের সম্মুখ দিয়া কোন হিন্দু দেবদেবীর শোভাযাত্রাকালে বাদ্যাদি বন্ধ করিতে হইবে, কিন্তু হিন্দু দেব-মন্দিরের নিকট দিয়া যাইবার সময় মহরম প্রভৃতি মুসলমান শোভাযাত্রার বাদ্যাদি বন্ধ হইবে না। কি চমৎকার মীমাংসা! হিন্দুগণ, সতর্ক হউন, স্বরাজদল দেশের কর্ত্তৃত্ব পাইলে দেশের শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ সুন্দর হইবে, বুঝিয়া লউন এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হউন।

॥

ব্রহ্মসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পাদ।

যদি বল যেরূপ প্রতিমায় দেবতা-বুদ্ধির আরোপ, যেমন শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুর আরোপ, তদ্রূপ আত্মাতেও ব্রহ্মের আরোপ। এ প্রতিবাদ অসঙ্গত। কারণ মুখ্যার্থ সম্ভব থাকিলে কখনও গৌণার্থ গ্রহণ করা যায় না। বিষ্ণু প্রতিমা ন্যায় এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যেখানে শালগ্রামে বিষ্ণু পূজার আদেশ আছে, সেখানে এরূপ আদেশ নাই যে শালগ্রামকেই বিষ্ণু জ্ঞান করিবে, অর্থাৎ উভয়ের অভেদ স্বীকার করিয়া লইবে। উপাসকও জানেন যে শালগ্রাম শিলা বিষ্ণু নহেন, শালগ্রামে বিষ্ণু বুদ্ধির আরোপ মাত্র। এস্থলে আত্মাকেই ব্রহ্মজ্ঞান করিবে। আরোপ মাত্রের উল্লেখ নাই। আর যে স্থলে প্রতীক দর্শনের কথা বলা হইয়াছে সে স্থলে বাক্য একবার মাত্র উচ্চারিত হয়, বহুবার ও

বিনিময় ভাবে উচ্চারিত হয় না। যেমন মনই ব্রহ্ম, এস্থলে মনকে প্রতীক করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা; আদিত্য ব্রহ্ম, আদিত্যকে প্রতীক করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা "মনো ব্রহ্মেতি, আদিত্যো ব্রহ্মেতি" ইত্যাদি স্থলে একবার উচ্চারণ দৃষ্ট হয়। প্রদর্শিত জাবাল শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় ত্বমহমস্মি অহঞ্চ ত্বমসি, তুমিই আমি, আমিও তুমি; এ স্থলে একেবারে অদ্বৈতভাব—ভেদ রহিত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ভেদ দর্শনের নিন্দাও আছে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (১—৪—১০) আছে—অথ যেহ অন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদঃ যে অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, এবং যে ভাবে উপাস্য স্বতন্ত্র এবং আমি উপাসক স্বতন্ত্র, সে কিছুই জানে না। এইরূপ বহু শ্রুতিতে ভেদ দর্শনের নিন্দা আছে।

অহং প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা সংসারী, আর ব্রহ্ম অসংসারী। এই দুই বিরুদ্ধ পদার্থের একত্ব অসম্ভব। উহার উত্তর এই ব্রহ্মজীবে যে অভেদ তাহা যুক্তি ও শাস্ত্রের দ্বারা পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে। জীব ভ্রমবশতঃই আপনাকে সাংসারিক মনে করে। সে যতক্ষণ মায়াবদ্ধ ততক্ষণ জীব, মায়ামুক্ত হইলেই সে ব্রহ্ম। সে আমি ক্ষুদ্র, আমি দীন হীন কাঙ্গাল যে মনে করে, সে মায়াবশতঃ। বস্তুতে সে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। এই জন্যই তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইতে হয়, বুঝাইতে হয় যে সে বস্তুতঃ ব্রহ্ম, অজ্ঞানহেতু নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া জ্ঞান করে। সিংহ-শিশু যদি মেষশিশুর সহিত লালিত পালিত হয়, তাহা হইলে সে আপনাকে মেষ বলিয়া জ্ঞান করে এবং মেষের ন্যায় তৃণ ভক্ষণ করে। পরে দৈবাৎ যদি সে কোন সিংহের সাক্ষাৎ পায়, এবং ঐ সিংহ যদি তাহাকে বুঝাইয়া দেয় সে সিংহ—মেষ নহে, অমনি তাহার সিংহজ্ঞান উপস্থিত হয়। মিথ্যা জ্ঞান যতদিন আছে, ততদিন জীব ব্রহ্মে ভেদও আছে, আর সেই ভেদজ্ঞান নষ্ট করিবার জন্য, সংসারীর সংসারিত্ব নষ্ট করিবার জন্য, ঈশ্বরত্ব-বোধের স্থিরতা করিবার জন্যই—শাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয় তখন উপদেশের প্রয়োজন থাকে না, শাস্ত্রেরও প্রয়োজন থাকে না।

৪। অনেক প্রকার প্রতীক উপাসনা আছে। চতুর্থ সূত্রে বলা হইতেছে যে প্রতীকে অহংগ্রহ উপাসনা করিবে না, কারণ উপাসক প্রতীককে আত্মা বলিয়া জানে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এইভাবে ব্রহ্মে মনোনিবেশ করিবে। এখন বলা হইতেছে, প্রতীকে ওরূপ করিবে না।

উপাসক অনেক প্রকার আছে। যেমন অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভৌতিক ইত্যাদি।

মন ব্রহ্ম এইরূপ উপাসনা করিবে। এই হইল অধ্যাত্ম উপাসনা; আকাশ ব্রহ্ম এইরূপ উপাসনা করিবে, এই হইল অধিদৈব উপাসনা। আদিত্য ব্রহ্ম এইরূপ উপাসনা করিবে, নাম ব্রহ্ম এইরূপ উপাসনা করিবে। এইরূপ বিবিধ উপাসনা আছে। এই সমস্তই প্রতীক উপাসনা। এই সকল প্রতীকে অহং জ্ঞান করিবে কি না এই সূত্রে তাহার বিচার। পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে প্রতীকে আত্মমতি করাই সঙ্গত, কারণ যখন সকলই ব্রহ্ম, তখন প্রতীকও ব্রহ্ম। যাহা ব্রহ্ম তাহাই আত্মা;—ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, না তাহা করিবে না। কারণ প্রতীকে আত্মমতি বা অহং জ্ঞানের প্রবাহ থাকিবে না, কারণ কোন উপাসকই প্রতীককে আত্মা বলিয়া জানেন না। তিনি মনকে বা আকাশকে অহং বলিয়া জানেন না। প্রতীক ব্রহ্ম অহং ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান-পরম্পরাতেও প্রতীকে অহং দৃষ্টি স্থাপিত করা যায় না। প্রতীকে অহং জ্ঞান করিলে প্রতীকের প্রতীকত্ব থাকিল না—নাম প্রভৃতিতে ব্রহ্ম দৃষ্টি প্রবাহিত করিতে গেলে নামাদির স্বরূপ বিলুপ্ত হইল, তাহা হইলে নাম আর প্রতীক থাকিল না। যে পর্য্যন্ত কর্তৃত্বাদি সংসার-ধর্ম্ম থাকিবে, সে পর্য্যন্ত প্রতীক উপাসনা রাখিতে পার, যে পর্য্যন্ত অহং ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সংসার ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে পারে না। নাম ব্রহ্ম উপাসনাতেও সংসার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না, কারণ ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইবে না। দুইটী অলঙ্কার যেমন রুচক ও স্বস্তিক—ইহারা উভয়েই সুবর্ণ-নির্ম্মিত, এটিও সুবর্ণ ওটিও সুবর্ণ এইভাবে উহাদের ঐক্য আছে, অথচ তাহাদের স্বরূপে ভেদ আছে। যদি স্বস্তিকত্ব ও রুচকত্ব ত্যাগ করিয়া কেবল সুবর্ণত্ব গ্রহণ কর, তাহা হইলে প্রতীকের অভাব হইল। প্রতীক উপাসনায় অভেদ উপাসনা হয় না। অহংগ্রহ উপাসনায় অভেদ উপাসনা হয়।

৫। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অহংগ্রহ উপাসনায় প্রতীকে উপাসনা করিবে না, কিন্তু ইহাও বলা হইয়াছে মন আদি প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি করা যায়। এই সূত্রে বলা হইতেছে যে যাহারা প্রতীক উপাসনা করিবেন, তাহারা মন আদি প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবেন, ব্রহ্মে মন আদি প্রতীক দৃষ্টি করিবেন না। ইহার কারণ বলা হইতেছে যে "উৎকর্ষাৎ" উৎকর্ষ হেতু। নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট-বুদ্ধি ন্যস্ত করিলে, তবেই তাহার উৎকর্ষ লাভ হইবেক, উৎকর্ষ লাভ হইলেই তাহাদের ফল দিবার শক্তি হইবে। মন ও আদিত্য প্রভৃতি প্রতীকই ব্রহ্ম বুদ্ধিতে

উপাস্য, কিন্তু ব্রহ্ম মন ও আদিত্য প্রভৃতি প্রতীক বুদ্ধিতে উপাস্য নহেন। চলিত ভাষায় বলিতে গেলে ছোটকে বড় করিলে লাভ আছে, বড়কে ছোট করিলে লাভ নাই।

আদিত্য ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম, বিদ্যুৎ ব্রহ্ম ইত্যাদি বহু শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একার্থতা অসম্ভব। যেমন গো ও অশ্ব শব্দের একার্থতা নাই, তদ্রূপ আদিত্যাদির ও ব্রহ্মের একার্থতা নাই। যদি বল যেরূপ ঘটকে মৃত্তিকা বলা যায়, তদ্রূপ উঁহাদিগকেও ব্রহ্ম বলা যায়, কিন্তু ঘটের ঘটত্ব না গেলে, আর উহাকে মৃত্তিকা বলা যায় না। সেইরূপ আদিত্যাদির আদিত্যাদিত্ব না গেলে তাহাদিগকে ব্রহ্ম বলা যায় না। আর উহা গেলে আর প্রতীক থাকিল না। মূল কথাই এই যে—উহারা ব্রহ্মবাচী হইল অর্থাৎ পরমাত্মার বোধক বাক্য হইল। যদি সকলই ব্রহ্ম হইয়া গেল, তবে কে কাহার উপাস্য হয়। তাহা হইলে শ্রুতিতে আদিত্যাদি প্রতীকে যে ব্রহ্ম উপাসনার কথা রহিয়াছে, উহার কোন সার্থকতা থাকিল না।

প্রতীক নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞানার্থ। যদি বল ব্রহ্মে আদিত্য বুদ্ধি—এইরূপ হউক না কেন? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে আদিত্যাদিতেই ব্রহ্মদর্শন করিবে, আর তাহার কারণ উৎকৃষ্টতা। ব্রহ্মধ্যানবলে আদিত্যাদিও উৎকৃষ্ট হয়েন, এবং উপযুক্ত ফল প্রদান করেন। নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করিবে—এই লৌকিক ন্যায় শাস্ত্রীয় বিচারে ব্যবহারের যুক্তি কোথায়? সুতরাং উৎকৃষ্ট দৃষ্টির্হি নিকৃষ্টেঽধ্যসিতব্যঃ এই ন্যায় শাস্ত্রীয় বিচারে প্রযুজ্য নহে। যে স্থলে শাস্ত্রার্থই সন্দিগ্ধ, সে স্থলে লৌকিক ন্যায়ের আশ্রয়ে কোন দোষ নাই। আর দেখ—প্রথমতঃ আদিত্য শব্দের প্রয়োগ, তৎপরে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ। শুক্তিকায় রজত বুদ্ধি বলিলে রজতে শুক্তিকা বুদ্ধি যেরূপ বুঝায় না, এ স্থলেও তদ্রূপ। আর ইহার স্পষ্ট প্রমাণও আছে। স য এতদেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেতি উপাস্তে যো বাচং ব্রহ্মেতি উপাস্তে। আদিত্যাদি শব্দ এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত, সুতরাং আদিত্যকেই ব্রহ্ম দৃষ্টিতে উপাসনার ব্যবস্থা। এই উপাসনার ফল কি? ফলদাতা পরমেশ্বর। তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা সুতরাং ফলেরও নিয়ন্তা—যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণুর দর্শন ও উপাসনা, সেইরূপ আদিত্যে ব্রহ্মের দর্শন ও উপাসনা।

৬। ষষ্ঠ সূত্রে বলা হইতেছে যে যজ্ঞের অঙ্গে আদিত্যাদি মতিতে উপাসনা করা উচিত, এবং এইরূপ ব্যাখ্যাতেই শাস্ত্রার্থের উপপত্তি হয়।

য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথ মুপাসীত (ছান্দোগ্য) ইত্যাদি শ্রুতি আছে। যিনি তাপ প্রদান করিতেছেন, তিনি উদ্গীথ (যজ্ঞাঙ্গ প্রণব), এইরূপ উপাসনা করিতে হইবে। ইহাতে সংশয় এই যে—আদিত্য মতিতে যজ্ঞাঙ্গের উপাসনা করিতে হইবে, না যজ্ঞাঙ্গ মতিতে আদিত্যের উপাসনা করিতে হইবে। সিদ্ধান্ত এই যজ্ঞাঙ্গ আদিত্যাদি মতিতে উপাস্য, সেইরূপ উপাসনাতেই শাস্ত্রার্থ উপপন্ন হয়।

পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে আত্মা বা অহং ব্রহ্মজ্ঞানে উপাস্য, এখানেও তদ্রূপ যজ্ঞাঙ্গ আদিত্য জ্ঞানে উপাস্য।

পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মের উৎকৃষ্টতা হেতু আদিত্যে ব্রহ্ম দৃষ্টি কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে। কিন্তু সেরূপ উৎকৃষ্টতা কিছু নাই, তবে বিপরীতভাবে আদিত্যে উদ্গীথ মতি করি না কেন? পূর্ব্বপক্ষ আরও বলেন যজ্ঞাঙ্গ কর্ম্মফল প্রদান করে, সুতরাং আদিত্যে যজ্ঞাঙ্গ মতি করিলে, আদিত্য ফল প্রদান যোগ্য হইবেন।

পূর্ব্বপক্ষ আরও বলেন—এই ঋকই পৃথিবী, সামই অগ্নি ইত্যাদি শ্রুতি দৃষ্ট হয় অর্থাৎ পৃথিবীতে ঋক দৃষ্টি ও অগ্নিতে সাম দৃষ্টি সঙ্গত, কিন্তু ঋকে পৃথিবী দৃষ্টি ও সামে অগ্নি দৃষ্টি সঙ্গত হয় না। কারণ রাজসারথি সূতে রাজজ্ঞান দোষের হয় না, কারণ সূতকে উহা দ্বারা বর্দ্ধিত করা হয়, রাজায় সূত জ্ঞান করিলে, রাজার অপমান করা হয়। পূর্ব্বপক্ষ এইরূপ অনেক তর্ক করিয়া বলেন যজ্ঞাঙ্গ বহির্ভূত আদিত্য প্রভৃতিতে যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি বুদ্ধি নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরার্থ ষষ্ঠ সূত্রের অবতারণা—অর্থাৎ আদিত্য জ্ঞানে উদ্গীথের উপাসনা করিবে, কারণ উহা শাস্ত্রসম্মত। এই সমস্ত উপাসনার ফল মোক্ষ নহে, কর্ম্মসমৃদ্ধি, সুতরাং কর্ম্মাঙ্গ সকল সংস্কৃত হওয়া সঙ্গত। ঐ কর্ম্মাঙ্গ আদিত্য-দৃষ্টি-সংস্কৃত হইলে অপূর্ব্ব বা শুভ অদৃষ্টের উৎপত্তি হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি। বিদ্যা বা জ্ঞান যাহা করে, তাহা শ্রদ্ধায় ও উপনিষদে বীর্য্যবান্ হয়। তবে যদি বল যাহাতে কর্ম্ম-সমৃদ্ধি ফল, তাহাতেই ঐরূপ হউক, অন্যত্র উহা হইবে না। তদুত্তরে বলা যায় যে ঐরূপ স্থলেও উহা করা যায়। শাস্ত্রে আছে—গোদোহনেনাপঃ প্রণয়েৎ। গোদোহন নামক কর্ম্ম প্রধান কর্ম্মের অঙ্গ, অর্থাৎ ঐ অঙ্গ ক্রিয়ার ফল পশু লাভ—উহা প্রধান ফল হইতে পৃথক।

গোদোহনের পৃথক ফল অভিহিত থাকিলেও উহা ক্রিয়াঙ্গের উপকারক হইয়া প্রধান ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ অঙ্গাশ্রিত উপাসনার ও কর্ম্মসমৃদ্ধি অন্যান্য ফলের উল্লেখ থাকিলেও, তাহা স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন হয় না—তাহাও কর্ম্মের অধীন। সুতরাং কর্ম্মফল ও সে সকলের ফল সমান। এ কারণ অঙ্গেরই উপাসনা, আদিত্যের নহে। কিন্তু আদিত্যের মতি চাই। এইরূপ বহুবিধ তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে যজ্ঞের অঙ্গ উদগীথ প্রভৃতিই অঙ্গাতিরিক্ত আদিত্যাদি মতিতে উপাস্য।

৭। সপ্তম সূত্রে বিচার্য্য এই যে উপাসনা দণ্ডায়মান, শয়ান, বা উপবিষ্ট হইয়া করিবে। সিদ্ধান্ত এই যে উপাসনা আসীন পুরুষেই সম্ভবপর।

পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে উপাসনা মানসিক ব্যাপার, তাহাতে শারীরিক নিয়মের প্রয়োজন নাই। খৃষ্টানেরা চেয়ারে বসিয়া উপাসনা করেন, মুসলমানেরা দণ্ডায়মান হইয়া করেন। হিন্দুরা বসিয়া উপাসনা করেন।

উপাসনা কি? উপাসনায় ধ্যানের প্রয়োজন। ধ্যেয়াকারা চিত্তবৃত্তি উত্থাপিত করিতে হইলে গমন চলে না, উহাতে চিত্তের বিক্ষেপ হয়। দণ্ডায়মান থাকিলেও, দেহধারণে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, মনের চঞ্চলতা যায় না। শয়নে নিদ্রা আসে, সুতরাং ধ্যানাত্মক উপাসনায় উপবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ঐ অবস্থায় দেহধারণ কার্য্য করিতে হয় না, নিদ্রারও সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় না।

৮। অষ্টম সূত্রে বলা হইতেছে যে উপাসনায় ধ্যান থাকাতেও আসীন হইয়া উপাসনা কর্ত্তব্য। উপাসনা ও ধ্যান তুল্যার্থ। অঙ্গ সকল স্থির, দৃষ্টি স্থির, এক বিষয়ে চিত্তের অবস্থান, এইরূপ অবস্থাতেই ধ্যানের প্রয়োগ। এবম্বিধ ধ্যান আসীন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

৯। নবম সূত্রে বলা হইতেছে যে অচলত্ব বা নিশ্চলত্বই ধ্যানের একটি লক্ষণ। পর্ব্বত ধ্যান করিতেছে, পৃথিবী ধ্যান করিতেছে—ইত্যাদি আখ্যা অচলত্ব দেখিয়াই দেওয়া হয়। সুতরাং উপাসনা যে উপবিষ্টের কার্য্য, তাহাও ইহা দ্বারা সূচিত হইল।

১০। দশম সূত্রে বলা হইতেছে যে স্মৃতিতেও আসন স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। শুচি প্রদেশে স্থির আসন করিবে। পদ্মক স্বস্তিকাদি ভিন্ন ভিন্ন আসনের ব্যবস্থা আছে, যাহার যেটা সুবিধা সে তাহা করিতে পারে।

১১। একাদশ সূত্রে বলা হইতেছে, উপাসনার পূর্ব্বাদি দিক্, তীর্থাদি দেশ, ও প্রদোষাদিকাল এ সকলের বিশেষ নিয়ম নাই, কিন্তু একটা নিয়ম আছে যে যাহার যে ভাবে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সে সেই ভাবে অনুকূল আসনে উপবেশন করিবে। প্রধান উদ্দেশ্য—একাগ্রতা। বৈদিককার্য্যে এইরূপ নিয়মাদি আছে বটে কিন্তু শাস্ত্রে এরূপ নির্দ্দেশ আছে যে—

সমে শুচৌ শর্করা-বহ্নি-বালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দ জলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুঃ-পীড়নে
গুহা নিবাতাশ্রয়েণ প্রযোজয়েৎ।

উহার মূল উদ্দেশ্য একাগ্রতা। সুতরাং যেরূপে একাগ্রতা হয় সেই অবস্থায় উপাসনা করা যায়।

১২। দ্বাদশ সূত্রে বলা হইয়াছে যে উপাসনার আবৃত্তি আমরণ করিতে হইবে এবং ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে আদিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত উপাসনা করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে কথা হইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই কি উপাসনা পরিত্যাগ করা যায়? এই সূত্রে এই কথারই মীমাংসা করা হইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উপাসনা বলিতেই ধ্যান বুঝাইবে। শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই আছে যে, মৃত্যুকালে যাহার যেরূপ ধ্যান উপস্থিত হইবে, দেহত্যাগের পর সে তদনুরূপ ফললাভ করিবে। স যাবৎক্রতুরয়মস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি তাবৎক্রতুরহমমুং লোকং প্রত্যভিসম্ভবামীতি ইত্যাদি শ্রুতি বলিয়াছেন—যে যাহা ধ্যান করিতে করিতে এই লোক ত্যাগ করে সে তদনুরূপ হয়। গীতায়ও কথিত হইয়াছে "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ।" হে কৌন্তেয়! যে যে ভাব স্মরণ-পূর্ব্বক শরীর ত্যাগ করে, সে তদ্ভাব-ভাবিত হওয়ায় তদনুরূপ দেহ লাভ করে। এই শ্রুতি এবং স্মৃতিতে যে মরণকালের ধ্যান বা জ্ঞান অনুসারে গতিপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে ইহা সবিকল্পক জ্ঞানীর পক্ষে প্রযোজ্য, কারণ তাঁহার জ্ঞান বা ধ্যান অবিচ্ছিন্নধারায় বিদ্যমান থাকে না, মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়। তাহার পক্ষে ঐ জ্ঞানধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য আমরণকাল উপাসনার আবৃত্তি প্রয়োজন। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানীর পক্ষে এ নিয়ম নহে। কারণ তাঁহার জ্ঞান বা ধ্যান সর্ব্বপ্রকার বিকল্প পরিত্যাগ

পূর্ব্বক স্বরূপমাত্রাবশেষ হইয়াছে। সেখানে সেভাবের বিচ্ছেদের ভয় নাই এই জন্যই সবিকল্পক জ্ঞানীর পক্ষেই আমরণ উপাসনার আবৃত্তি বুঝিতে হইবে।

১৩। ত্রয়োদশ সূত্রে উপাসনার পরবর্ত্তী ব্রহ্মজ্ঞানের ফল কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের বিনাশ হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানী উপাসক ভবিষ্যতে পাপে লিপ্ত হন না—শাস্ত্রে এরূপ কথিত আছে। "যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবং বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে"—এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যেমন পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ পুরুষেও পাপকর্ম্ম লিপ্ত হয় না। এখানে ভবিষ্যৎ পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নাই বলা হইল। পূর্ব্বপাপের বিনাশ সম্বন্ধে গীতা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন!
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।

এখানে বলা হইল যেমন প্রজ্বলিত বহ্নি কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অনল সকল পাপ ভস্ম করে। শ্রুতিও এই কথাই বলিয়াছেন "যথৈষিকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়তে এবং হাস্য পাপ্মানম্ প্রদূয়তে।" অনলে যেমন ইষিকা বা শরের তূলা ভস্মীভূত হয় তদ্রূপে জ্ঞানানলে সকল কর্ম্মই দগ্ধ হয়। শাস্ত্রে আরও আছে—

ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

পরাবর পরমাত্মার দর্শন সম্পন্ন হইলে হৃদয়গ্রন্থিভেদ হয়, সংশয়চ্ছেদ হয়, ও সকল কর্ম্মের ক্ষয় হয়।

এখানে যে পূর্ব্বপাপের ক্ষয় কথিত হইল, তাহা সঞ্চিত পাপকর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে পাপকর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে ব্রহ্মজ্ঞানে সে কর্ম্মের বিনাশ হইবে না, ভোগ দ্বারাই প্রারব্ধফল পাপকর্ম্মের সমাপ্তি হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জ্ঞানীর কর্ত্তৃত্বাভিমান বিনষ্ট হয় সেজন্য তাহার পাপপুণ্য কোনও কর্ম্মের ফলভাগিতা ঘটে না। কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিই পাপপুণ্যের প্রসূতি। উহা না থাকিলে পাপও থাকে না, পুণ্যও থাকে না।

১৪। চতুর্দ্দশসূত্রে বলা হইতেছে যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ইতরের অর্থাৎ পুণ্যেরও অশ্লেষ ও বিনাশ সংঘটিত হইবে। সূত্রের 'অশ্লেষ' শব্দ দ্বারা 'বিনাশও' সূচিত হইবে। দেহপাতের পর বিদেহ কৈবল্যের অবশ্যম্ভাবিতা এখানে প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বপাপের বিনাশ

ভবিষ্যৎ পাপের অশ্লেষ অর্থাৎ অলিপ্ততা উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান সূত্রে বলা হইতেছে যে ইহা কেবল পাপ সম্বন্ধে নহে, পুণ্য সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানীর পূর্ব্বপাপ নষ্ট হয়, পরপাপে লিপ্ত হইবার ভয় থাকে না, ইহা যেমন সত্য, তেমনই ব্রহ্মজ্ঞানীর পূর্ব্বপুণ্য বিনষ্ট হয়, আবার ব্রহ্মজ্ঞানের পরে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মেরও ফলভোগ করিতে হয় না। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি"—কর্ম্মের ক্ষয় হইবে, সে কর্ম্ম পুণ্যই হউক আর পাপই হউক। কর্ম্মই মোক্ষের প্রতিবন্ধক, সৎকর্ম্মও বন্ধক, পাপকর্ম্মও বন্ধক, কেহ স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করে আর কেহ লৌহশৃঙ্খলে—এই যা প্রভেদ। সকল কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে মুক্তি হয় না।

১৫। পঞ্চদশ সূত্রে বলা হইতেছে যে অনারব্ধ-ফল কার্য্য অর্থাৎ যে কার্য্যের ফল আরব্ধ হয় নাই তত্ত্বজ্ঞানে তাহারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বস্তুতঃ যে সকল কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সংস্কাররূপে আছে, তাহারাই জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয়। আরব্ধ-ফল কর্ম্ম দেহপাত অবধি বিদ্যমান থাকিবে, দেহপাত পর্য্যন্ত প্রারব্ধ-ফল কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী দেহান্তে বিদেহকৈবল্য লাভ করিবেন। পাপ পুণ্য উভয়ের বেলায়ই এই কথা।

১৬। ষোড়শসূত্রে বলা হইতেছে যে ব্রহ্মজ্ঞানীর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম থাকিবে। শাস্ত্রে বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মজনিত পুণ্যের নাশ হইবে না, এরূপ দৃষ্ট হয়। কর্ম্ম ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। শাস্ত্রে আছে, "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"—প্রত্যহ সন্ধ্যোপাসনা করিবে। ইহা নিত্য কর্ম্ম, এ কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ত্তব্য নহে, কর্ত্তব্য-জ্ঞানে কর্ত্তা ইহা করেন। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক নহে। নৈমিত্তিক কর্ম্ম জাতেষ্টি, পুত্র জন্মিলে জাতেষ্টি নামক যজ্ঞ করিতে হয়। এই যজ্ঞ ফলাকাঙ্ক্ষায় করা হয় না, পুত্র-জন্মই ইহার নিমিত্ত। নিমিত্ত উপস্থিত হইলে শাস্ত্রানুসারে নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে হয়। কাম্য কর্ম্ম এরূপ নহে, ফলাকাঙ্ক্ষায়ই লোকে কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং ঐ কাম্যকর্ম্মই মোক্ষের প্রতিবন্ধক। অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম। উহাতে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না, পরন্তু অগ্নিহোত্রাদি-কার্য্য-পরম্পরায় মোক্ষের সাধন হয়। শ্রুতিতেও এ সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে যে "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" ব্রহ্মজ্ঞানার্থিগণ যজ্ঞ, দান ও অনাশক তপস্যা দ্বারা সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। এখানে যজ্ঞ যে পরম্পরায় মোক্ষসাধন তাহা বলা হইল। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায়

উপদেশ দিয়াছেন যে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না। অনেকে মনে করিতে পারেন যে কর্ম্মের ফল হইবেই। অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল হইবে; সুতরাং কর্ম্মফলের অশ্লেষ হইবে না কেন? উত্তরে বলা হয়—কর্তৃত্ব-বুদ্ধি লইয়া যাঁহারা কর্ম্ম করেন না, তাঁহারা নিজেদের জন্য কর্ম্মের ফল চাহেন না। নিত্য অগ্নিহোত্রের ফল হয় হউক, জ্ঞানী তাহা নিজের জন্য গ্রহণ করিবেন না। কাম্য অগ্নিহোত্রকারী কিন্তু ফল এড়াইতে পারেন না।

১৭। কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের চিন্তায়ই সপ্তদশ সূত্রের অবতারণা।

কোনও কোনও বেদশাখার উক্তিবলে ব্রহ্মজ্ঞানে কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেরও অশ্লেষ বিনাশ হইতে পারে, কিন্তু জৈমিনি এবং বাদরায়ণ উভয়েই বলেন যে এরূপ কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল নহে, সুতরাং নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন আমরণ আবৃত্তি চলিবে, কাম্য অগ্নিহোত্রাদি সম্বন্ধে সেরূপ চলিবে না।

১৮। অষ্টাদশ সূত্রে বলা হইতেছে বিদ্যার সহিত অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রই বলবান্ হইবে, কারণ শ্রুতি বলেন "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।"

অগ্নিহোত্র দুই প্রকার হইতে পারে, উপাসনাযুক্ত ও উপাসনারহিত। উপাসনারহিত অগ্নিহোত্র হইতেও পরম্পরায় ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইবে কিন্তু উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্র হইতে যেরূপ সত্বর ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, ইহা হইতে সেরূপ শীঘ্র হইবে না।

১৯। ঊনবিংশ সূত্রে বলা হইতেছে—যে সকল কার্য্যের ফল আরব্ধ হইয়াছে, সে সকল কর্ম্মের ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ক্ষয় হইবে না, ভোগের দ্বারাই উহাদের বিনাশ হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান অনারব্ধ-ফল সঞ্চিত কর্ম্মই বিনাশ করে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে সকল পুণ্য পাপ কর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে, তাহা ভোগ দ্বারা শেষ করিয়া দেহপাতের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন—মুক্ত হন। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। কর্ম্ম না থাকায় ফলোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। সঞ্চিত কর্ম্মবীজও জ্ঞানাগ্নিপ্রভাবে দগ্ধ হওয়ায় ফলদায়ক হয় না, সুতরাং সর্ব্বকর্ম্ম সমাপ্তি হওয়ায় দেহপাতে বিদেহকৈবল্য লাভ হয়। ওঁ শান্তিঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

দ্বিতীয় পাদ।

প্রথমাধিকরণ। (১) বাঙ্মনসি—দর্শনাৎ শব্দাচ্চ। (২) অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু। দ্বিতীয় অধিকরণ। (৩) তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ। তৃতীয়াধিকরণ। (৪) সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ। (৫) ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ। (৬) নৈকস্মিন দর্শয়তোহি। চতুর্থ অধিকরণ। (৭) সমানা চাসৃত্যুপ ক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য। ৫ম অধিকরণ। (৮) তদাপীতেঃ সংসার ব্যপদেশাৎ। (৯) সূক্ষ্মং প্রমাণশ্চ তথোপলব্ধেঃ। (১০) নোপমর্দ্দেনাতঃ। (১১) অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা। ৬ষ্ঠ অধিকরণ। (১২) প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ। (১৩) স্পষ্টো হ্যেকেষাম্। (১৪) স্মর্য্যতে চ। ৭ম অধিকরণ। (১৫) তানি পরে তথাহ্যাহ। ৮ম অধিকরণ। (১৬) অবিভাগো বচনাৎ। ৯ম অধিকরণ। (১৭) তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যা সামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া। ১০ম অধিকরণ। (১৮) রশ্ম্যনুসারী। (১৯) নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ। ১১শ অধিকরণ। (২০) অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে। (২১) যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তেচেতি।

সূত্রের বঙ্গানুবাদ।

১। বাক্য ও মনে লয় পায় ইহা শ্রুতি ও প্রত্যক্ষদর্শন হইতে স্থিরীকৃত হয়।

২। ঐরূপ হেতুতেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও মনে লয়প্রাপ্ত হয়।

৩। ঐরূপ মনও প্রাণে লীন হয়, উত্তরবাক্য হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।

৪। প্রাণও অধ্যক্ষে অর্থাৎ জীবাত্মায় লীন হয়, কারণ প্রাণ জীবাত্মায় লয়-প্রাপ্ত হয়—এরূপ শ্রুতিবাক্য আছে।

৫। এইরূপ শ্রুতি আছে যে প্রাণসংযুক্ত জীব সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকে অবস্থান করে।

৬। প্রাণসংযুক্ত জীব কোন একটী মাত্র ভূতে অবস্থিতি করে না—ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

৭। প্রদর্শিত উৎক্রান্তিক্রম প্রথমাবস্থায় জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে সমানই;

কারণ জ্ঞানী অর্থাৎ উপাসক (মুখ্য জ্ঞানী নহে) অবিদ্যা দগ্ধ না করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

৮। শ্রুতিতে সংসার ব্যবস্থিত থাকায় সম্যগ্-জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত এই তেজ আদি ভূতপঞ্চকাত্মক সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব থাকিবে।

৯। লিঙ্গাত্মক তেজঃ-শরীর প্রমাণে ও স্বরূপে উভয় প্রকারে সূক্ষ্ম, কারণ সেইরূপেই উপলব্ধ হয়।

১০। সূক্ষ্মতা-নিবন্ধন স্থূল-শরীরের উপমর্দ্দনেও সূক্ষ্ম-শরীর উপমর্দিত হয় না।

১১। উষ্মা যে সূক্ষ্ম-শরীরেরই, তাহা উপপন্ন হয়।

১২। যদি বলা হয় যে পূর্ণ জ্ঞানীর উৎক্রান্তির নিষেধ আছে,—তাহা ঠিক নয়, কারণ শারীর অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না ইহাই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে।

১৩। কোনও কোনও শাখায় শ্রুতিতে স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে যে, দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণ হয় না।

১৪। স্মৃতিতেও ঐরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে।

১৫। ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক পরব্রহ্মেই লীন হয়—একথা শ্রুতি বলেন।

১৬। ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূত-পঞ্চকের যে লয় হয় তাহা অবিশেষভাবেই হয়—শ্রুতি এরূপ বলেন।

১৭। বিদ্যাসামর্থ্য হেতু ও শেষগতির অনুস্মৃতির যোগ বশতঃ জীবাত্মার আবাসের (ওকঃ) অর্থাৎ হৃদয়ের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আলোকিত হয় এবং তদ্দ্বারা বহির্গমনের দ্বার প্রকাশিত হয়, ব্রহ্ম দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া জীবাত্মা শতাধিকা সুষুম্না নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে গমন করেন।

১৮। তৎপরে (জীবাত্মা) সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ করিয়া সূর্য্য-মণ্ডলে গমন করেন।

১৯। রাত্রিতে দেহত্যাগ করিলে সূর্য্য রশ্ম্যনুসরণ ঘটিবে না—এরূপ বলা যায় না, কারণ শাস্ত্রে আছে যে, যতক্ষণ দেহ থাকিবে ততক্ষণ সূর্য্যরশ্মির সহিত সুষুম্না নাড়ীর সম্বন্ধ থাকিবে।

২০। এই যুক্তিবলে দক্ষিণায়নে দেহপাত হইলেও সূর্য্যরশ্মি-পথে গমনের বাধা হয় না অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হয়।

২১। ঐ সমস্ত (উত্তরায়ণাদি-নিয়ম-বিষয়ক) উপদেশ যোগিগণের প্রতিই উপদিষ্ট হইয়াছে। উহা জ্ঞানীর প্রতি নহে। কারণ সাংখ্য ও যোগ স্মার্ত্ত অর্থাৎ স্মৃতি মধ্যে পরিগণিত।

ব্যাখ্যা।

(১) ছান্দোগ্য শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় যে মরণকালে বাক্ মনে লয় হয়; মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, এবং তেজ দেবতায় লয়-প্রাপ্ত হয়। অস্য সৌম্য পুরুষস্য প্রযতো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং। এখানে সংশয় উপস্থিত হয়, যে বাক্ বলিতে বাগিন্দ্রিয় বুঝিব, না বাগ্‌বৃত্তি বুঝিব। বাক্ বলিতে বাগিন্দ্রিয় বুঝি না কেন? কারণ বাক্ বলিতে বাগিন্দ্রিয়ই বুঝায়, সুতরাং মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া, লক্ষণা স্বীকার করিয়া গৌণার্থে "বাগ্‌বৃত্তি" এই অর্থ কেন করিব? সিদ্ধান্ত এই যে বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি অর্থাৎ "কথা বলা" এই অর্থই করিতে হইবে। এই পাদের ১৬শ সূত্রে অবিভাগের কথা আছে। ঐ অবিভাগ পরম দেবতার হয়। এস্থলে যে বাগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের অবিভাগ হয়, তাহা হইলে ঐ সূত্রের কোন প্রয়োজন থাকে না। আর মন বাক্যের উপাদান কারণ নহে, সুতরাং বাগিন্দ্রিয়ের লয় মনে হইতে পারে না। সুতরাং বাক্ অর্থাৎ বাগ্‌বৃত্তি বুঝিতে হইবে। ব্যাবহারিক জীবনে দেখাও যায় যে মরণকালে মনের কার্য্য আছে, অথচ বাক্য বলিবার শক্তি নাই। শ্রুতিতেও উহার প্রমাণ আছে—কারণ বাক্ বলিতে যেমন বাগিন্দ্রিয় বুঝায়, তেমনি বাক্‌বৃত্তিও বুঝায়।

(২) অন্যান্য অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা। অর্থাৎ সে সকল ইন্দ্রিয় মনে লয় হয় না, তাহাদের বৃত্তি সমস্ত মনে লয় হয়। মরণকালে শ্রবণশক্তি নাই, দর্শন শক্তি নাই, বাক্ শক্তি নাই, অথচ মনের ক্রিয়া চলে। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মনোঽনুবর্ত্তন্তে।

(৩) তৃতীয় সূত্রে বলা হইতেছে যে, মনও ঐরূপ প্রাণে লয় হয়। এস্থলেও মনের বৃত্তি বুঝিতে হইবে, মন বুঝিতে হইবে না। সুষুপ্ত এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির মনের ক্রিয়া গেলেও শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষিত হয়।

(৪) চতুর্থ সূত্রে বলা হইতেছে, প্রাণও জীবাত্মায় লীন হয়। শ্রুতি উহার প্রমাণ।

পূর্ব্বপক্ষ বলেন প্রাণ তেজে লয় হয় এই শ্রুতিই আছে—মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং। ওস্থানেত জীবাত্মার কথা বলা

হইল না—সুতরাং এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। উহার উত্তর এই যে বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে যে আত্মানমন্তকালে সর্ব্বপ্রাণা অভিসাময়ন্তি যত্রৈতদূর্দ্ধচ্ছ্বাসী ভবতি। অর্থাৎ অন্তকালে আত্মাতেই প্রাণ প্রবেশ করে।

জীব বহির্গমনে প্রবৃত্ত হইলে মুখ্যপ্রাণ তাহার অনুগামী হয় এবং অন্যান্য প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণও তাহার অনুগামী হয়। "সর্ব্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি।" শ্রুতি বলেন যে জীব মৃত্যুকালে সবিজ্ঞান হয় অর্থাৎ প্রাপ্তব্য ফলানুরূপ ভাবনা ধারণ করে। শ্রুতি বলেন জীবের অন্তরে ঐ সময়ে যে জ্ঞান থাকে তাহাতেই ইন্দ্রিয়গণের লয় হয় সুতরাং প্রাণের লয় জীবাত্মাতেই হয়। তবে "প্রাণস্তেজসি" শ্রুতির সঙ্গতি কোথায় ?

(৫) এই শ্রুতির সঙ্গতি স্থাপন করিতে গিয়াই পঞ্চম সূত্রের অবতারণা। "প্রাণস্তেজসি" ইহার অর্থ এই—প্রাণ-সংযুক্ত জীব তেজঃসহচরিত—দেহবীজ—ভূতসূক্ষ্মে অবস্থিতি করেন।

যদি বল প্রাণের কথাই আছে, প্রাণ-সংযুক্ত জীবের কথা ত নাই। উত্তর এই "জীব" উহ্য আছে। সে কেমন, যদি বলা যায় "রাম কলিকাতা হইতে পাটনায় ও পাটনা হইতে প্রয়াগে গিয়াছিলেন"—এস্থলে কলিকাতা হইতে প্রয়াগে গিয়াছিলেন এ কথা ত বলা যায়। এস্থলে পাটনা উহ্য রহিল।

(৬) প্রাণস্তেজসি—সুতরাং প্রাণই বল বা প্রাণ-সংযুক্ত জীবই বল, তাহাতে একমাত্র তেজঃ দৃষ্ট হইতেছে—অথচ পঞ্চম সূত্রে বলা হইল "ভূতেষু", বহু বচনান্ত পদ হইল এবং উহার অর্থ করিলে তেজঃ-সহচরিত ভূত। অর্থাৎ পঞ্চম সূত্রে ভূতেষু বলিতে তেজঃ-সহচরিত ভূত-সমূহে এই অর্থাৎ কিরূপে কর—সেই জন্য ৬ষ্ঠ সূত্রের অবতারণা। ৬ষ্ঠ সূত্র বলেন যে, জীব একটি ভূতে অবস্থিতি করে না—শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই এই কথা বলেন।

শরীর মাত্রেই অনেক ভূতের বিকার। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ঃ। মনু বলেন—অণ্বোমাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানান্তু যাঃ স্মৃতাঃ তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ। অর্থাৎ পঞ্চভূতের বিনাশী সূক্ষ্মভাগ হইতে সমস্ত জগৎ পরম্পরাভাবে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তেজ বলিতে তেজসহিত সকল ভূতই বুঝাইবে।

(৭) সপ্তম সূত্রে ইহাই বলা হইয়াছে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উৎক্রান্তির কোন প্রভেদ নাই। সংশয় হইতে পারে যে, যখন শ্রুতি আছে, জ্ঞানীর পুনর্জ্জন্ম হয় না, তখন জ্ঞানী কিরূপে পুনর্দ্দেহ লাভের জন্য সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করিবে। অমৃতত্বং হি বিদ্বান্ অভ্যশ্নুতে।

ইহার মীমাংসা এই যে, যেস্থানে বিদ্বান্ অমৃতত্ব লাভ করেন, অর্থাৎ দেহ ধারণের জন্য সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করিয়াছেন বলা হইয়াছে, উহা মুখ্য জ্ঞানীর পক্ষে প্রযোজ্য। যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা দগ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উৎক্রান্তিক্রম একই প্রকার।

অমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য—অদগ্ধ্বাহত্যন্তমবিদ্যাদীন ক্লেশানপরবিদ্যা সামান্যাদাপেক্ষিক মমৃতত্বং প্রেপ্সতে। সম্ভবতি তত্র সৃত্যুপক্রমোভূতাশ্রয়শ্চ। নহি নিরাশ্রয়াণাং প্রাণানাং গতিরূপপদ্যতে। তস্মাদ্ দোষঃ। সগুণ বিদ্যায় অবিদ্যাদি ক্লেশের নিরন্তর উচ্ছেদ হয় না। সুতরাং সগুণ উপাসকের গতি, পথ-আক্রমণ, ও ভূতাবলম্বন সমস্তই আছে। তাহাদের প্রাণ ঊর্দ্ধগামী হয় সুতরাং প্রাণগতি আশ্রয় ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। অতএব সগুণ উপাসকের অমৃতত্ব আপেক্ষিক। এইরূপ বলিলে কোন দোষ থাকে না।

(৮) অষ্টম সূত্রে বলা হইতেছে, যে পর্য্যন্ত পূর্ণ জ্ঞান না হয়, সে পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব থাকে।

"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং" অর্থাৎ তেজ-সহিত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত পরমদেবতায় লীন হয়—ইহার অর্থ ইহা নহে যে উহা পরমদেবতার সহিত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়। উহার আত্যন্তিক বিলয় হয় না। তাহা হইলে ত মরণ হইলেই জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া যায়।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ ;
স্থাণুমধ্যেহনু সংযান্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্।

অর্থাৎ শাস্ত্রের এই আদেশ যে, যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সংসার বিনষ্ট না হয় সে পর্য্যন্ত জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে কেহ জঙ্গমদেহ কেহ স্থাবরদেহ পাইবার জন্য সেই সেই যোনিতে গমন করে। সুতরাং "সংসার" শাস্ত্রে আদিষ্ট থাকায়—পূর্ণ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব থাকে।

(৯) নবম সূত্রে বলা হইতেছে যে, জীব মরণকালে যে সূক্ষ্ম শরীর লইয়া যাত্রা করে, তাহা স্বরূপে ও পরিমাণে উভয় প্রকারে সূক্ষ্ম। পরিমাণে সূক্ষ্ম বলিয়া সঞ্চরণ ও স্বরূপে সূক্ষ্ম, বলিয়া অপ্রতিহত ও অদৃশ্য। রূপ ও স্পর্শ অনুদ্ভূত থাকায় নাম স্বরূপ সূক্ষ্ম। সূত্রে "চ" সমুচ্চয়ার্থে ব্যবহার—অর্থাৎ কেবল প্রমাণতঃ বা পরিমাণতঃ নহে, স্বরূপতঃও বটে। এবং উহাই উপলব্ধ হয়।

জীব শরীর ত্যাগ করিয়া পরলোক গমনকালে তেজ অর্থাৎ লিঙ্গদেহ আশ্রয় করে। সেই লিঙ্গ শরীর স্বরূপে ও প্রমাণে উভয় প্রকারেই সূক্ষ্ম।

পরিমাণে সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার গতির বাধা হয় না, এবং স্বরূপে সূক্ষ্ম বলিয়া তাহা কেহ দেখিতে পারে না।

(১০) দশম সূত্রে বলা হইতেছে যে, সূক্ষ্মতা নিবন্ধন স্থুল শরীরের দাহাদিতে সূক্ষ্ম শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। উপমর্দ্দেন অর্থাৎ দাহাদি দ্বারা।

(১১) একাদশ সূত্রে বলা হইতেছে যে, মানুষ মরিয়া গেলেই তাহার দেহ শীতল হয়, যে পর্য্যন্ত জীব দেহে থাকে সে পর্য্যন্ত উষ্মা অনুভূত হয়। শ্রুতিতেও আছে যে "উষ্ণএব জীবিষ্যন্ শীতো মরিষ্যন্॥"

(১২) দ্বাদশ সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষের সূত্র।

ON CHILD WELFARE.

(BY THE EDITOR.)

On the harmonious growth of the body and the mind of the baby, depends that of the nation, for the baby of to-day is the citizen of tomorrow, and any movement which aims at the betterment of the conditions of Baby-Life, should enlist the sympathy and co-operation of all true lovers of humanity.

The rate of mortality among infants, not only in Bengal but all over in India is appalling indeed, and the movement for the welfare of the babies in India of all classes and creeds on an unsectarian basis has not been started a day sooner. It might have been started earlier in order to prevent millions of preventible deaths among the babies of India. Full many a flower is nipped in the bed, before they can blossom and spread their fragrance all round. All honour and hearty thanks to Her Excellency the Countess of Reading for this philanthropic all-India movement and also to Her Excellency Lady Lytton for all that she is doing for the babies of Bengal.

Man is mortal, but though the individual dies, he longs to live in the species; and that he may thus live, he must have children. Sons and daughters who are to grow into good and healthy citizens capable in their turn of leaving behind them the future forbears of the nation.

The Vedic Rishi used to pray for a life of hundred years. We are not so ambitious and three scores and ten now fulfil the

ideal of the span of human life. Premature deaths we all deplore. No one likes to see a life cut off in its prime nor a life which has just begun.

Let us see how we in Bengal actually stand in respect of longevity. Ordinarily half the children of Bengal die before reaching the age of 8 years and only one quarter of the population reaches the age of 40 years. Have you tears enough to shed for all these sad premature deaths? I know how tender the hearts of our countrymen are, but do they ever think of this horrible rate of mortality?

The average life of an Indian is only 30; it may be less for a Bengali. Call him not a pessimist who sees in these figures the extinction of the fair Bengali race, Hindu and Mahomedan. Jessore fares as one of the worst districts, her population has decreased by about two lacs and twentyfive thousand in the course of the last 40 years, and infant mortality has a share in this deplorable state of things, for in Jessore I find that the rate of infant mortality in 1922 was 15 per cent of the total mortality. Some districts fared worse than Jessore in respect of infant mortality, for in Barisal, a healthy district, the percentage of infant mortality was 24. So though the general health of the district must more or less affect infants, there are other causes at work to account for the high rate of mortality of infants. They are the insanitary condition of the lying-in-rooms, want of medical treatment, insanitary food and drink, and so on.

I shall not enter into details about infant mortality in Bengal, but I request you all to read the Report of the Bengal Public Health Department.

Is it not sad to contemplate that in Bengal nearly one lakh and fourteen thousand children died before they were one month old, and nearly 2 lakhs 40 thousands died before they were one year old in the year 1922.

The rate of mortality is highest among infants, and to infants we should pay the greatest attention.

Every boby is the joint product of its parents, and if parents desire to see their children good and healthy, they must themselves be good and healthy, and mature and fit enough for the responsibilities of fatherhood and motherhood. Children inherit not only the bodily conditions of their parents but their mental conditions also. They inherit both health and disease, vice and

virtue. Some they inherit by blood, some by association. If we only knew that if we, the parents, are immature, our children will be imperfect, if we are vicious in our thought,—and one must be vicious in thought before he can become vicious in speech and deed, our children will inherit our vices, how for the love of our children at least, we would have saved ourselves from vice and sin.

It is therefore of the utmost importance for the growth of a manly race, that parents should be mature and healthy both in mind and body, before they take upon themselves the serious responsibilities of motherhood and fatherhood, Here I can not but advert to the practice of early marriages or betrothals in this country. Early betrothal by itself if not followed by early consummation will not do much harm, but it is early consummation which accounts for the large number of weaklings among us.

The dictum of Susruta, one of the earliest Indian medical authorities, that children born of immature parents will die in infancy and even if they do not die so, will drag on a miserable existence during their short lives, is daily verified by observation and never so vividly inpressed my mind than when a few years ago, I could hardly find one of the requisite chest and height and weight even among a dozen of the would-be recruits of Khulna and Jessore for the Bengali Regiment. For every one that I could accept, I had to reject often more than a dozen.

It would be absurd to expect otherwise. How can you expect a manly race from weak, diseased and immature parents. Observe life in Bengal, both high and low and make up your minds whether you should continue to be the weak race you are or grow into a virile manly race. Food and climate have much to do, but what I have told you just now goes to the root of of the matter.

Every baby when it starts in its earthly career must have that sort of mind and body stuff which properly trained may turn him into an ideal citizen.

We are not here for unborn babies. True, but babies are coming every day, and it will be too late, if we do not direct our attention in time to this vital question which goes to the root of baby welfare.

There was a time when weaklings used to be doomed to death or suffered to die like the old and the infirm, but we ave survived that age, and have learnt to take care even of

the lower animals when they are old and infirm, blind or lame. We cannot therefore shirk our responsibility towards our own helpless infants.

We all love our children, we all like to see our children smile; the smile of a child will unbar even the gate of heaven and admit within it even the banished Pori of the Poet, who searched for a gift dearest to God.

We all love our children, and we love them more the more helpless they are, The infant is the most helpless of our children, and both nature and reason should impel us to take more care of them than we do of our grown up children.

But in spite of Nature and Reason pleading to us, the new helpless infant guest is not unoften the most uncared for in the whole family. This is true not only of the poor, but of the rich also. Superstitions, whose name is legion, children of ignorance stand between us and our darlings, for whose sake the poor mother will sacrifice even her own life. The result is the appalling rate of infant mortality even in healthy localities.

The remedy lies in education. Educate the fathers and what is more necessary educate the mothers. Teach the would-be mother and the *mater familias* what should be done for the mother and what she should herself do for her own sake and for the sake of the precious burden in the womb. Her diet, her work, sleep and rest, should be regulated for the child in the womb which has no separate existence yet.

Then comes the critical moments in every mother's life, when her own life and that of her child are in danger. Nature no doubt is our best midwife, nurse and helper, but man has long ceased to be the mere child of Nature, and extraneous help is often necessary, and we all know how terrible is the suffering of the mother and the child for want of such intelligent help and how a large number of our mothers and infants is claimed by death at the time of delivery. Every would-be mother and every *mater familias* should know something of midwifery.

Then comes nursing, a very delicate and difficult task if it is to be properly done. The health of the mother and the child should be properly cared for. I shall not weary you with details. The lying-in-room, its area, its light and ventilation and dryness, cleanliness of the mother and the child, their food and drink, and hundred other small things, medical help in case of illness, all

these claim our attention and all these should be taught in every household.

A young plant requires more looking after than a robust tree. Poverty and ignorance sometimes combine to bring on disastrous results, but ignorance plays more havoc than even poverty, for rich ignorant families are not found to fare better, I can say from my own experience, than their poor neighbours, who often, when enlightened, manage things in a better way.

We need not imitate our rich European friends in all matters, but should manage everything in a manner suited to our own pecuniary condition. The man who squats on the floor may be as cleanly as one who sits on a chair. All that is needed is that we should know what is what, what is conducive to the welfare of the child and the mother, and what is detrimental to it.

We must look to the purity of food and drink, the cleanliness of the child and the mother, and the attending nurse, the sanitary condition of the lying-in-room and its surroundings, and also should provide for medical help when necessary.

In the matter of the child's food, nature provides for it in the shape of the milk of the mother's breast, and I pity the child which does not get it and the mother who is deprived of the joy and the pleasure of sucking the child ; but this precious heavenly ambrosia is sometimes vitiated owing to the mother's ill health and then the child is to be given some substitute, which is also to be given when the mother has not sufficient milk to feed the child.

This leads me to consider the question of the milk supply, the want of which is one of the cause of ill health of infants. A very large number of our infants do not get sufficient quantity of pure milk and this should receive the consideration of those who have the welfare of children in their hearts,

I have no doubt that you will not rest satisfied with this preliminary ceremony, but do something of a permanent nature for the welfare of the babies, our future parents, The babies of to-day are also the administrators, legislators, poets, philosophers, scholars, merchants, traders, artisans, cultivators, doctors and engineers of to-morrow.

This is a matter in which we all are interested, be we Hindus, Mahomedans or Christians, and if we all combine we can achieve much and bring happiness to many a home, by making there children so many images of health.

None of us live for ourselves alone; whether we know it or not, each one of us has to work for others, and let the babies of the country, our future hopes, also share a portion of our time, energy and money. Even the humblest among us can do something. Our own interest requires that we should do it, for who is not interested in the welfare of the children of his own family?

A healthy and intelligent child is the best gift which a mans makes not only to his own family but to the nation and the state. A poor mother, when asked to show her jewels, pointed to her healthy children and said "there are my jewels." Truly, good children are jewels, not only of the family but of the whole nation. Blessed is the nation which possesses such jewels, but it is these jewels which bring a nation all that a nation wants—its health, wealth and culture. A good healthy child is an asset of the state.

Ancient India had a very high conception of parenthood and of childhood, and parents looked upon their sons and daughters as their saviours in the next world; for it is these sons and daughters, who taking upon themselves, their unfinished duties used to relieve them of their mundane cares at the time of their death and thus enabled them to whole-heartedly devote themselves to the contemplation of the Diety. This idea has found expression in the word পুত্র and পুত্রিকা—son and daughter, literally meaning one who takes up the unfinished work of the father and thereby saves him from mundane anxiety. Every man has a duty to his fellow-man, and when he himself can not do it, he leaves it to his sons and daughters, who are to follow in his steps.

Blessed are those who have good children behind them, for the good of the nation and the state; for the state in order to be a true one, must represent the nation. But in order to do so we must take care of our children from the very cradle, and our responsibility ceases only when they are able to take care of themselves. May God bless your efforts and crown them with success,

সংবাদ ও মন্তব্য।

কলিকাতায় হত্যাকাণ্ড—

বিগত ২৭শে পৌষ শনিবার প্রাতঃকালে চৌরঙ্গীরোড ও পার্কষ্ট্রীটের মোড়ে গোপীনাথ সাহা নামক দ্বাবিংশ বর্ষীয় জনৈক বাঙ্গালী যুবক মিঃ আর্ণেষ্ট জে

নামক জনৈক নিরীহ ইউরোপীয় ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি সাতটী গুলি ছোঁড়ে। যুবকটী গুলি ছুঁড়িয়াই পার্কষ্ট্রীট দিয়া দৌড়াইতে থাকে। তাহাকে ধরিবার জন্য একজন ট্যাক্সি-চালক তাহার অনুসরণ করে, কিন্তু যুবকটী তাহাকে গুলি করিয়া বিশেষরূপে আহত করায় সে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। পথি মধ্যে আর একজন মোটর-চালক যুবকের অনুসরণ করিতে গিয়া ঐরূপ ভাবে আহত হয়। যুবক দৌড়াইতে দৌড়াইতে একখানা প্রাইভেট মোটর দেখিয়া উহাতে চড়িয়া চালককে গাড়ী চালাইতে বলে। সে অস্বীকার করায় যুবক তাহাকেও গুলি করে। এই দুর্ব্বৃত্ত যুবক ওয়েলেস্‌লীষ্ট্রীট দিয়া দৌড়াইয়া রিপণ ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছিলে মিঃ অগ্‌ নামক কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর জনৈক ইউরোপীয় কর্ম্মচারী তাহাকে ধরিয়া ফেলেন।

পুলিশ যুবকের পকেট তল্লাস করিয়া একটী পিস্তল, একটী রিভালভার ও কতকগুলি টোটা পাইয়াছে। যুবকের হস্তে একটী অধিক মূল্যের রিষ্টওয়াচ্ ছিল, পুলিশ তাহাও হস্তগত করে। আহত মিঃ ডেকে প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে লওয়া হয়। সেখানে বেলা ৪॥টার সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি কিলবার্ণ কোম্পানীর আফিসে কাজ করিতেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৩৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। আহত মোটর চালকগণ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নীত হয়। দুইজনের অবস্থা সাংঘাতিক।

হত্যাকারী গোপীনাথ শ্রীরামপুরের পুলিশ থানার নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রমোহন সাহা রোডে বাস করে। বাড়ীতে তাহার বিধবা মাতা ও দুইটী ভাই আছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে সে পড়াশুনা ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। সে হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল।

সে নাকি পুলিশ কমিশনর টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভ্রমক্রমে ডে সাহেবকে হত্যা করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে হাইকোর্টের সেশন সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই দুর্ব্বৃত্ত যুবক অকারণ নিরীহ ডে সাহেবকে গুলি করিয়াছে। এই হতভাগ্য কি মনে করিয়াছিল যে দু চারটী ইংরেজকে খুন করিলেই "স্বরাজ" লাভ হইবে? আজকাল স্কুল কলেজে বা সভাসমিতিতে পুত্রকে প্রেরণ করাও বিশেষ আশঙ্কাজনক হইয়াছে। অপরিণত-বুদ্ধি বালক কোথায় কাহার কুপরামর্শে বিগড়াইয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অভিভাবকগণের বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। হিন্দুধর্ম্মে ফলবান্ বৃক্ষ নষ্ট করিলেও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। মনুষ্য-বধ ত দূরের কথা—অহিংস্র-পশু-পক্ষি-বিনাশেও পাপভাক্ হইতে হয়। ভগবান্ আমাদের পথভ্রষ্ট যুবকগণকে মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করুন।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩০শ বর্ষ, ৩০শ খণ্ড
১১শ সংখ্যা।

ফাল্গুন।

১৩৩০ সাল।
১৮৪৫ শকাব্দাঃ

ব্রহ্মসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ অধ্যায়। দ্বিতীয় পাদ।

(১২) দ্বাদশ সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। দ্বাদশ সূত্রে বলা হইতেছে যে পূর্ণ-জ্ঞানের শাস্ত্রে যে উৎক্রান্তির নিষেধ আছে তাহা ঠিক নয়, কারণ ঐ নিষেধ জীবাত্মা হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না এই মাত্র। কিন্তু দেহ হইতে যে উৎক্রান্তি হয় না এমন কিছু বলা হয় নাই। পরবর্ত্তী সূত্রে এই পূর্ব্ব পক্ষীয় সূত্রের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে সপ্তম সূত্রে সঙ্কেত করিয়া বলা হইয়াছে যে, পূর্ণ জ্ঞানের উৎক্রান্তি নাই। যদিও আত্যন্তিক মুক্তি-স্থলে গতি ও উৎক্রান্তি উভয়েরই অভাব সপ্তম সূত্রে অনুপোষ্য বিশেষণে অবধারিত হয়, তথাপি কোন না কোন কারণে এ অবস্থাতেও উৎক্রান্তি হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা বৃহদারণ্যকে নিম্নলিখিত শ্রুতি দ্বারা বিদূরিত হয়—'অথাকাময়মানো যোঽকামো-নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্যপ্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইতি। অর্থাৎ

সেই অকাময়মান জ্ঞানী অকাম, নিষ্কাম ও আপ্তকাম হয় এবং তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। সে ব্রহ্ম-সত্তা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলীন হয়। ইহাতেই উৎক্রান্তির স্পষ্ট নিষেধ হইল এবং ইহা দ্বারাই স্থির হইল যে ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না।

পূর্ব্বপক্ষ এই সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করেন না। পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে উপরি-উক্ত শ্রুতির দ্বারা শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রান্তির নিষেধ হয় নাই। শারীর বা জীবাত্মা হইতেই উৎক্রান্তির নিষেধ হইয়াছে। তাঁহারা বলেন—শাখান্তরে 'ন তস্য' পদ না থাকিয়া 'ন তস্মাৎ' এইরূপ পাঠ আছে। অর্থাৎ ষষ্ঠী প্রয়োগ না হইয়া পঞ্চমী প্রয়োগ আছে। সুতরাং 'তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না' এরূপ না হইয়া 'তাহা হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না' এরূপ আছে। এস্থলে জীবাত্মারই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে সুতরাং দেহ না বুঝিয়া 'তস্মাৎ' শব্দ দ্বারা দেহী বা জীবাত্মাই গ্রহণীয়। জীবই অভ্যুদয়ের ও মোক্ষের অধিকারী, দেহ নহে, সুতরাং জীবের সহিত তদ্বাক্যের সম্বন্ধ ধরিতে হইবে। অতএব উৎক্রান্তি-কালে প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় কিন্তু জীব হইতে উৎক্রান্ত হয় না; অর্থাৎ জীবের সহিত অবস্থান করে। পূর্ব্বপক্ষের এই সূত্র ত্রয়োদশসূত্রের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে।

(১৩) ত্রয়োদশ সূত্রে বলা হইতেছে যে শ্রুতিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। বৃহদারণ্যক শ্রুতির আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নোত্তরে পাওয়া যায় যে যখন পুরুষ অর্থাৎ দেহ মৃত হয়, তখন ইহা হইতে জ্ঞানের প্রাণ উৎক্রমণ করে কিনা—আর্ত্তভাগের এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'না, উৎক্রান্ত হয় না।' যদি প্রাণ উৎক্রান্ত না হয় জ্ঞানী তবে মরে না, এইরূপ আশঙ্কা প্রতিষেধার্থ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে দেহেতেই তাহার প্রাণ সম্যক লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেহ হইতে যে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, উহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। শ্রুতি এইরূপে দেহে প্রাণ বিলয় হওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া উহা সুদৃঢ় করার জন্যে আরও বলিয়াছেন যে সে দেহ তখন বাহ্যবায়ুর প্রপূরণে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় এবং ভেরীর ন্যায় ঘর ঘর শব্দ করে, এবং তৎপরে প্রাণ-শূন্য হইয়া পড়িয়া থাকে। এই শ্রুতিতে দেহেরই কথা বলা হইয়াছে এবং প্রাণ তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তাহাতেই লয় হয় ইহা বলা হইয়াছে। বায়ু দ্বারা প্রপূরিত হওয়ায় ভেরীর ন্যায় ঘর ঘর শব্দ করা জীব-ধর্ম্ম

নহে, উহা দেহেরই ধর্ম্ম। সুতরাং বুঝা উচিত যে, 'ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি, অত্র ইব সমবনীয়ন্তে' এ শ্রুতিতে অভেদোপচার হইয়াছে। অভেদোপচার বলিতে দেহ ও দেহীর অভেদ বিবক্ষা বুঝায়। প্রদর্শিত কারণে, পঞ্চম্যন্ত পাঠে দেহীর (জীবের) প্রাধান্য থাকিলেও "জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তাহা সেই দেহেই লয় প্রাপ্ত হয়" এইরূপ ব্যাখ্যা করা বিধেয়। [যেষান্তু .... দেহিনঃ] যে শাখায় "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পাঠ আছে, সেই শাখায় কাজেই এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত হইবে যে, জীব হইতে প্রাণোৎক্রান্তির উপদেশ না থাকায় এবং দেহ প্রদেশ হইতে প্রাণগণের উৎক্রান্তি উপদেশ থাকায় উক্ত শ্রুতি জ্ঞানীর সম্বন্ধে সেই সেই পদার্থ হইতে উৎক্রান্ত হওয়া নিষেধ করিয়াছেন। যখনই কোন নিষেধ হয় তখনই বুঝিতে হইবে যে কোন বস্তু পূর্ব্বে স্বীকার করা হইয়াছে তাহাই নিষেধ করা হইতেছে। অজ্ঞানী জীব দেহ-প্রদেশ হইতে উৎক্রান্ত হয় এইরূপ উপদেশ কোন শ্রুতিতে আছে। জ্ঞানীর তাহা হয় না, অর্থাৎ জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না এই বাক্য সেইরূপ শ্রুতি বাক্যের প্রতিষেধক। জ্ঞানীর প্রাণ দেহেই লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন—'চক্ষুঃ হইতে, না হয় মূর্দ্ধা হইতে, অথবা অন্য কোন শরীর প্রদেশ হইতে উৎক্রান্ত হয়। মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে অন্যান্য প্রাণ (ইন্দ্রিয়গণ) তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রমণ করে। এই শ্রুতি ও এইরূপ অন্য শ্রুতি অবিদ্বানের উৎক্রমণ ও সংসারে গতি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পশ্চাৎ "ইতি নু কাময়মানঃ—কামীদিগের এই প্রকার গতি" এইরূপ কথায় অবিদ্বানের কথা সমাপ্ত করিয়া অবশেষে "অথ অকাময়মানঃ—অনন্তর যে নিষ্কামী অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাহার প্রাণ আপ্তকামত্বাদিকারণে উৎক্রান্ত হয় না" ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং উৎক্রান্তি ও গতি বিদ্বানের পক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আত্মা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত। তাহার গতি ও উৎক্রান্তি অসম্ভব।

(১৪) স্মৃতিতেও উহাই বলা হইয়াছে। মহাভারত বলেন—

সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সম্যগ্‌ ভূতানি পশ্যতঃ।
দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য পদৈষিণঃ॥

অর্থাৎ যে সমস্ত ভূতের আত্মা এবং যে ভূত সকলকে সম্যক্ আত্মভাবে দেখে, পদপ্রার্থী দেবতারাও সেই অপদ ব্যক্তির প্রাপ্যপদ-বিষয়ে মোহ-প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহারা সে বিষয়ে জানেন না।

(১৫) পঞ্চদশ সূত্রে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক পরব্রহ্মে লীন হয়। শ্রুতি বলেন যেমন নদীসকল সমুদ্র পাইয়া অস্তগত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মদর্শী পুরুযাশ্রিত ষোলকলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক) পুরুষ প্রাপ্ত হওয়ায় অস্তগত হয়। 'ষোড়শকলাঃ পুরুষায়নাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি।'

(১৬) ষোড়শ সূত্রে বলা হইয়াছে যে কলার লয় হয় তাহা সবিশেষ ভাবে হয় না, অবিশেষ ভাবে হয় অর্থাৎ শক্তিরূপেও থাকে না। বচন অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। কলাসকল অবিদ্যা-মূলক। জ্ঞান হইলে তাহা নির্ম্মূল হইয়া যায়। সুতরাং তাহারা পুনর্জ্জন্মের কারণ হয় না। শ্রুতি বলেন—'ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি' অর্থাৎ সেই সকলের নাম ও রূপ উভয়ই ভাঙ্গিয়া যায় অর্থাৎ থাকে না। তখন পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, এইরূপ অভিধান করা যায়। তখন এই জ্ঞানী নিষ্কল ও অমর হন।

(১৭) পরাবিদ্যার বিচার শেষ করিয়া এইক্ষণে অপরাবিদ্যার বিচার আরম্ভ করা যাইবে। সপ্তমসূত্রে বলা হইয়াছে যে প্রথম অবস্থায় উৎক্রান্তি-ক্রম জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে সমান। এই জ্ঞানী বলিতে যে মুখ্য জ্ঞানী বুঝায় না তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উৎক্রান্তির ক্রম কি তাহা সপ্তদশ সূত্রে বলা হইয়াছে। মৃত্যু সময় মুমূর্ষুর ওক অর্থাৎ আশ্রয়স্থান হৃদয় প্রদেশ প্রথমে জ্বলিত হয়। জীব ইন্দ্রিয়দিগকে লইয়া হৃদয়দেশস্থ নাড়ী মধ্যে আগমন করে, অনন্তর তাহাও জ্বলিত ও প্রদ্যোতিত হয়। পরে জীবের ভবিষ্যৎ ফলের স্ফুরণ হয়। সে ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহার অনুরূপ ভাবনা করে। অর্থাৎ মৃত্যু সময় তাহার ভাবনাময় শরীর হয়। যদি ব্যাঘ্র হইবার কর্ম্ম উত্তেজিত হইয়া থাকে, তবে সে ভাবে আমি ব্যাঘ্র। ঐরূপ সে ভাবে আমি মানুষ বা দেবতা। এইরূপ ভাবনা-বিজ্ঞান বা ভাবিফল স্ফুরণরূপ প্রদ্যোতন উপস্থিত হওয়ার নাম জ্বলন ও প্রদ্যোতন। পরে উৎক্রমণ অর্থাৎ দেহ হইতে বাহিরে যাওয়া। কেহ বা চক্ষু দিয়া, কেহ বা ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া, কেহ বা অন্য স্থান দিয়া বাহির হয়। কোন কোন শ্রুতিতে আছে যে জ্ঞানী মূর্দ্ধণ্য নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হন। হৃদয়াগ্র-প্রদ্যোতন জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই সমান। কিন্তু সেই সময় জ্ঞানীর মোক্ষদ্বার মূর্দ্ধণ্য নাড়ী প্রকাশ প্রাপ্ত হয়—সেই কারণে জ্ঞানী সেই স্থান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়, অজ্ঞানী অন্য স্থান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। এইরূপ হয় বিদ্যা-সামর্থ্য হেতু,

অর্থাৎ জ্ঞানের জন্য। বিদ্যা-সামর্থ্যে তিনি মরণকালে ব্রহ্মরন্ধ্র পথ দেদীপ্যমান দেখিতে পান। শাস্ত্রে আছে যে সুষুম্না নাড়ী ব্রহ্মলোক গমনের পথ। ঐ নাড়ী হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া নাসিকাবৃত্তির মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে শেষ হইয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্র স্থানে তাহার বিবৃত সূক্ষ্ম অগ্রভাগ—সূর্য্যরশ্মির সহিত সমসূত্র সংযোগে সূর্য্য পর্য্যন্ত সংযুক্ত আছে। জ্ঞানী সুষুম্না নাড়ীপথে নির্গত হইয়া সূর্য্যরশ্মির সহিত সূর্য্যলোকে গমন করেন, তৎপরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। জ্ঞানী মরণের পূর্ব্ব হইতেই এই সুষুম্না নাড়ীর অনুশীলন করেন, এবং মরণের সময় ঐ সুষুম্না নাড়ীপথেই বাহির হন। ব্রহ্ম হৃদয়-প্রদেশে উপাসিত হইলে তিনি উপাসককে অনুগ্রহ করেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে জীবাত্মা সুষুম্না নাম্নী নাড়ী দিয়া নিক্রান্ত হন। যাঁহারা এই দহরাদি বিদ্যা অনুশীলন করেন নাই, তাঁহারা শরীরস্থ অন্য স্থান দিয়া নিক্রান্ত হন। হৃদয় প্রদেশে এক শত এক নাড়ী আছে, তাহার মধ্যে সুষুম্না নাড়ী প্রধান। সপ্তদশ সূত্রে এইরূপ ঊর্দ্ধ গমনের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

(১৮) তৎপরে সূর্য্যরশ্মির দ্বারা তিনি সূর্য্যলোকে গমন করেন অষ্টাদশ সূত্রে ইহাই বলা হইয়াছে এবং ইহার ব্যাখ্যা সপ্তদশ সূত্রে করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১৯) ঊনবিংশ সূত্রে বলা হইতেছে যে যতকাল শরীর থাকে ততকাল সূর্য্যের সহিত সুষুম্না নাড়ীর সংযোগ থাকে। সুতরাং রাত্রিতে মৃত্যু হইলেও কিছু আসে যায় না। যেমন শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন দিনে কিরণের অস্তিত্ব দুর্লোক্য, তেমনি রাত্রেও সূর্য্যের রশ্মির লোপ হয় না।

(২০) বিংশ সূত্রে বলা হইয়াছে যে ঐরূপ যুক্তিমতে দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও সূর্য্যলোকে গমনের বাধা হয় না। সাধারণতঃ উত্তরায়ণে মরণ প্রশস্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই কারণে ভীষ্ম মরণের জন্য উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। সাধারণের পক্ষে উত্তরায়ণে মৃত্যু প্রশস্ত কিন্তু জ্ঞানীর কি উত্তরায়ণ কি দক্ষিণায়ন সবই সমান। গীতাতেও দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ আদি মরণের প্রশস্ত কাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং সেই জন্যেই একবিংশ সূত্রের অবতারণা।

(২১) একবিংশ সূত্রে বলা হইতেছে যে, ঐ সমস্ত নিয়ম যোগিগণের প্রতি, কিন্তু জ্ঞানিগণের প্রতি প্রযুক্ত নহে। কারণ সাংখ্য ও যোগ উভয়ই স্মৃতি মধ্যে পরিগণিত। স্মার্ত্ত যোগীরাই ঐ সকল কালে মৃত্যুলাভ করিয়া অনাবৃত্তি

প্রাপ্ত হন। কিন্তু শ্রুত্যুক্ত উপাসনা পরায়ণ ব্যক্তিরা ঐ সকল কালের প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞান-প্রভাবে যখন তখন দেহত্যাগ করিয়াই অনাবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়া এবং নাম মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া স্বদেশে বিদেশে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই মহৎ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, দীনতা জগতে আদর্শ-স্থানীয়। কালক্রমে তাঁহার মাহাত্ম্য অধিগত হইয়া দেশের মুখপাত্র কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার জীবন-চরিত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক স্বজাতীয় বিজাতীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছেন। ইদানীং দিন দিন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি ঐশী ভক্তি ও বিশ্বাসের ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও বিস্তারিত হইতেছে। মোটের উপর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি মহীয়ান্ মান ও পরমপ্রীতি গৌরবের ভাব দিন দিন স্পষ্ট পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আশা করি, ইহা অতি শুভফলপ্রসূ সুলক্ষণই হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বা জীবন-চরিত অপূর্ব্ব। গৌরাঙ্গের রূপ অতুল্য, গুণও অনন্ত। গৌরাঙ্গের শিক্ষা, শক্তি, ভক্তি, প্রেম, ভাব, প্রভাব, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সমস্তই অসাধারণ—অলৌকিক, অনুপম! এই জন্যই গৌরাঙ্গ-চরিত বা লীলার বিবরণ বিশিষ্টরূপে অবগত হইলে, তাঁহার প্রতি ভগবান, অবতার বা মহাপুরুষ বুদ্ধি স্বতই বিকসিত হয়। প্রকাশ্য পরধর্ম্ম-নিন্দুক প্রচারকেরা কষ্ট কল্পনা করিয়া আমাদের নিখুঁত গৌরাঙ্গসুন্দরে কোন খুঁত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সর্ব্বধর্ম্ম-সারশিক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গের চারুচরিত্রে সর্ব্বধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিকগণই মুগ্ধ। সকল

সম্প্রদায়ের লোকই সাম্প্রদায়িক উপাসনার অনুকূল সাধন-শক্তি ও প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন। ভক্তিই ভগবদুপাসনা-সিদ্ধির একমাত্র শক্তি, এ সত্য সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বধর্ম্মের উপাসকগণেরই অবিসংবাদ স্বীকৃত।

এ তত্ত্ব বেদ পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ইঞ্জিলজব্বুর, আবেস্তা মানস্তর ইত্যাদি সর্ব্বধর্ম্ম শাস্ত্রেই একতানে গীত—এক সিদ্ধান্তে সমন্বিত। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই ভক্তির চরম আদর্শ। ভগবদ্ভক্তির যে মূর্ত্তি কোন যুগে যাহা কেহ কল্পনা করিতেও পারেন নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ সেই মূর্ত্তি দেখাইয়া জগৎ মোহিত করিয়াছেন। সামান্য দু'চারি কথায় শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত বিবৃত করা দুঃসাধ্য। মহাপ্রভুর ন্যায় প্রেম-ভক্তির আদর্শ পুরুষ কখনও কোন দেশে কোন যুগে জন্মগ্রহণ করেন নাই। শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি লইয়া শ্রীগৌররূপে শচীনন্দন নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হন্। শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার প্রতিপাদক অনেক শাস্ত্রীয় বচন আছে; যাহা পাঠ করিলে আর তাঁহার অবতারত্বপক্ষে কোনই সন্দেহ থাকে না। যদি কেহ তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার না করেন, তাহা হইলে আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া অবশ্যই তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। যে ভীষণ সময়ে, তান্ত্রিক, তার্কিকদিগের একাধিপত্য কালে, শুষ্ক মরুভূমে শ্রীগৌরাঙ্গ অদম্য উৎসাহে, নির্ভয়চিত্তে ভগবৎ সাধনার প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রেম ভক্তির পীযূষধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেকেই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, এ পক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনিই জগতে অনন্তশক্তিপূর্ণ ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া পতিতোদ্ধারের সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। নামী হতেও নামের মহিমা অধিক, ইহা তিনিই জগতে প্রচার করিয়াছেন। এবং সাধনার অঙ্গ শ্রবণ, কীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির তিনিই পথপ্রদর্শক।

ভগবৎ সাক্ষাৎকার পক্ষে প্রেম-ভক্তিই যে মুখ্য সাধন, এ বিষয়ের শিক্ষকই শ্রীগৌরাঙ্গ। সুতরাং বিদগ্ধ-মাধবের অনর্পিতচরীং এই কথাটি খুব সত্য। সকল ভাবের সার মধুর ভাব, শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐ [illegible] আর কোন ভাবেই ভগবানের সহিত প্রাণে প্রাণে মাখামাখি ভা[illegible] অন্যান্য ভাবে, সখ্য বাৎসল্যাদিতে উৎকট ঐশ্বর্য্য শক্তির বিলাস [illegible]এর প্রতি গৌরবভাব মনে উপস্থিত হয়। কিন্তু রমণের প্রতি সহস্র ঐশ্বর্য্য বিলাস দর্শনেও নায়িকার কখনও গৌরব বা সঙ্কোচ ভাব মনে আইসে না। সিংহ অন্যের নিকট অতি ভয়ঙ্কর হইলেও সিংহীর নিকট স্বীয় রমণ ভিন্ন

আর কিছুই প্রতিভাত হয় না। সুতরাং মধুর ভাবই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রেম বলিতে রূপলালসা বা আসঙ্গস্পৃহাজনিত আসক্তি নহে। উহা সময়ে বিরস ভাব প্রাপ্ত হয়। হইতে পারে, কোন কোন স্থলে আসঙ্গস্পৃহা বা রূপতৃষ্ণা হইতেও ভালবাসা জন্মে। কিন্তু তাহা অতীব বিরল। যেখানে প্রেম জন্মে, সেখানে কোন বিষয়েরই অপেক্ষা থাকে না এবং তাহা অদ্বৈতং সুখ দুঃখয়োরনুগুণং, সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ—সুখ দুঃখে একরূপ, এবং সকল অবস্থায়ই অনুকূল। যেখানে প্রেম, সেখানে কাম বা বাসনা থাকে না, কোনও আদান প্রদানের সম্বন্ধ থাকে না, উহা অপার্থিব। সাধারণ মানবীয় প্রণয় আদান-প্রদান-সম্বন্ধ-মূলক স্বার্থসম্পৃক্ত! ভ্রান্তিবশে অনেকে তাহাই প্রেম মনে করে, বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে। যেখানে প্রেম জন্মে সেখানে কোনও ঘৃণিত ভাব মনে আসাই অন্যায়। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের পরস্পর যে প্রেম, তাহা বিশুদ্ধ ও অপার্থিব এবং কামগন্ধ-শূন্য। যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের লীলা কামকেলি মনে করেন, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র প্রেম মহিমা বর্ণনা পাঠ না করাই উচিত।

শ্রীমন্নন্দনন্দন শ্রীরাধিকার ভাব-কান্তি লইয়া শচীনন্দন রূপে নবদ্বীপরূপ কারা, প্রিয়া-ঋণ পরিশোধনার্থ বরণ করিলেন। আর তাপিত প্রাণ শীতল করিবার জন্য দেশে দেশে দিগ্‌দিগন্তে প্রিয়তমের নাম গান করিয়া ভ্রমণ করিলেন। ভগবানের নিজ সর্ব্বশক্তি স্বীয় অশেষ নামে অর্পণ করিয়াছেন এবং তাহা গান করিবার কোনও কালাকাল নিয়ম করেন নাই। পতিতপাবন শচীনন্দন ত্রিতাপতাপিত কলি-কলুষ-দূষিত-চিত্ত জীবের উদ্ধারার্থ অনন্তশক্তি ভগবানের নাম দেশে দেশে গৃহে গৃহে বিতরণ করিয়াছেন। একা হইবে না বলিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদ শিষ্য সমভিব্যাহারে গগন-তল প্রতিধ্বনিত করিয়া নাম গান করিয়াছেন। শ্রাবণের জলধরবৎ সতত নয়নে গলিত বারিধারা, রোমাঞ্চিত গাত্র, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা, ক্ষণে ক্ষণে হা কৃষ্ণ প্রাণবল্লভ বলিয়া বিলাপ। সে ভাব যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, সে রাতুল-চরণ-রজঃস্পর্শে পূত হইয়াছেন, তাঁহারাই অপুনর্জন্মা মহাত্মা। যাহারা তাঁহার ভগবত্তার বিষয়ে সন্দেহ করে, তাহারা মূঢ়। এ বিষম কলিযুগে ধরিয়া তুলিতে অনেকেই অক্ষম, কিন্তু ঠেলিয়া ফেলিতে অনেকেই সক্ষম। এমত অবস্থায় এত প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া কলির এই সুদীন-সত্ত্ব মানব কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে? তাই দয়াল ভগবান জীবের অবস্থা বুঝিয়াই এমন সুলভ উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রোগ সাংঘাতিক, রোগী এখন তখন, এই সময়

কবিরাজ মহাশয় ঔষধের প্রকাণ্ড ফর্দ্দ দাখিল করিলেই সুপ্রভু। "তাহাতে যে নূন্ আনিতেই পান্তা ফুরায়।" তখন সংক্ষিপ্ত মুষ্টিযোগের আবশ্যক। ভব-ব্যাধি-বৈদ্য ভগবান কলির মুমূর্ষু জীবের জন্য তাহাই করিয়াছেন। হরিনামামৃত-বিন্দু মহামুষ্টি-যোগ সর্ব্বৌষধিসার। আমরাও ভবরোগে এখন তখন! অতএব শুভস্য শীঘ্রং। স্বয়ং কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ বৈদ্যরাজ হইয়া স্বহৃদয়-শুক্তিতে মাড়িয়া স্বভক্তিরসে গুলিয়া স্বপ্রেম-মধুর প্রক্ষেপ দিয়া শ্রীহস্তে কলি-জীব-কণ্ঠে এই মহৌষধ ঢালিয়া দিতেছেন। আমরা শুধু ঢোক্ গিলিতেই "ওক" তুলিতেছি! বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে? যিনি গিলিলেন তিনি উঠিয়া বসিলেন; যিনি না গিলিলেন, তিনি চলিলেন। কাতর রোগীর গলায় ঔষধ ঢালিয়া দিতে হয়, দয়াল গৌরাঙ্গ তাহাই দিয়াছেন। পতিতপাবন অবতার আর এমন হইবার নহে। বঙ্গের মহা সৌভাগ্যবলেই অকৈতব-বন্ধু গুণ-সিন্ধু নবদ্বীপেন্দু নিমাই প্রভু ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন উপাসনা হয় না, এবং উপাসনা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধির জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমতঃ উপদেশ দিলেন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং—চিত্ত-রূপ দর্পণ শুদ্ধির একটি উপায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। সমল দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রতি-ফলিত হয় না, দর্পণখানি অপরিষ্কৃত থাকিলে তাহাতে মনোমোহনের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয় না, এই মহাদর্পণ মনের মোহ-মল মার্জ্জন করাই একান্ত কর্ত্তব্য। সেই মল অপসারণের উপায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাই প্রথম উপদেশ দিলেন। জীব কৃষ্ণদাসস্বরূপ হারানিধি পাইয়া কৃতার্থ হইবে। কৃষ্ণপদ-সেবক-পদই জীবের চরম ও পরম সম্পদ। এই পদ হারাইয়াই জীবের বিপদ। দুশ্ছেদ্য মায়া-শৃঙ্খলভার, ভীম ভবকারাগার, কামাদির অসহ্য অত্যাচার, সুতরাং হাহাকার অশ্রুধার অন্তরে নিরন্তর ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার! এ বিপদে নিস্তারের উপায়ই একমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তন।

তাহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ আর একটী উপদেশ দিতেছেন। ভব-মহা-দাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং।" শাস্ত্রকার মহর্ষিগণ সংসারকে অনেক স্থলে ভবাটবী ভবারণ্য বলিয়া বনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বনের প্রধান বিপদ দাবাগ্নি; তাহাতে বন ও বনবাসী উভয়েরই সর্ব্বনাশ। আমরা বাসনা-বহ্নি-শিখায় অহরহ দহ্যমান; সুতরাং অনল-নির্ব্বাণের জন্য সদাই ব্যাকুল। কে এমন বন্ধু আছে, সে অনল নির্ব্বাণের উপায় দেখাইয়া দিবে? কৈ একজনও তাদৃশ সুহৃদ মিলে না। কিন্তু জীবের অকারণ-বন্ধু, গুণসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের দুঃখে বিগলিত-হৃদয়

হইয়া স্বয়ং শ্রেই অনল নির্ব্বাণের উপায় দেখাইয়া দিলেন। সে উপায় কি—হরিনাম-সংকীর্ত্তন। হরিনাম-সুধারস-সিঞ্চনে ভবের সকল জ্বালা জুড়ায়। ভব-তাপ-প্রতাপ প্রশমিত না হইলে যথার্থ ভগবৎ সেবার অধিকারই হয় না। জ্বালা যন্ত্রণাময় প্রাণ লইয়া কি প্রাণেশ্বরের সেবা করা যায়? তবে কিনা, কালায় প্রাণ দিলে, জ্বালা—সে ত ভবের গলার মালা। বিষয়-বাসনা থাকিতে ভগবানে অহেতুকী ভক্তি হয় না। অহেতুকী ভক্তি ভিন্ন আত্মনিবেদন হয় না। আত্ম নিবেদন ভিন্ন প্রকৃত ভজনও হয় না। অতএব নামামৃত-সিঞ্চনে দাবাগ্নি নির্ব্বাণ না হইলে আত্ম নিবেদন সম্ভবে না, অগ্রে দাবাগ্নি-নির্ব্বাণ করাই কর্ত্তব্য। দাবাগ্নি নির্ব্বাণ হইলে তখন মন স্থির হয়, শান্ত হয়। তার পর শ্রীগৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আর একটী শক্তি দেখাইতেছেন। শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং।” যোগ শাস্ত্রাদিতে চন্দ্রের স্থান ভ্রূযুগ মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনস্থানও তথায় নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই মনশ্চন্দ্র অবিদ্যা মেঘাবৃত, তখন তাহার কিরণ সুধা বর্ষণ ও কুশলকুমুদহর্ষণ উভয় কর্ম্মই স্থগিত। ফলে, আমাদের মনটি মোহ-মেঘমুক্ত দিব্য প্রভাযুক্ত না হইলে, আর কুশলের আশা নাই। রোগ শোক জরা মৃত্যুময় সংসারে মঙ্গল কোথায়? যে ভাগ্যবান্ ভগবদ্ভক্ত জগতের প্রতি কার্য্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গলহস্ত দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত শ্রেয়ো লাভের অধিকারী। সাধুর জীবন মৃত্যু সমান। এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে চিররক্ষা করাই শমন দমন নহে। অল্পায়ুতেই ভগবদ্ভক্তের আক্ষেপ কি?

পাঁচ দিনো বাঁচা ভাল কৃষ্ণ-ভক্ত হয়ে।
বিফল অভক্ত হয়ে কোটি কল্প রয়ে॥

প্রকৃত দীর্ঘ-জীবিত্ব কাল-গত নহে, উহা কার্য্যগত। কুশলাকুশল যাহাই হউক নিত্য চিত্ত-প্রসন্নতাই সর্ব্ব মঙ্গল-প্রতীতির পরিণাম। উহা শুদ্ধ সত্ত্বগুণের ফল। সত্ত্বগুণ চন্দ্র কিরণবৎ প্রকাশক, অথচ সুস্নিগ্ধ। অতএব মনই চন্দ্র, সত্ত্বগুণ তাহার কৌমুদী, চিত্ত-প্রসন্নতা সেই কৌমুদীর বিমল বিভা। সেই বিভায় কুশল-কুমুদের বিকাশ। সুতরাং মঙ্গলময় চন্দ্র-কিরণ লাভ করিতে হইলে, চন্দ্র মেঘমুক্ত হওয়া আবশ্যক। চন্দ্রকে মেঘমুক্ত করিবার উপায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভুরই অভিপ্রেত এইরূপ উপদেশোক্তি দৃষ্ট হয় যথা—

শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার?
কৃষ্ণ ভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর।

অতএব এই যে সর্ব্ব শ্রেয়ঃ সার সুদুর্লভ কৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্গ, তাহাও কৃপায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনরত ব্যক্তির সুলভ হয়। যেখানে ফুল ফুটে, সেখানেই মধুকর যোটে। যেখানে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, সেই খানেই কৃষ্ণভক্ত-সমাগম। অতএব একমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই শ্রেয়ো লাভের হেতু। শ্রীগৌরাঙ্গের আর একটী মহোপদেশ যথা—"বিদ্যাবধূজীবনং।" এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ। বিদ্যা অর্থে জ্ঞান বুঝায়, এখানে তত্ত্ব জ্ঞান অর্থ বুঝিতে হইবে। বধূর জীবন-সর্ব্বস্ব তাহার প্রাণবল্লভ; পতি বিনা নারী সলিল-ছাড়া মীনের ন্যায় হয়, সুতরাং সতীর পতিই জীবন তুল্য। এখানে তত্ত্বজ্ঞানরূপা বধূর জীবন তুল্য কি? না, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয় না, সেই চিত্তশুদ্ধির প্রধান সাধন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। সুতরাং চিত্ত ব্যতীত যখন তত্ত্বজ্ঞান বাঁচে না, আবার নাম-কীর্ত্তন ব্যতীত চিত্ত শুদ্ধ হয় না, তখন বেশ প্রতীতি হইতেছে যে, হরিনাম কীর্ত্তনই তত্ত্বজ্ঞান-রূপা বধূর জীবন-স্বরূপ। মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন যে, হরিনাম মহামন্ত্র, স্বতই জীবন্তু জাগ্রত, নিত্য শুদ্ধ সাধিত; এমন কি গুরু-দীক্ষা-নিরপেক্ষিত। এই তারক মন্ত্র সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে আরাধ্য। দীক্ষা-পদ্ধতিতে দেখা যায় প্রথম হরিনাম কর্ণে না দিলে দেহ শুদ্ধ হয় না। সুতরাং হরিনাম মহামন্ত্র সকলেরই আরাধ্য, জপ্য ও সেব্য। এ মন্ত্র নিত্য সিদ্ধ, স্বতঃ সাধারণ ইষ্ট তত্ত্ব। ইহাতে গুরুকরণ ও পুরশ্চরণাদিরও অপেক্ষা নাই। চৈতন্য-চরিতামৃতে দেখিতে পাই, যথা—দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে। নামের মাহাত্ম্যে সর্ব্ববীজই সজীব হয়। কৃষ্ণ নামে মরা বৃন্দাবন বাঁচিয়াছিল, এই নামে মরা বাঁচে। এ নাম জগৎ-জীবন, বিশ্ব-রসায়ন। নামের গুণে আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠে। শ্রবণে, কীর্ত্তনে, পঠনে, স্মরণে, মননে, সর্ব্বাবস্থায়ই নামে আনন্দ। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং নামানন্দের অম্বুধি, তাঁহার উচ্ছ্বাসে একদিন সমগ্র ভারত প্লাবিত হইয়াছে। আজিও সে প্লাবন-তরঙ্গের প্রসার প্রশমিত হয় নাই। ধীরগতিতে ক্রমে জগৎ ব্যাপ্ত হইতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-সাগর-তরঙ্গাঘাত বিশ্বরাজ্যে সর্ব্বত্র প্রতিহত হইয়াছে। এক্ষণে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইতেছে। নিরাকার সাকার সর্ব্ববিধ উপাসক-সম্প্রদায় মধ্যে প্রভাব-বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ জগতের অনন্য-সাধারণ উপকার করিয়াছেন। জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহা বিস্মৃত হওয়ায় মায়া গলায় ফাঁস পরাইয়াছে। জীবের নিত্য কৃষ্ণ-দাসত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়া

অমৃত-তত্ত্ব লাভের উপায় প্রদর্শনার্থ, মহাপ্রভু নিজগুণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবানই যে, জীব-জীবনের সর্ব্বস্ব এবং উহাই যে সর্ব্বদর্শন সারতত্ত্ব ইহা সহজভাবে মানবকে বুঝাইবার জন্য নিজে কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। শতজন্ম ধরিয়া শুকপক্ষীবৎ শাস্ত্র বচন পাঠ করিলে তাহাতে কি ফলোদয় হইবে? নীরস পাণ্ডিত্যে কিছু অর্থার্জ্জন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে এক কপর্দ্দকও আত্মার হিত হইবে না। লোকে বলে আপন ভাল পাগলেও বুঝে; সেই প্রকৃত ভাল কিসে হয় তাহাই বুঝা মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। পথভ্রান্ত অন্ধ জীব, যখন বিপথে যাইতে থাকে সদ্গুরু, কৃপাপরবশ হয়ে এসে হাত ধরে সৎপথে লয়ে যান। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের সেইরূপ পরম হিতৈষী গুরু। এজন্য মানব মাত্রেই তাঁহার চরণতলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। বৈরভাব পরিহার করিয়া শুধু মিত্রভাবে সুহৃদভাবে জগতের হিত সাধনা করাই গৌরাঙ্গ অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, তিনি নিজে কাঁদিয়া জগৎবাসীকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন, এখনও সবাই কাঁদিতেছে। এমত শ্রেষ্ঠ অবতার আর হইবার নহে। তাঁহাকে যাহারা ঈশ্বরজ্ঞানে ভজিতে অনিচ্ছুক, তাহারা মূঢ় ও ভ্রান্ত।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দীর্ঘকাল পুরুষোত্তমে কালযাপন করেন, তথায় তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশ-রত্নাবলী অধিকাংশই প্রচারিত হয় এবং তাঁহার নাম-যজ্ঞ বহুলরূপে তথায়ই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণে আত্মীয়, পর, স্বজন বান্ধব, এমন কি বিজাতীয় নর-নারীও অশ্রু-সংবরণ করিতে পারে নাই। বিষ্ণু-প্রিয়া ও শচী মাতার শোকের বন্যায় সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধদেবের হৃদয় ও শঙ্করাচার্য্যের মনীষা যুগপৎ গৌরাঙ্গাবতারে সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। তিনি তর্ক-প্রভাবে কোনস্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন নাই, প্রেমের গুণেই জগৎ বশীভূত করিয়াছিলেন। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠগুণে মানব বাধ্য হয় কি না, তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল শ্রীগৌরাঙ্গ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে, তপস্যা, জ্ঞান, যজ্ঞ প্রভৃতি ভগবৎ সাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়া কথিত ছিল, এই ভীষণ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র ভগবৎ সাক্ষাৎকারের প্রধান উপায়। আমরা নামীকে পাই না, নামই পাই; নাম ও নামীর অভেদ, অচিন্ত্য-শক্তি ভগবানের নামও অচিন্ত্য মহিমাশালী। স্বয়ং নামী নামময় হইয়া পতিত জনোদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন। নাম-মাহাত্ম্য, যাহারা স্তুতিবাদ বলিয়া মনে করে বা মিথ্যা মনে করে, তাহাদের নরক-নিস্তারের উপায়ান্তর নাই।

পরের কথা নহে, স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়া নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। ভবসাগর-পারের তরি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তিনখানি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। "এবং যোগা ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।" মনুষ্যদিগের মঙ্গল-কামনায় আমি এইরূপ ত্রিবিধ যোগ, অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বলিয়াছি। এ যুগে আর দুখানি তরি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পারের অনুপযুক্ত। এ যুগে একমাত্র শেষোক্ত অর্থাৎ ভক্তিরূপ তরিখানিই পারের প্রকৃত উপযোগী, ইহাই ভগবান শচী-নন্দন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমত দয়াল প্রভু আর হইবে না।

যবন হরিদাসের জীবনী পাঠ করিলে নামের কি অদ্ভুত শক্তি তাহা সবাই জানিতে পারেন। স্বয়ং নামকীর্ত্তন, নাম জপ, নাম-গুণ-শ্রবণ কিছুদিন করিলে সবাই নামের শক্তি বুঝিতে পারেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান, যোগ প্রভৃতি সাধনে চ্যুতি-ভয় পতনাশঙ্কা আছে। ভক্তিপথে কোনও আশঙ্কা নাই, সমধিক কঠোরতাও নাই। ক্ষীণশক্তি, অন্নগত প্রাণ, অল্পায়ু কলির জীবের পক্ষে এমত সুগম পন্থা আর হইবার নহে। এই সার শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ভগবান শচীগর্ভে নবদ্বীপ-চন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবন্নাম-তত্ত্ব হিন্দু-শাস্ত্র-কল্প-ভাণ্ডারের মহোজ্জ্বল মণি। "হরের্ণামৈব কেবলং" হরির নামই কেবল সার সর্ব্বস্ব। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত এই মহাবাক্য হিন্দু অহিন্দু উপাসক মানব মাত্রেরই স্বাধিকারভেদে সাধ্য, আরাধ্য। তবে কিনা নাম ও নামীর অভিন্নত্ব, নামের সঙ্গে রূপ-গুণ-লীলার অপূর্ব্ব মিলনতত্ত্ব হিন্দু শাস্ত্রের অদ্বিতীয় বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বই যে কলির জীবের আশা ভরসার অনন্য অবলম্বন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহাশক্তিময়ী শিক্ষায় এ সত্য ভারতবক্ষে প্রকৃষ্টরূপেই পরীক্ষিত ও প্রচারিত হইয়াছে। যাহা হউক, আর প্রায় সর্ব্বত্রই নাম কেবল নামীর স্মারক, পরিচায়ক চিহ্ন বা সঙ্কেত মাত্র। সুতরাং নাম হিন্দু-সাধকের সর্ব্বস্ব। প্রস্থান-ভেদে হিন্দুর প্রতি ইষ্ট নামের কত প্রতিনাম। শত নাম সহস্র নাম বর্ণিত আছে। সিদ্ধ মন্ত্রাত্মক সর্ব্বনামেই স্বীয় সর্ব্বশক্তি সহ অবতারিত। অতএব প্রত্যেক নাম এক একটি অবতার। ইহার সর্ব্ব নামাবতারেই ঐশ্বর্য্য শক্তি প্রকটিত। আধ্যাত্মিক ইষ্টসাধন ত দূরের কথা, বৈষয়িক ইষ্ট সাধনেও বিষয় ভেদে নাম ভেদ ব্যবস্থা আছে। "ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং" ইত্যাদি। বিভিন্ন অঙ্গ রক্ষার্থেও বিভিন্ন নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। "শিরো মে চণ্ডিকা পাতু, কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী" ইত্যাদি। গুহ্যাতিগুহ্য আম্নেষ্ট-সাধন তন্ত্রেও নাম-ভেদ-রহস্যের অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম লীলা প্রকাশিত

নামে সৃষ্টি স্থিতি লয়, নামে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়,
নাম হয় মরণ-হরণ।
নামে আশা পাশ খসে, পিয়ে নাম সুধা-রসে,
গায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ।

আর চাই কি? কৃষ্ণ-নাম-কল্পতরুমূলে কাঙ্গাল হয়ে আঁচল পাতিতে পারিলেই দেবদুর্লভ সুধা-ফলটী মানবের ভাগ্যে সুলভ হইতে পারে। যে না পারে তাহার দুর্ভাগ্য। নাম নামীর অভিন্নতা, সুতরাং নামেই সাধন, নামই সাধ্য। এই সাধ্য সাধনের মিলন জনিত সুবিধাটী স্বতঃ সুদীন কলির জীবের পক্ষে মাহেন্দ্র যোগ। দুর্ভাগ্যবশে তাহাতে বঞ্চিত হওয়া যে কি দুঃখ, তাহা আমরা বুঝিলাম না। জীবের এই দুঃখ ভাবিয়াই গৌরাঙ্গ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। আর তৎ প্রতিবিধানার্থ সাধ্য সাধনের অভেদ-রহস্য ভেদ করিয়া এই সুপ্রশস্ত ও সুগম নাম-সাধন পন্থা দেখাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-হৃদয়-রত্ন-স্বরূপ হরি-নাম-চিন্তামণি গ্রন্থে কথিত আছে, "যেইত সাধন সেই সাধ্য যবে হৈল। উপায়, উপেয় মধ্যে ভেদ না রহিল। সাধ্যের সাধনে আর নাহি অন্তরায়। অনায়াসে তরে জীব নামের কৃপায়।" নামে ভগবানের সর্ব্বশক্তি সমর্পিত, ইহা স্বয়ং মহাপ্রভুর স্বমুখের সাক্ষ্য। কলির জীবের জন্য ভগবান যাহা করিয়াছেন, স্বয়ং কলিযুগ-পাবনাবতার হইয়া সেই ভগবানই তাহা প্রচার করিতেছেন। ভগবদ্ভজন বিষয়ে ভগবন্নাম মহিমায় এমন সত্যপূত সাক্ষ্যও আর সংসারে মিলিবে না। নামের মহীয়সী শক্তি সম্বন্ধে মহাপ্রভু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"এক নামাভাসে তব পাপ দোষ যাবে। আর নাম লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে।" হেলায়, খেলায়, অপ্রেমে উপেক্ষায় গৃহীত নামেরও পাপ-বিনাশিনী ও সদ্‌গতি-দায়িনী শক্তি আছে। তবে, নামাপরাধ-শূন্য হইয়া সাধন করিতে পারিলে, সেই নামের শক্তিতে প্রেম-ধন লাভ হয়।

(ক্রমশঃ)

সেবা-ধর্ম্ম।

লেখক—সম্পাদক।

কোন সভায় মহাত্মা গান্ধীকে অভিনন্দিত করিবার সময় অভিনন্দন-দাতা বলিয়াছিলেন যে মহাত্মা গান্ধী বৈশ্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেও তাঁহাতে ক্ষত্রিয়ের

তেজ ও ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা দৃষ্ট হয়। উত্তরে মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে তিনি শূদ্রের ধর্ম্ম সেবা-বৃত্তির অনধিকারী কিসে হইলেন? বস্তুতঃ সেবা-বৃত্তি কি কেবল শূদ্রের ধর্ম্ম? বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ সকলেরই সর্ব্বাগ্রে সেবাধর্ম্মের পূর্ণ অধিকারী হওয়া চাই। এই বিশ্বে সেবা অপেক্ষা মহত্তর বৃত্তি বোধ হয় আর নাই। আমাদের গর্ভধারিণী জননীই আমাদিগের প্রথমা ও প্রধানা সেবিকা এবং সেই জননীই সর্ব্বাপেক্ষা এমন কি পিতা অপেক্ষা পূজনীয়া। যে ব্যক্তির জীবনে কোন না কোন প্রকার সেবা নাই সে জীবিত থাকিলেও মৃতবৎ। সেবাই মনুষ্যকে জীবন প্রদান করে। এ জগতে কেহ সেবা না করিয়া জীবিত থাকিতে পারেন না। কোন না কোন প্রকারে তাঁহার সেবা করিতেই হইবে। পিতা পুত্রকে সেবা করেন, পুত্র পিতাকে সেবা করে। গুরু শিষ্যকে সেবা করেন, শিষ্য গুরুকে সেবা করে। এরূপ পরম্পরা সেবার উপরই এ বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যে পরসেবা আত্মসেবার নামান্তর মাত্র। এই বিশ্বে কেহই একা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। নিজ পরিবার, স্বগ্রাম, স্বদেশ, এমন কি পরদেশ—সকলের সেবা-সমষ্টি দ্বারাই নিজে জীবিত রহিয়াছি। ঐ সেবা ব্যতীত আমার জীবিত থাকার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পরসেবাই আত্মসেবা। আর আত্মসেবা না হইলেও পরসেবা হয় না। কারণ নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারিলেও পরসেবা হয় না। এই বিশ্বে প্রতিবস্তু অপর বস্তুর সেবা দ্বারা বৰ্দ্ধিত হইতেছে। বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বকে এমনিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন যে, ইহার প্রত্যেক অংশের শুভাশুভ অপরাংশের শুভাশুভের উপর নির্ভর করে। সেবাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। হঠাৎ কোন ব্যক্তি জলমগ্ন হইলে তুমি সমর্থ হও বা না হও, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি সচেষ্ট হও। স্বভাব বিকৃত না হইলে কেহ পরদুঃখে সুখী হইতে পারে না। পরদুঃখে সুখী হওয়া বিকৃত স্বভাবের লক্ষণ। আজ যে তুমি এত বড় হইয়াছ সে কেবল বহু ব্যক্তির সেবা দ্বারা। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী, গুরু, চিকিৎসক, ভৃত্য, বন্ধু ইত্যাদি বহু লোকের সেবা দ্বারা তুমি বৰ্দ্ধিত হইয়াছ। ভগবানের বিধানে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র আদিও তোমার সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। কতশত পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা-গুল্ম তোমাকে সেবা করিয়া বৰ্দ্ধিত করিয়াছে। জল, বায়ু, মৃত্তিকা কেহই তোমাকে তাহাদের সেবা হইতে বঞ্চিত করে নাই। তোমারও প্রকৃতি অপরের সেবা করা এবং যাহাতে তোমার সেই স্বাভাবিক বৃত্তি বিকৃত না হয়

তজ্জন্য সর্ব্বদা তোমাকে সতর্ক থাকিতে হইবে। বস্তুতঃ এই জগতে কেহ কাহারও প্রভু নহে, পরন্তু সকলেই সকলের সেবক। ভগবানকে যে আমরা সেবা করি, সে সেবা দ্বারা আমরাই উপকৃত হই; ভগবানের কোন সেবার প্রয়োজন নাই কিংবা তাঁহার কোন উপকার হয় না। জীবের সেবাই ভগবানের মুখ্য সেবা। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ঐ যে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র পরিদর্শন করিতেছ, উহারা সকলেই এ বিশ্বের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। তুমিও উহাদের ন্যায় বিশ্বের সেবা করিয়া যাও, চাই বিশ্ব উহা জানুক বা না জানুক, উহা বুঝুক বা না বুঝুক। পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, পর্ব্বত অরণ্য, নদী সরোবর সকলেই বিশ্বের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। যদি প্রকৃত মানুষ হইতে চাও, তাহা হইলে নীরবে উহাদের ন্যায় সেবাধর্ম্ম অবলম্বন কর। ঐ যে অগ্নি তাপ দিতেছে, ঐ যে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ঐ যে সূর্য্য কিরণ দিতেছে, ঐ যে নদী বহিতেছে, ঐ যে বৃষ্টি পড়িতেছে, উহারা সকলেই নীরবে বিশ্বের সেবা করিতেছে। সেবা করিবার জন্য নিজে বড় হইবার দরকার নাই। ঐ যে অর্দ্ধক্রোশ-ব্যাপী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ যেমন সহস্র সহস্র পশুপক্ষীকে আশ্রয় দান করিয়া তাহাদের সেবা করিতেছে, সেইরূপ ক্ষুদ্র তুলসীও জগতের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ক্ষুদ্রই হও, মহৎই হও, সব সময় জগতের সেবায় নিরত থাক। কুটীরেই বাস কর, প্রাসাদেই বাস কর, সেবা হইতে কখনও বঞ্চিত হইও না। আর সেবা, ক্ষুদ্রই হৌক, মহৎই হৌক, সাধ্যানুসারে কোন সেবাই উপেক্ষা করিও না। সুযোগ পাইলেই পরের সেবা করিবে। পিপাসার সময় এক গ্লাশ জল দিয়া যে সেবা করা যায়, তাহার মূল্য রজত-কাঞ্চন অপেক্ষাও অধিক। বিপদের সময় সামান্য একটু উপদেশ দ্বারা যে পরোপকার করা যায়, অনেক সময় তাহার মূল্যের পরিমাণ করা যায় না। মনে করিও না যে তুমি কোন প্রকার সেবা করিবার অনুপযুক্ত, কারণ এই বিশ্বে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক একটী সেবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তুমি অক্ষম, তুমি নির্ব্বোধ, তুমি দরিদ্র, তুমি মূর্খ, তুমি কিছুই করিবার উপযুক্ত নও, এই জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিও না, অন্ততঃ তুমি পথের কণ্টক দূর করিয়া পথিকের ক্লেশ নিবারণ করিতে পার। যদি ধনী হও, ধনের দ্বারা পরসেবা কর। যদি জ্ঞানী হও, জ্ঞানের দ্বারা পরসেবা কর। যদি চিকিৎসক হও, চিকিৎসার দ্বারা পরসেবা কর; যদি চিকিৎসক না হও, অন্ততঃ রোগীর শুশ্রূষা দ্বারা পরসেবা কর। শরীর, বাক্য, মন, এ তিনের দ্বারাই পরসেবা

করা যাইতে পারে। সদুপদেশ, সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা পরের সেবা করা যায়। অন্য কোন প্রকারে সেবা করিতে না পারিলেও মনে মনে পরের মঙ্গল চিন্তা করিয়াও পরের সেবা করা যায়। পরহিত-চিন্তা যে কি অপূর্ব্বভাবে জগতে হিতসাধন করে তাহার রহস্য সকলে অবগত নহেন। কিন্তু এই বিশ্বে একের চিন্তা অলক্ষ্যভাবে অপর ব্যক্তির জীবনে যে ক্রিয়া করে, এটী অকাট্য সত্য। পরের সেবা করিবে, কিন্তু যখন সেই সেবার বিনিময় তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে, তখন আর সেবা সেবা থাকিবে না। তখন উহা বণিকের মূল্য লইয়া পণ্য-বিক্রয়ের ন্যায় হইবে। সেবাই মানুষকে মহীয়ান্ করে। নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতমের সেবকই প্রভুরূপে পূজিত হয়েন। ঐ যে চৈতন্য, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, প্রভৃতি জগতের প্রভু হইয়া রহিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে তাঁহারা নীচ হইতে নীচতমের সেবক ছিলেন।

প্রজারঞ্জক রাজাই রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সেবক। পিতাই পরিবারের মধ্যে প্রধান সেবক এবং মাতাই প্রধান সেবিকা। সেবক না হইয়া কেহ প্রভুপদ লাভ করিতে পারেন না। সেবাধর্ম্ম পরিচর্য্যা না করিয়া কেহ কখনও দেবত্বের আস্বাদ পাইতে পারেন না। সেবাধর্ম্ম ব্যতীত কেহ কখনই স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারেন না। সেবা দ্বারাই বিশ্ব ও বিশ্বনিয়ন্তার সহিত তন্ময়ত্ব জন্মে। সেবাই অশান্তির স্থানে শান্তি, দুঃখ স্থানে আনন্দ এবং দরিদ্রতা স্থলে সচ্ছলতা আনয়ন করে। সেবাধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রভুর শত্রু আছে কিন্তু সেবকের শত্রু নাই। প্রভু হইতে চাহিলে সেবকেরও সেবা করিতে হইবে। গুরু হইতে চাহিলে শিষ্যেরও সেবা করিতে হইবে। পত্নীর যেরূপ পতিসেবা আবশ্যক, পতিরও সেরূপ পত্নীসেবা আবশ্যক। পুত্রের যেমন পিতার সেবা আবশ্যক, পিতারও তেমন পুত্রসেবা আবশ্যক। জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সেবাধর্ম্ম মুখ্য ধর্ম্ম করিতে পারিলে জগতে অশান্তি থাকিতে পারে না। সেবকের চিত্তে কখনও ভয়ের উদয় হয় না। যেখানে স্বার্থ, সেখানেই ভয়; সেবাধর্ম্মে কোন স্বার্থ নাই, সুতরাং ভয়ও নাই। সেবার দ্বারাতেই নিঃস্বার্থ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যত্র কেবল বণিকের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয়। আমরণ সেবা করিয়া যাইবে এবং উহাতেই শাশ্বত শান্তি প্রাপ্ত হইবে।

অতিথি সেবা, দেব সেবা, সাধু-সেবা, ব্রাহ্মণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা, গো-সেবা ইত্যাদি বহুবিধ সেবা সমাজে প্রচলিত আছে। এই সমস্ত সেবা যদি প্রকৃষ্ট-ভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সমাজের মঙ্গল সংঘটিত হয়। কিন্তু দেশ,

কাল, পাত্র বিবেচনা না করিয়া সেবা অনুষ্ঠিত হইলে সমাজ অশেষবিধ অমঙ্গলের ভাগী হইয়া থাকে। অতিথি-সেবার কথা চিন্তা কর। ন দ্বিতীয়া তিথির্যস্য সোঽতিথিঃ; অর্থাৎ যাহার পক্ষে দ্বিতীয়া তিথি নাই তাহাকে অতিথি বলা যায়। অতিথিঃ সর্ব্বদেবময়ঃ; অর্থাৎ অতিথি সেবা করিলে সর্ব্বদেবের সেবা করা হয়। ভগবান্ মনু বলে—"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা, এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।" অর্থাৎ তৃণ বা কুশাসন, ভূমি অর্থাৎ বসিবার স্থান, উদক অর্থাৎ আচমন ও পানার্থ জল এবং মধুর বাক্য সাধুদিগের গৃহে এই কয়টি দ্রব্যের কখনও অভাব হয় না। শ্রুতিও বলেন "অতিথি-দেবো ভব" অর্থাৎ অতিথিকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। সুতরাং শাস্ত্রে অতিথি-সেবার যথেষ্ট প্রশংসা পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পঞ্চযজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। যথা—ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ও নৃযজ্ঞ।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমদৈব বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপুজনম্॥

অধ্যাপনাকে ব্রহ্ম বা ঋষিযজ্ঞ বলে, তর্পণকে পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দেবযজ্ঞ, বলিকে ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবাকে নৃযজ্ঞ বলে। প্রাচীনকালে এবং কিছুদিন পুর্ব্বেও প্রত্যেক ধনী গৃহস্থের বাটীতে অতিথিসেবার বন্দোবস্ত ছিল। অতিথি বলিলে যে কেবল দরিদ্রকে বুঝাইবে তাহা নহে, ধনীও অতিথি হইতে পারেন। হঠাৎ যদি কোন ব্যক্তি বিদেশে আগমন করে, তাহার অর্থ থাকা সত্বেও তাহার বাসস্থান ও আহারের অসুবিধা হইতে পারে, সেই জন্যই অতিথি-সেবার প্রবর্ত্তন। আজকাল যেমন অধিকাংশ স্থানে হোটেল দোকান প্রভৃতি থাকায় বিদেশাগত লোক তৎস্থানে আহার ও বাসস্থান পাইতে পারে, প্রাচীনকালে তদ্রূপ ছিল না। বিশেষতঃ অর্থ লইয়া আহার দেওয়া তৎকালে ধর্ম্মবিরুদ্ধ, সুতরাং নিন্দার্হ ছিল। বর্ত্তমানেও অর্থ লইয়া কোন গৃহস্থ-ভবনে ঐরূপ ব্যক্তিকে আহার ও বাসস্থান দেওয়া নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহা হউক, অতিথি-সেবা প্রথাটী যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয়থাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু এই উৎকৃষ্ট প্রথার অপব্যবহার হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। এই অপব্যবহার অতিথি দ্বারাও হয় এবং গৃহস্থের দ্বারাও হয়। অতিথি অনেক সময়ে দ্বিতীয়া কেন আরও অনেক তিথি পর্য্যন্ত একই স্থানে অবস্থিতি করেন এবং অনেক গৃহস্থও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্থান না দিয়া অথবা নিজ ঐশ্বর্য্য দেখাইতে অতিথির জন্য অনেক অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া অতিথিসেবার অপব্যবহার করেন। এই বে

অতিথি-সেবা ইহা বর্ত্তমানে এক রকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও হয়। এখন অনেকে এমন কি আত্মীয় স্বজনের বাটীতেও আতিথ্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু এ প্রথা উঠিয়া যাওয়া উচিত নহে; সুসংযতভাবে এ প্রথা থাকিলে দেশের মঙ্গল হইতে পারে। যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং দেশবিদেশ পর্য্যটন করেন, তাহাদিগকে সাধারণতঃ সাধু বলে। এই সাধুসেবা সমাজে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই সাধুদিগের মধ্যে অনেক অসাধুও থাকেন। সাধুদিগের কার্য্য আত্মোৎকর্ষ সাধন ও উপদেশ ও আদর্শ দেখাইয়া, সমাজের উৎকর্ষ-সাধন। কিন্তু এখনকার অনেক সাধু ঈশ্বরোপাসনা ও পরোপকার চিকীর্ষা যত করুন বা না করুন, গঞ্জিকা সেবন ও উদর-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্টই করিয়া থাকেন। অবশ্য প্রকৃত সাধু যে আদৌ নাই, তাহা আমরা বলি না। যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। অধিকাংশই ভণ্ড। সাধু অসাধু বিচার করিয়া সাধুসেবার প্রথা থাকিলে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। একবার আমি যখন নেপালে ছিলাম, তখন একজন সাধু আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বলিলেন তিনি ফলমূলাশী, তিনি অন্নাহার করেন না। কি আহার করিবেন জিজ্ঞাসা করায় দুই সের দুগ্ধ, অর্দ্ধ পোয়া ঘৃত, তিন পোয়া গোল-আলু এবং এক পোয়া ইক্ষু শর্করার কথা বলিলেন এবং রাত্রে একসের দুগ্ধ ও কিছু মিষ্টান্ন সেবন করিবেন জানাইলেন। এইরূপ সাধুসেবা সকলের পক্ষে সাধ্য নহে এবং এইরূপ সাধুসেবাতে সমাজের প্রভূত অমঙ্গল আছে। কারণ, সাধু নাম ধরিয়া যদি গৃহস্থের অপেক্ষা উত্তম আহার করা যায়, তাহা হইলে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিরই শ্রমদ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের প্রবৃত্তির অভাব হইবে এবং দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইবে। আমাদের দেশে বহু লক্ষ সাধু দৃষ্ট হয়। তাহারা সকলেই জীবিকার্জ্জনে সামর্থ্যসত্ত্বেও পরভাগ্যোপজীবী। এদেশে যে এত বৈষ্ণব—যাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন গৃহস্থ এবং স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করে—তাহার একমাত্র কারণ সমাজে সাধু-সেবার অপব্যবহার। দ্বারে উপস্থিত হইলেই ভিক্ষা পায়, সে কদাচারীই হউক আর অসচ্চরিত্রই হউক। দেবসেবারও ঐরূপ অপব্যবহার আছে। দেবসেবার জন্য যে সম্পত্তি অর্পিত হয়, পূজারী বা মোহান্তেরা তাহা দেবসেবার কার্য্যে না লাগাইয়া অধিকাংশ স্থলেই স্ব স্ব বিলাস-ব্যসনে নিয়োজিত করে। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে দরিদ্রকে ধন দান করিবে। শাস্ত্রের এই আদেশ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দরিদ্রসেবা উপলক্ষে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া

কিছুতেই উচিত নহে। দরিদ্রসেবাটী এখন বস্তুতঃ দরিদ্রসেবা হয় না, বর্ত্তমানে উহা দ্বারা কেবল শ্রমবিমুখ ব্যক্তির অলসতার সেবা করা হয় মাত্র। যাহারা স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করিতে শারীরিক বা মানসিক কারণে অশক্ত, তাহাদিগের ভরণপোষণের জন্য ব্যক্তিগত ভাবেই হউক বা সমাজে সাধারণ ভাবেই হউক, দান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহারা উপার্জ্জনক্ষম কিন্তু প্রকৃত সাধু বা বৈষ্ণব বা ফকির নহেন, তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ভিক্ষা নিষিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে গেলেই তাহাকে দরিদ্রাশ্রমে প্রেরণ করা হয়; এবং যদি দেখা যায় যে সে উপার্জ্জনে অক্ষম, তবে তাহাকে সাধারণের দরিদ্র-ভাণ্ডার হইতে সাহায্য করা হয়, কিন্তু উপার্জ্জনক্ষম হইলে তাহার উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দেওয়া হয়। কলিকাতার ইংরেজ মহলে কাহাকেও ভিক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। ভিক্ষার্থীকে রিক্তহস্তে বাটী হইতে ফিরাইয়া দিলে ...হস্থের অমঙ্গল হয় আমাদের দেশে এইরূপ বিশ্বাস থাকায় অনেক অযোগ্য ...ক্তি ভিক্ষা পায় এবং ইহাতে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হয়।

বহুদিন পূর্ব্বে একজন হৃষ্টপুষ্ট সবল ফকির নামধারী মুসলমানকে ভিক্ষা ...রিতে দেখিয়া, সে কার্য্য না করিয়া ভিক্ষা করে কেন, জিজ্ঞাসা করায় সে ...ত্তরে বলে যে আমি যদি তাহাকে কোন কার্য্য দেই, তবে সে তাহা ...রিতে প্রস্তুত আছে। আমি তাহাকে কার্য্য দিতে স্বীকার করায় সে বেতনের ...র জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম যে সে খোরাক-পোষাক ও মাসিক আট ...কা বেতন পাইবে। তাহাতে সে বলিল যে সে ভিক্ষা করায় তাহার ...রাক-পোষাক চলে এবং নগদ ত্রিশ টাকা তাহার থাকে, এমত অবস্থায় ... কাজ করিবে কেন? এইরূপ ভিক্ষা করার নানাবিধ ফন্দী সমাজে উপ-...ত হইয়াছে। কেহ বা অন্ধকে ভাড়া করিয়া ভিক্ষা করে. কেহ বা শিশু-...ন্তান ভাড়া করিয়া ভিক্ষা করে। কেহ বা উপবীতের দায়, কেহ বা কন্যাদায় ...নাইয়া ভিক্ষা করে। সৎকার্য্যের দোহাই দিয়াও অনেকে ভিক্ষা করে। ...নকৃষ্ণ মিশনের নাম করিয়া অনেক জুয়াচোর অনেক সময়ে আমার নিকট ...সিয়াছে। রাজনীতি ক্ষেত্রেও অনেক জুয়াচোরের উদয় হইয়াছে। মুখে ...ন্দেমাতরম্ ও মস্তকে গান্ধীক্যাপের সাহায্যেও এইরূপ জুয়াচুরি অনেক সময়ে ...ল। হিন্দু গৃহস্থের মজ্জায় মজ্জায় যে ধর্ম্ম বিশ্বাস রহিয়াছে এবং ভিক্ষার্থীকে ...ত্যাখ্যান করিলে অমঙ্গল হইবে এই বিশ্বাসের সাহায্যে সেবাধর্ম্মের ব

অপব্যবহার সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। এ বিষয়ে হিন্দু সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতি পল্লীতে যদি সেবা-সমিতি সংস্থাপিত হয়, এবং সাধারণে ব্যক্তিগত ভাবে দান না করিয়া সেই সেবা-সমিতিতে প্রতি গৃহস্থ যদি কিছু কিছু দান করেন এবং সমিতি হইতে যদি প্রকৃত আর্ত্ত ব্যক্তির সাহায্য করা হয়, তবে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয় যদি এক-জন দরিদ্র গৃহস্থের গৃহ অগ্নিতে ভস্মসাৎ হয় তবে তাহার পুনরায় গৃহ নির্ম্মাণ অসাধ্য বা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে যদি সমিতি হইতে তাহার গৃহ নির্ম্মাণে সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া তাহার নিকট হইতে গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যয় ক্রমে ক্রমে লওয়া হয় অথবা আংশিকভাবে লওয়া হয়, তবে সমাজের অনেক পরি-মাণে মঙ্গল সাধিত হয়। ঐরূপ ঝটিকা বা প্লাবনেও গৃহস্থের অনেক সময়ে প্রভূত ক্ষতি হয়, তাহার সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সমা-জের দরিদ্রদিগকে দান করিলেই যে দরিদ্রের উপকার করা হয় তাহা নহে, দরিদ্রদিগের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিতে হয়। মধ্যবিত্ত ভদ্র দরিদ্র-দিগের বর্ত্তমানে যে এত কষ্ট, তাহার এক প্রধান কারণ এ বিষয়ে সমাজের আদৌ দৃষ্টি নাই। প্রতি স্থানে কৃতী ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিলেই তাহাদের জীবিকার উপায় করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা চাই। সকলেই চাকরী দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। চাকরী দ্বারা মুষ্টিমেয় লোকের জীবিকা নির্ব্বাহিত হইতে পারে। মনে করুন, কোন স্থানে বিশলক্ষ লোক আছে। ছোট বড় সমস্ত চাকরী গণিয়া লইলে অর্থাৎ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে চাপড়াশী পর্য্যন্ত গণিলে দু হাজার চাকরী হইতে পারে। অবশিষ্ট লোকের উপায় কি? সুতরাং তাহাদের স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিতে হইবে। এই স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিতে গেলেই শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করাইয়া দরিদ্র-সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিলেই দেশের যথার্থ উপকার করা হয়; এবং উহাই যথার্থ দরিদ্র-সেবা। উহা করিতে গেলে গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক স্থাপন করা আবশ্যক; এবং ঐ ব্যাঙ্ক হইতে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্ব ও শাসনাধীনে উপযুক্ত ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি-দিগকে অল্প সুদে টাকা দিয়া নানাবিধ শিল্প ও কৃষি কার্য্যের সংস্থান করিয়া দিয়া ক্রমে ক্রমে লভ্য হইতে ব্যাঙ্কের টাকা উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারে এবং বহুলোকের স্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমি চিন্তা করিয়া যে উপায় স্থির করিয়াছি, তাহা ক্রমে প্রকাশ করিব।

আর্য্য-দীক্ষা।

লেখক—শ্রীরামবৃন্দ দেব।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ। (গীতা)
জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
ব্রাহ্মণো ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো বর্ণত্রয়ং দ্বিজাতীনাং।
বেদাভ্যাসে ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।
ব্রাহ্মণো ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ।" (মনু)

বর্ত্তমানকাল অতীত ও ভবিষ্যতের প্রমাণ। পৌরাণিক শ্রুতি স্মৃতি মতে এরূপ প্রতীতি হয় যে, অতি পূর্ব্বকালে হিমালয় প্রদেশে দেবতাদিগের শিক্ষা দীক্ষায় এক সম্প্রদায় গঠিত হয়; তাহারা আর্য্যনামে পরিচিত হয় ও দেব-শিষ্য বিধায় আপনাদের দেব উপাধি গ্রহণ এবং অপর মানবদিগের প্রকৃতিগত ভাবে অসুর, রাক্ষস পিশাচ, কিন্নর, বানর প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। আর্য্য অর্থে শিক্ষিত সদাচার-সম্পন্ন বা সুব্যবস্থিত এবং তদ্‌বিপরীত অসুরাদিকে অনার্য্য বুঝাইত। ঐ আর্য্য অনার্য্য বিভাগের পর মহর্ষি মনুর চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ প্রচার হওয়ায়,—পূর্ব্বোক্ত আর্য্য অনার্য্য মধ্যে কতিপয় লোকেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সংস্কার গ্রহণ করেন। কতিপয় সাম্যবাদী আর্য্যেরা ঐ চতুর্ব্বর্ণ বিভাগের ফলাফল বুঝিতে পারিয়া ঐ বিভাগ "কাঃ অন্তেঃ" বলিয়া উপেক্ষা করায়, তাহাদের সম্প্রদায় কায়ত্ত, কায়েত বা কায়স্থ নামে পরিচিত হয় এবং কতিপয় আর্য্যেরা বহুকাল যাবৎ আর্য্য নামেই পরিচিত ছিলেন।

"সেন সিংহ দেব রাহা কর দাম পালিতশ্চ।
চন্দ্র পাল ভদ্রোধরো নন্দী কুণ্ড সোমকশ্চ॥
রক্ষিতাঙ্কুর বিষ্ণু রাঢ্যশ্চ নন্দন নাথক।
নাগশ্চ দত্ত দাসস্তু ঘোষ বসু গুহ মিত্র॥
সেনাদি নন্দনশ্চৈব মহাপাত্র প্রকীর্ত্তিত।
নাথাদি দাস পর্য্যন্তো মধ্যল্ল পরিকীর্ত্তিত॥
ঘোষাদি মিত্র পর্য্যন্তং কুলিন ইতি সংজ্ঞাস্যা।
মহাপাত্র মধ্যল্লশ্চ কুলিনশ্চ তথা পরাঃ॥

এতেষাং সপ্তবিংশতি র্বল্লালেন প্রশংসিতা।
নবধা গুণ সংপ্রাপ্তা সর্ব্বে আর্য্য বিসংজ্ঞকা॥" (কুলদীপিকা)

বঙ্গাধিপ মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ও উক্ত সপ্তবিংশতি বংশ এবং হোড়, স্মর, ধরণী, বাণ প্রভৃতি বায়াত্তর বংশ বঙ্গদেশে আর্য্যনামে পরিচিত ছিলেন। এবং তৎসময় হইতে ও পরবর্ত্তীকালে ঐ সকল বংশীয় আর্য্যগণ কর্ম্মদোষে বা রাজরোষে পতিত হইয়া ও ব্যবসায়গত (শ্রমকর্ম্ম) নামে কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ (কামার, কুমার, মালাকর, গোপ, নাপিত, পত্রধর, তৈ, তাঁতি, সূত্রধর স্থান বিশেষে ইহাদের বিভিন্নরূপ নামকরণ হইয়াছে) অর্থাৎ জলাচরণীয়গণ ও অনাচরণীয় সুবর্ণবণিক, সাহা, সুরী, নমঃশূদ্র, কলু, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই সকল সম্প্রদায় মধ্যে প্রায় একইরূপ বংশোপাধি বিদ্যমান থাকায়, উহারা যে আর্য্যজাতি হইতে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। কেহ কেহবা বংশোপাধি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মোপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গে কান্যকুব্জ হইতে আগত কুলিন-বংশীয়দিগের আধিপত্যকালে মহাপাত্র-বংশীয় কায়স্থদিগের অধঃপতন হইয়াছে, এমন কি কুলিন বংশীয় রাজ আজ্ঞায়, মহাপাত্র দেব বংশ দে, চন্দ্র বংশ চন্দ হইয়াছে। ইন্দ্র বংশ ইন্দু, ব্রহ্ম বংশ বেহ্ম হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রাচীন আর্য্যজাতির আর্য্য নাম লোপ হইয়া কায়স্থ বৈদ্যাদি নাম ও এবম্বিধ পরিণতি সংঘটিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্যেরা যে, মধ্য এসিয়া আর্য্যজাতির উৎপত্তি স্থান নির্দ্দেশ করেন, সে মধ্য এসিয়া হিমালয় প্রদেশ ভিন্ন অন্য কোন স্থান নয়। সদাচার শিক্ষা দীক্ষায় হিমালয় প্রদেশেই আর্য্যজাতির উৎপত্তি এবং তথা হইতে এসিয়ার চতুর্দ্দিকে, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। "বিক্রমাদিত্য শাকসনুদিগকে পরাজিত করিয়া শকারি নাম গ্রহণ করেন। শাকসনুদিগের কতক এতদ্দেশে থাকিয়া যায়, কতক ইউরোপে যাইয়া শাক্‌সন রাজ্য স্থাপন করে; (ভূপ্রদক্ষিণ)। বোধ হয় শাকসনুরাই এতদ্দেশে শাকসেনী কায়স্থে পরিণত হইয়াছে। শকজাতি আর্য্য কি, অনার্য্য তাহা প্রমাণের কোন আবশ্যকতা নাই অর্থাৎ সদাচার ও অনাচার ভেদে সেকালের আর্য্য ও অনার্য্য হইয়াছে, অনার্য্যও আর্য্য হইয়াছে; তাহা হবেও চিরকাল।

চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ মনু কর্ত্তৃকই হউক বা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই হউক, বর্ত্তমান মানব সমাজে আর চতুর্ব্বর্ণ ব্যবস্থা হইতে পারে না। হইতে পারিলে সেকালের পরিণাম-আর্য্যেরা "কাঃ অন্তেঃ" বলিয়া উপেক্ষা করিতেন না বা অধিকাংশেই আর্য্য

নামে পরিচিত থাকিতেন না। ব্রাহ্মণের সন্তান যদি যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি না করেন তবে কিরূপে ব্রাহ্মণ হইবেন? ক্ষত্রিয় সন্তানের যদি রাজ্যাধিকার না থাকে, তদুপযোগী বল-বীর্য্য শিক্ষা-দীক্ষা না থাকে, তবে কিরূপে ক্ষত্রিয় হইবে? বৈশ্য সন্তানের যদি কৃষি বাণিজ্য না থাকে, তদুপযোগী ধন-সম্পত্তি না থাকে তবে কিরূপে বৈশ্য হইবে? কিন্তু মানবজাতির সুশিক্ষা, দীর্ঘায়ু বা স্বাস্থ্যবল লাভের জন্য সৎপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির জন্য সদাচার ও অনাচারের বা আর্য্য অনার্য্য প্রভেদ থাকা আবশ্যক।

সদাচার।

অনিন্দিত বা স্বাস্থ্যকর আহার্য্য ও পানীয় গ্রহণে ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং হিংসা দ্বেষ ব্যভিচার বর্জ্জন ও সদ্‌বৃত্তি পরায়ণ হওয়াই সদাচার। দূষিত পচাদ্রব্য-জাত ও কাম ক্রোধাদির উদ্দীপক বিধায় মদ্যপান একেবারে নিষিদ্ধ। পশ্বাদির মাংসাহারে পশু পক্ষীর শোক দুঃখ জরাব্যাধি ও কাম ক্রোধাদি মানব দেহে সংক্রামিত হয় বিধায় মাংসাহার নিষিদ্ধ। সদাচার বা আর্য্যাচার পালন না করিলে, আর্য্যবংশে জন্মিলেই আর্য্যত্ব রক্ষা হয় না। কুশিক্ষা ও কুপ্রবৃত্তি বশতঃ অধিকাংশ আর্য্যই অনার্য্যাচারী হইয়া উঠিয়াছেন ও আর্য্য নাম আর্য্য-স্মৃতি লোপ করিয়া ফেলিয়াছেন; সুতরাং আর্য্যদিগের আর্য্যত্বের স্মৃতি চিহ্ন গ্রহণ করা আবশ্যক।

বঙ্গদেশের আর্য্যজাতি।

বর্ত্তমান সময়েও হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অনেকেই সদাচার এবং সকলেই উপবীত চিহ্নের দ্বারা অনাচারী সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইয়া আছেন; সুতরাং তাহাদের আর্য্য-সংস্কার চিহ্ন অনাবশ্যক। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ এবং সুবর্ণবণিক, সাহা, সুরী, নমঃশূদ্র, কলু, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি আর্য্য সন্তানগণ বহু শাখায় প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া বহুবিধ জাতি নাম গ্রহণে তাহাদের আর্য্যজাতীয় স্মৃতি লোপ করিয়া ফেলিয়াছেন,— তাহারা আর্য্যাচারের স্মৃতি ও আর্য্য জাতীয় চিহ্ন—ত্রিগুণ মেখলা (পৈতা) ধারণ ও আর্য্যজাতীয় দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এতদ্‌ভিন্ন আর্য্য বা অনার্য্য, হিন্দু বা অহিন্দু যে কেহ বা যে কোন সম্প্রদায় সদাচারী ও সদ্‌বৃত্তি-সম্পন্ন হইয়া আর্য্যজাতীয় দীক্ষাগ্রহণ-পূর্ব্বক আর্য্য নামে পরিচিত ও আর্য্য সমাজভুক্ত হইতে পারিবেন। জলাচরণীয় হইলেই আর্য্য-দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আর্য্যজাতীয় দীক্ষা।

পরম পিতা পরমেশ্বর একমাত্র গুরু এবং পিতা মাতা শিক্ষা গুরু। সর্ব্বদা তাহাদের বাক্য পালন করিব। আমি আর্য্য, আমি বিশ্বসংহিতা-বর্ণিত সদাচার ও সদ্‌বৃত্তি-পরায়ণ হইব এবং অনিন্দিত পানাহার গ্রহণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রম পালন করিব। "মাতৃবৎ পরদারেষু, পরপুরুষ পুত্রবৎ; আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ" ইহাই আমার ধর্ম্ম। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" সন্তানোৎপাদন উদ্দেশ্য ব্যতীত বৃথা শুক্রক্ষয় ও ব্যভিচার করিব না। আমি আচার-বিনয়াদি নবগুণান্বিত হওয়ার ও আর্য্যজাতীয় স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ ত্রিগুণ মেখলা (পৈঁতা) ধারণ করিলাম।

মন্তব্য—(১) উক্ত দীক্ষা ও পৈঁতা গ্রহণে উক্তরূপ প্রতিজ্ঞা ব্যতীত অন্য কোনরূপ যজ্ঞ, পূজা বা মন্ত্রাদি ক্রিয়ার আবশ্যক হইবে না। ব্রাহ্মণ ও সর্ব্ব-প্রকার মানব জাতির প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ-বর্জ্জিত হইয়া উক্ত পৈঁতা দক্ষিণ হস্তের কনুইতে বাঁধিয়া ব্যবহার করিবেন। কারণ স্কন্ধদেশে দোলাইয়া ব্যবহার করিলে ব্রহ্মণাদি ঈর্ষা ও রোষ প্রকাশ করিবেন, মণিবন্ধে ব্যবহার করিলে সদা জলসিক্ত বা উচ্ছিষ্ট কি অশুচি দুষ্ট হইতে পারে, বাম হস্তের কনুইতে ব্যবহারে স্ত্রীলোকের ডোর বাঁধা বলিয়া তাচ্ছল্য বা বিদ্রূপ হইতে পারে; অতএব দক্ষিণ হস্তের কনুইতে বাঁধিয়া ব্যবহার করিবেন। "নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গো-ব্রাহ্মণ-জগদ্ধিতায় চ" ব্রহ্মণ্যদেব বা পরম ব্রহ্মই আর্য্যজাতির একমাত্র গুরু; গো ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতসাধন গুরুর কর্ত্তব্য বিধায়, তৎশিষ্য আর্য্যজাতিও সর্ব্বদা গো ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতসাধনে ব্রতী থাকিবেন। "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" নিজ জীবন, পরিজনবর্গ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব সুহৃদদিগের রক্ষা ও উন্নতি জন্য সতত কর্ম্মপরায়ণ থাকিবেন।

(২) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ আর্য্যজাতীয় দীক্ষা গ্রহণ মাত্রেই বিবাহ আদি বিষয়ে সকলে এক হইতে পারিবেন না বটে, কিন্তু সদাচার-প্রভাবে ভবিষ্যৎকালে সকলেই সর্ব্ববিষয়ে এক মহামিলনে সম্মিলিত হইবে।

হিন্দু-মোসলেম একতা।

লেখক—শ্রীপঞ্চানন কাঞ্জিলাল কবিরত্ন।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু মুসলমানের একতা সংস্থাপনে দেশে ঘোর আন্দোলন ও চেষ্টা চলিতেছে। সংবাদপত্র সমূহ ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হিন্দু মুসলমানের একতা সংস্থাপনের নানাবিধ উপায় আবিষ্কারে মনোযোগী হইয়াছেন। শত শত বক্তা উভয় জাতির মিলন সম্বন্ধে শত শত স্থানে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন। সুতরাং এই সময়ে হিন্দু মোসলেম একতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, হিন্দু মুসলমানের একতা বলিতে কি বুঝায়। হিন্দু মোসলেম একতা বলিলে হিন্দু স্বধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুমোদিত আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম ও উক্ত ধর্ম্মানুমোদিত আচার ব্যবহার গ্রহণ করিবেন, অথবা মুসলমান স্বধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুমোদিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করিবেন, এরূপ বুঝিতে হইবে না। হিন্দু হিন্দুই থাকিবেন এবং মুসলমান মুসলমানই থাকিবেন। তবে যে সকল কার্য্যে উভয় জাতির স্বার্থ সমান, তৎ তৎস্থলে উভয় জাতি একমতাবলম্বী হইয়া দেশের মঙ্গলের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইবেন। দেশ যাহাতে স্বাস্থ্যকর হয়, ভূমি যাহাতে উর্ব্বর হয়, দেশের লোক যাহাতে সুস্থ, দীর্ঘজীবী, বিদ্বান্ ও বলবান্ হয়, তাহাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সমান স্বার্থ, সুতরাং ঐ সকল বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়েরই একতাবদ্ধ হওয়ার কোন বাধা দেখা যায় না। দেশে শিক্ষার বিস্তার বা বাণিজ্যের প্রসার হইলে উভয় জাতিরই মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে; সুতরাং এই সকল বিষয়ে উভয় জাতিরই একমতাবলম্বী হওয়ার বাধা নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ঐ কথা। যদি ভারতবর্ষ স্ব-তন্ত্রতা লাভ করে, তাহাতে উভয় জাতিরই নানাবিধ উন্নতি লাভের সম্ভাবনা। যদি হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, অধ্যবসায়ী, কষ্ট-সহিষ্ণু হয়, তাহাতে উভয় সম্প্রদায়ই লাভবান্ হইবেন। কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রই চৌর্য্য, মিথ্যাবাদ প্রভৃতির প্রশ্রয় দেয় না।

এ দেশের মুসলমানদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন। পারস্য আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ হইতে সমাগত মুসলমানেরা যখন এ দেশে রাজত্ব

সংস্থাপন করেন, তৎকালে প্রলোভনেই হউক বা বল প্রকাশেই হউক, কিংবা মুসল ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎকর্ষ সম্বন্ধে ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, এ দেশের অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুকাল একত্র বাস করায় আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও উভয় জাতির মধ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও দেখিয়াছি কোন গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পরের সুখ দুঃখে, আপদ বিপদে উত্তম সহানুভূতি ছিল। গ্রামবাসীরা পরস্পরকে নাম ধরিয়া না ডাকিয়া দাদা, খুড়ো, চাচা প্রভৃতি সম্বোধন করিতেন। দুর্গোৎসব মহরমাদি পর্ব্বাহে উভয় জাতির লোকেরাই পরস্পরের বাটীতে উপস্থিত হইতেন। পল্লীগ্রামে এখনও এ ভাব বিদ্যমান আছে।

উভয় জাতিরই পরস্পরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া বাস করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে। গ্রামে হিন্দু মুসলমানে নানাপ্রকার কর্ম্মের বিনিময় চলে। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে টাকা কর্জ্জ উপলক্ষে উভয় জাতিই পরস্পরের সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। কৃষি বাণিজ্য বিষয়ে পরস্পরের সহযোগিতা দৃষ্ট হয়।

কোন কোন মুসলমানের ভ্রান্ত ধারণা আছে, মুসলমানেরা একেশ্বরবাদী; পক্ষান্তরে হিন্দু বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। বস্তুতঃ হিন্দুরাও একেশ্বরবাদী। হিন্দুদিগের বেদ উপনিষদাদি ধর্ম্মগ্রন্থে "ঈশ্বর বহু" এ কথা কুত্রাপি নাই। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আলবরুণী এ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

The Hindus believe with regard to God that he is one, eternal, without beginning and end, acting by free will, almighty, all-wise, living, giving life, ruling, preserving; one who in his sovereignty is unique, beyond all likeness and unlikeness, and that he does not resemble anything nor does anything resemble him. In order to illustrate this we shall produce some extracts from their literature, lest the reader should think that our account is nothing but hearsay.

In the book of Patanjali the pupil asks :—

"Who is the worshipped one, by the worship of whom blessing is obtained ?"

The master says :

It is he who, being eternal and unique, does not for his part stand in need of any human action for which he might give as a recompense either a blissful repose, which is hoped and longed

for, or a troubled existence, which is feared and dreaded. He is unattainable to thought, being sublime beyond all unlikeness which is abhorrent and all likeness which is sympathetic. He by his essence knows from all eternity. Knowledge in the human sense of the term, has as its object that which was unknown before, whilst not knowing does not at any time or in any condition apply to God."

The following passage is taken from the book *Gîta*, a part of the book *Bhârata*, from the conversation between Vâsudeva and Arjnna :—

"I am the universe, without a beginning by being born, or without an end by dying. I do not aim by whatever I do at any recompense. I do not specially belong to one class of beings to the exclusion of others, as if I were the friend of one and the enemy of others. I have given to each one in my creation what is sufficient for him in all his functions. Therefore whoever knows me in this capacity, and tries to become similar to me by keeping desire apart from his action, his fetters will be loosened, and he will easily be saved and freed.

হিন্দুদিগের মধ্যেও অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে মুসলমানেরা অসভ্য বা বর্ব্বর জাতি, উহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই নাই। বস্তুতঃ এরূপ ধারণা অজ্ঞতা মূলক। এক সময়ে মুসলমানেরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাদি বিষয়ে বিশেষ উন্নত ছিলেন। ইউরোপের সাহিত্য বিজ্ঞানাদি বহু বিষয়ে মুসলমানদিগের নিকট ঋণী। মধ্যযুগে মুসলমানেরাই ইউরোপ খণ্ডে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কবি জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্যগ্রন্থ অদ্যাপি সাদরে নানাদেশে পঠিত হয়। তবে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার অভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম শিক্ষা ও সভ্যতা বিষয়ে অনেকাংশে হীন সন্দেহ নাই। হিন্দু যদি মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করেন এবং মুসলমান যদি হিন্দুদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করেন, তবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত হইতে পারে। হিন্দু ছাত্রগণের মধ্যে পারসী শিক্ষার এবং মুসলমান ছাত্রগণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে হিন্দু মুসলমানের একতার অনেকগুলি সাধারণ হেতু আছে। কিন্তু গো-হত্যা লইয়াই পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা কিছু বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়।

ভারতবর্ষের পল্লীগ্রাম-সমূহে মুসলমানদিগের মধ্যে গো-মাংস খাদ্যরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। অনেক মুসলমান গো-মাংস আদৌ স্পর্শ করেন না। বস্তুতঃ এ দেশের মুসলমানের পক্ষে গোরু যেরূপ প্রয়োজনীয় ও উপকারী জন্তু, এমন আর কোন জন্তুই নহে। এখানকার মুসলমানেরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। কৃষি কার্য্যের জন্য গোরু যে কিরূপ প্রয়োজনীয় জন্তু তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। গাভীর দুগ্ধ শিশু, রোগী, দুর্ব্বল ও বৃদ্ধের পক্ষে যে কিরূপ উপকারী তাহাও কাহাকে বুঝাইবার প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং খাদ্যের জন্য এরূপ মহোপকারী জন্তুর বধ করা, আর নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাতে করা একই কথা। মুসলমানেরা কিছু এত নির্ব্বোধ নহেন যে নিজের ভালমন্দ বুঝিতে পারিবেন না। তবে, বকরিদের সময় অনেক মুসলমান গো-বধ করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত পর্ব্বাহে তাঁহাদের গো-বধই করিতে হইবে এমন ধরাবাঁধা ব্যবস্থা তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। উক্ত কার্য্যে যে সকল জন্তু-বধের ব্যবস্থা আছে, গোরু তাহাদের অন্যতম। গো-ব্যতীত দুম্বা, ছাগ প্রভৃতি জন্তুও উক্ত কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং হিন্দুদিগের মনে ক্লেশ না দিয়া এবং ধর্ম্মকার্য্য পণ্ড না করিয়া, তাঁহারা গোরুর পরিবর্ত্তে অন্য জন্তু বধ করিতে পারেন। তাহা হইলে উভয় জাতির মধ্যে মনোমালিন্যের মূলোচ্ছেদ হয়; অথচ গোরুর ন্যায় উপকারী জন্তু বধ করিয়া অকৃতজ্ঞতা দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। হিন্দুরাও উপাসনাকালে মস্‌জিদের সম্মুখে গান বাদ্য হইতে বিরত হইয়া মুসলমানদিগের তুষ্টিসাধন করিলে বা অন্য প্রকারে তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মে বাধা না দিলে উভয় জাতির একতা সংস্থাপিত হইতে পারে। এ সকল কার্য্য সম্বন্ধে বল প্রয়োগ না করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের আপোষে মীমাংসা করা উচিত।

হিন্দু মুসলমানের অনৈক্যের আর একটী হেতু—গবর্ণমেণ্ট চাকরী। হিন্দুরা বহু পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষিত, সুতরাং অধিকাংশ চাকরী হিন্দুর অধিকৃত। মুসলমানেরা হিন্দুর ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিত নহেন বলিয়া হিন্দুদের তুলনায় অল্প-সংখ্যক চাকরী তাঁহাদের অধিকৃত। উভয় সম্প্রদায়ের মনোমালিন্যের এই হেতু দূরীকরণের উপায় মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রসার। শিক্ষা বিষয়ে মুসলমানেরা যোগ্য হইলে তাঁহারা অধিক পরিমাণে চাকরী পাইতে পারেন। যিনি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন তিনি শিক্ষিত লোক পাইতে অশিক্ষিত লোক নিযুক্ত করিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে না; বিশেষতঃ অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে দেশের ঘোর অনিষ্ট হইতে পারে।

আর এক কথা—দেশের অধিকাংশ লোকই যদি চাকরীর জন্য লালায়িত হয়েন, তবে অত চাকরী দিবে কে? চাকরীর সংখ্যা অসংখ্য নহে। এমত অবস্থায় হিন্দু মুসলমান সকলেরই ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষিশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। মুসলমানদিগের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারিং, ওকালতী প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, সে পক্ষে কোনই বাধা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সকল স্বাধীন ব্যবসায়ে মুসলমানেরা জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা খুব কমই করেন। সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য চাকরী দ্বারা কোন জাতির সমস্ত শিক্ষিত লোকের জীবিকার সংস্থান হইতে পারে না। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দুই শ্রেণীর লোক আছে—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত। যদি সম্প্রদায় বিশেষ জনসংখ্যা অনুসারে চাকরীর দাবী করেন, তবে হিন্দুদিগের মধ্যে নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিও শিক্ষিত না হইয়াও শুধু জনসংখ্যার বাহুল্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি উন্নত জাতিসমূহ অপেক্ষা অধিক-সংখ্যক চাকরীর দাবী করিতে পারেন। এরূপ হইলে সরকারী কাজকর্ম্ম চলা অসম্ভব। বিশেষতঃ কোন সম্প্রদায়ের অল্প-সংখ্যক শিক্ষিত লোক চাকরী পাইতে পারেন, তাহাতে অশিক্ষিত অধিকাংশ লোকের বিশেষ উপকার হইতে পারে না। অতএব চাকরীর দিকে বদ্ধদৃষ্টি না হইয়া দেশের লোকে যত অধিক পরিমাণে শিল্প কৃষি ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন করিবে, ততই দেশের অর্থাগম ও শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইবে। আমরা আশা করি, উভয় সম্প্রদায়ই এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিবেন এবং পরস্পরের অনৈক্যের হেতু সকল দূরীভূত করিয়া ও একতার হেতু সকল দৃঢ়ীকৃত করিয়া দেশের ও স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মঙ্গলসাধন করিবেন।

বিদ্রোহী কবি মধুসূদন।

[কবি মধুসূদন দত্তের শতবার্ষিক জন্মোৎসবে—১২ই মাঘ ১৩৩০]

লেখক—শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত।

(প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত।)

হে বিদ্রোহী উচ্ছৃঙ্খল, হে বাংলার দুরন্ত সন্তান!
মাননি শাসন কোনো, চূর্ণ করি' নিষেধ-পাষাণ—

সমাজ-বাঁধন ভাঙ্গি', করি' ভেদ ধর্ম্মের নিগড়
উন্মত্ত-চরণ-ভরে চলেছিলে চির-অগ্রসর !
ছুটেছ আশার পিছে,—সে আশা কভু বা মরীচিকা—
ক্ষণেকে মোহিয়া আঁখি ক্ষণ পরে যাহা বিভীষিকা !—
তারি পিছে ছুটে' গেছ উদ্দাম অবোধ বাধাহীন ;
ভেঙে গেছে মোহ কত, তবু মোহ হয়নিক ক্ষীণ।
যে আশা ছুটেছ ধরি' মেটেনিক সে তোমার আশ,
তবু চির-অভিলাষী, তবু ছিল উল্লাস-উচ্ছ্বাস !
শান্ত বঙ্গ-গৃহে স্নিগ্ধ জ্বল নাই প্রদীপের শিখা,
বৈশাখের মেঘে তার দীপ্ত তুমি বিদ্যুতের লিখা !
হে দুরন্ত দৃপ্ত কবি ! বিদ্রোহ-পাগল সেই প্রাণ
নৃত্যতালে প্রসারিয়া করি' দিলে নব-গতি-মান্
ক্ষীণা সে কাব্যের নদী—শৈবালে জঞ্জালে হত-বল
সনাতন অবসাদে, পুরাতন-উপলে বিহ্বল।
বিশ্ব-সাগরের বার্ত্তা তারি গতি করি' আহরণ
শীর্ণা ভাষা-তটিনীতে জাগাইলে প্রাণের নর্ত্তন !
বাল্মীকি ব্যাসের সাথে মিলাইলে ভার্জ্জিলে হোমারে,
কৃত্তিবাস কাশীদাস জেগে উঠে প্রতীচ্য-হুঙ্কারে !
বঙ্গের শঙ্খের সাথে বেজে উঠে পশ্চিমের ভেরী,
কাব্যের চরণ হ'তে খসে' পড়ে জড়তার বেড়ী !
নিত্য নব আশা পানে ছুটেছিলে উন্মাদ সমান ;
এক আশা বঙ্গ-ভাষা তাতে তব একান্ত ধেয়ান !
আজ ভাবি—সেই ভালো, নৈরাশ্যে নৈরাশ্যে বল লভি'
ব্যগ্র আশে পুরিয়াছ আমাদের আশা তুমি, কবি !
যে তৃপ্তি খুঁজেছ নিতি পেলে তাহা হ'য়ে যেত শেষ,
অতৃপ্ত আবেগে তবে কে দেখাত সুখের উদ্দেশ ?
তুমি রচি' গেছ পথ বনদল উপাড়িয়া বলে,
আজি সে পথের পরে রবির অমল জ্যোতি জ্বলে।
দেব ত্রাস মধু দৈত্য নাশে যেই সে মধুসূদন,—
বাংলার কাব্যের কক্ষে তুমি কবি জড়তা-দলন।

সমাজে দলেছ পায়ে, স্বধর্ম্মে ভেঙেছ দৃঢ় হাতে ;
দরদ দিয়েছ তবু জাতির অভাব-বেদনাতে ;—
মাতৃ-ভাষা-জননীরে, হে দরদী, রাখনিক দূরে—
প্রাণরসে পুষ্ট তারে করিয়াছ নিত্য চিত্ত-পুরে।
মুক্তি পেল বন্ধ যাহা সুপ্তি-মাঝে শুনি' মেঘনাদ ;
নবচ্ছন্দে নেচে এল নবীনের বিচিত্র সংবাদ !
আজি তব জন্ম-দিনে নমস্কার, বিদ্রোহী মহান্ !
নমস্কার সে বিদ্রোহে যে বিদ্রোহ আনিল কল্যাণ !

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দান।—স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পরলোকগত বিধবা কন্যা কমলা দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ হাজা টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদ হইতে একজন অধ্যাপক নিযুক্ত কর হইবে; তিনি কোনও ভারতীয় বিষয় ব্যাখ্যা করিবেন। আমরা স্যর আশু তোষকে এই দানের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল।—কাশীর ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল দুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র বাহির করিবেন, একখানি ইংরেজী—"মহাশক্তি", অপরখানি হিন্দী—"ভারতধর্ম্ম।"

বাহিরের সঙ্গে সংস্পর্শ ব্যতীত—আপনার মধ্যে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিলে, আপনাকে জানা যায় না। বিরাট হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ এই সহজ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। মহামণ্ডল এমন একটি ভবন প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন যেখানে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন হইবে। মহা-মণ্ডল একটি আর্য্য-মহিলা মহাপরিষদও খুলিয়াছেন; সেখান হইতে "আর্য্য-মহিলা" নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হয়।

প্রাচ্যদেশের অন্তর্ম্মুখী দৃষ্টির সহিত পশ্চিমের পুরতোমুখী দৃষ্টির মিলন ঘটান 'মহাশক্তি'র চেষ্টা হইবে।

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

৩০শ বর্ষ, ৩০শ খণ্ড ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩৩০ সাল। ১৮৪৫ শকাব্দাঃ

বৈদিক সাহিত্যের কাল-নিরূপণ।

লেখক—শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ, বি, এ, বি, ই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মার্গশীর্ষ মাসের পূর্ণিমা হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ হইত এবং ঐ পূর্ণিমার নাম হইতে অমরকোষাক্ত নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে এই ধারণা ত্যাগ করিলে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় অসঙ্গতি দূরীভূত হয়। বৈদিক সাহিত্যে ঐ সকল ধারণার অনুকূল যুক্তি কিছুই নাই এবং পাণিনির সূত্রগুলি সুক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিলে ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। পূর্ণিমার নাম হইতেই হিন্দু পঞ্জিকার মাসের নাম স্থির হইয়াছে এবং ঐ পূর্ণিমার যাহা কিছু ধর্ম্ম বা বিশেষত্ব সকলই ঐ মাসে আরোপিত হইয়াছে। যদি মার্গশীর্ষ মাসের পূর্ণিমার রাত্রি বৎসরের প্রথম রাত্রি হয়, তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ মাসও বৎসরের প্রথম মাস স্বরূপে গণ্য হইবে। অন্য কথায় বলিতে গেলে ঐ মার্গশীর্ষ মাসকেই অগ্রহায়ণ মাস বলিতে হইবে। শব্দকল্পদ্রুমের উক্তি প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়া বোটলিং এবং রথ, (Boehtlingk and Roth) আগ্রহায়ণ শব্দটীর এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তারানাথও বোধ হয় শব্দকল্পদ্রুমের মত

গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই ঐ শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। যদি অগ্রহায়ণ শব্দ দ্বারা মার্গশীর্ষ মাস বুঝায় তাহা হইলে ভট্টোজির মতে ঐ শব্দের "আগ্রহায়ণ" রূপও হইতে পারে এবং তদ্ধেতু উহাকে মার্গশীর্ষ মাসের নামান্তর বলিতে হইবে। পাণিনি শব্দটীকে গৌরাদি-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন (পাঃ—৪—১—৪১) এবং তিনি ঐ শব্দটী জানিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি উহা দ্বারা কি বুঝিয়াছিলেন? তিনি যে উহাদ্বারা মার্গশীর্ষ মাস কল্পনা করেন নাই এই ধারণার অনুকূলে যথেষ্ট কারণ আছে। যদি আমরা মনে করি যে পাণিনির সময় ঐ শব্দের একই অর্থবোধক দুইটী আকার (আগ্রহায়ণ আগ্রহায়ণিকা) ছিল, তাহা হইলে তিনি আগ্রহায়ণি শব্দটী † (পাঃ ৪—২—২৩) চৈত্রী প্রভৃতি শব্দের সহিত উল্লেখ করিতেন, কারণ চৈত্রী প্রভৃতি শব্দের চৈত্রিকা প্রভৃতি দুই প্রকার আকার দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই কারণে কখনও অশ্বত্থ শব্দের সহিত উল্লেখ (পাঃ ৪—২—২২) করিতেন না। সেই জন্য আমরা মনে করিব যে পাণিনির সময় ঐ শব্দের "আগ্রহায়ণিকা" নামধেয় একটী মাত্র রূপ ছিল এবং তাহাদ্বারা মার্গশীর্ষ মাস বুঝাইত। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে পাণিনি মার্গশীর্ষী পূর্ণিমা হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইত এই মতের বিষয় অবগত ছিলেন না। কারণ তাহা হইলে তিনি উহাকে বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন পদ মনে করিয়া আগ্রহায়ণি শব্দে পূর্ণিমার রাত্রিরূপে প্রতিপন্ন করিতেন না। আগ্রহায়ণি শব্দটী তিনি তিনবার ব্যবহার করিয়াছেন। ভট্টোজি প্রভৃতি বহুব্রীহি সমাস করিয়া দীর্ঘ আছস্বর লইয়া যেমন গোলযোগে পড়িয়াছিলেন, পাণিনি যদি সেরূপ কিছু গোলযোগ মনে করিতেন তাহা হইলে তিনি তাহার উল্লেখ করিতেন। সুতরাং আমি মনে করি পাণিনি সাধারণ ভাবে অগ্রহায়ণ শব্দ হইতে নক্ষত্রের নাম আগ্রহায়ণি শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন। এই যুক্তি অনুসারে আগ্রহায়ণি শব্দ সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ তখন আমরা মনে করিতে পারি যে পাঃ ৪—২—৩ অনুসারে যখন সময়-জ্ঞাপনার্থে নক্ষত্রের নাম হইতে পদ নিষ্পন্ন হয়, তখন আছস্বর দীর্ঘ হয়। স্ত্রী প্রত্যয়টী পাঃ ৪—১—১৫ সূত্রানুসারে সিদ্ধ হইতে পারে, অথবা পাঃ ৪—১—৪১ অনুসারে গৌরাদি শ্রেণীর অন্তর্গত থাকায় উহা সিদ্ধ হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা সাধারণভাবে ঐ পদ সিদ্ধ করিতে

† "আগ্রহায়ণ্যশ্বত্থাট্টক্ পাঃ ৪-২-২২," "বিভাষা ফাল্গুনী শ্রবণা কার্ত্তিকী চৈত্রীভ্যঃ (পাঃ ৪-২-২৩।)

পারি। ঐ শব্দে নক্ষত্র না বুঝাইয়া পূর্ণিমাকে বুঝাইতেছে এই ধারণার অনুকূলে যদি কোন বিশিষ্ট কারণ না থাকে তবে অপ্রচলিত ব্যাখ্যা এবং ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করা কোনও ক্রমে সঙ্গত হয় না। অবশ্য অগ্রহায়ণ শব্দের নক্ষত্র সংজ্ঞা এখন লুপ্ত হইয়াছে এবং অমরসিংহ আগ্রহায়ণি শব্দ মৃগশিরা নক্ষত্রের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন; অগ্রহায়ণ শব্দের কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু আমি এক্ষণে প্রমাণ করিব যে অমর-সিংহই কেবল একাকী এইরূপ ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা করেন নাই। পরবর্ত্তী সাহিত্যে ঐ ধারণা হইতে অনেক ভ্রমাত্মক মতের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, যে সকল শব্দের উপর ঐ মত প্রতিষ্ঠিত তাহাদের অর্থ ও ধাতু প্রত্যয়াদি ঐ মতের দ্বারা কিরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক। যদি কোন বিশিষ্ট প্রমাণ থাকিত তবে ব্যাকরণগত অসঙ্গতি মানিয়া লইলে চলিত, কিন্তু যদি দেখা যায় যে এই মত অন্য অনেক বিষয়ের বিরুদ্ধবাদ প্রচার করে এবং অসম্ভব সিদ্ধান্তে আনয়ন করে তবে ঐ সকল ব্যাকরণ-গত অসঙ্গতি মানিয়া লওয়া দূরে থাকুক উহাকে ঐ মতের বিরুদ্ধে একটী প্রধান প্রতিকূল কারণ মনে করিতে হইবে।

মার্গশীর্ষী পূর্ণিমা রাত্রি যে বৎসরের প্রথম রাত্রি ছিল এই মত সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব। কেবল মাত্র ভগবদ্গীতায় যে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ।" ভঃ ১০—৩৫, সেই উক্তি ভিন্ন এই মতের অনুকূল উক্তি বা প্রমাণ আর কোথাও দেখি নাই। শঙ্কর-ভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি বলিয়াছেন যে ঐ মাস প্রাচুর্য্যময় ও ধনধান্য-পূর্ণ বিভূতিযুক্ত এজন্য ভগবান উহাকে তাঁহার স্বরূপ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই যুক্তি সন্তোষজনক মনে হয় না। কিন্তু গীতার ঐ অধ্যায়ের আলোচনা করিলে এই মনে হয় যে ভগবান উহাকে বৎসরের প্রথম মাস মনে করিয়া এ কথা বলিয়াছিলেন। গীতার প্রধান প্রধান ভাষ্য ও টীকাকারগণ দার্শনিকভাবে বিভোর হইয়া এই বিষয়টী লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু সূর্য্য পণ্ডিত নামক একজন জ্যোতির্ব্বিদ ভাষ্যকার গীতার ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে মার্গশীর্ষ ও আগ্রহায়ণিক একার্থবোধক শব্দ। এই শেষোক্ত শব্দের দ্বারা বৎসরের প্রথম দিন যে মার্গশীর্ষী পূর্ণিমার দিন হইতে আরম্ভ হইত তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। অন্য কোন ব্যাখ্যা সমীচীন মনে না করায় যদি এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করি, তাহা হইলে মনে হয় যে ভগবদ্গীতার

উক্তি আগ্রহায়ণিকা শব্দের প্রকৃতিগত ভ্রমাত্মক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অমর সিংহ বাগ্‌ভট্ট প্রভৃতি লেখকগণ গীতার উক্তির অনুসরণ করিয়া মার্গশীর্ষ মাসকে বৎসরের প্রথম মাস স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন। যে সময় দেশীয় পণ্ডিতগণ আগ্রহায়ণিকা শব্দের ভ্রম-পরিপূর্ণ ধারণা করিয়াছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যের সেই যুগে ঐ সকল মত প্রচলিত ছিল বা সেই সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে ইহা মনে করা যাইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে বুঝিতে চেষ্টা করিলে ঐ শব্দের উৎপত্তি হইতে এই সকল ভ্রম হওয়ার কোন কারণ নাই। আগ্রহায়ণিকা একটী সমাস-নিষ্পন্ন পদ, সুতরাং ইহা দ্বারা বৎসরের প্রথম মাস বুঝায় না, যেমন জ্যৈষ্ঠের নাম উল্লেখ করিলে জ্যেষ্ঠ বা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মাস বুঝায় না সেইরূপ আগ্রহায়ণিকা শব্দের দ্বারা অন্য অর্থ কিছুই বুঝায় না। কিন্তু ঐ সময় মৃগশিরা যে আদ্য নক্ষত্র ছিল এ ধারণা লুপ্ত হইয়াছিল এবং দেশীয় বৈয়াকরণিকগণ মনে করিলেন যে ঐ মাসই বৎসরের প্রথম মাস এবং ঐ নক্ষত্র হইতে বৎসর আরম্ভ হয় না। একবার এই মত প্রচলিত হইয়া গীতায় উক্ত হওয়ায় দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে উহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কারণ তাঁহারা সকলেই গীতার মত সমর্থন করিতে উৎসুক ছিলেন।

ভক্তি-কথা।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ বিদ্যাভূষণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নামাস্ত্র লইয়া নামীবল-দৃপ্ত হইয়া সাধক যখন বীরবিক্রমে সংগ্রাম করেন, তখন তাঁহার সেই নামাস্ত্র নিরপরাধ নিশিত হওয়াতেই নিঃসন্দেহ বিজয়-লাভ হয়। ডাকার মত ডাক্‌তে পার্‌লে হরি কি কখনও থাক্‌তে পারেন? কৃপণের ধনের ন্যায় নামধনই যেন সর্ব্বস্বধন জ্ঞান হয়। ভগন্নামের পাপ-সংহারিণী শক্তি সংঘোষকবচন হার বিন্যাসে পুরাণাদি ভক্তিশাস্ত্র সমূহ সমলঙ্কৃত।

শুনিলে গোবিন্দরব, আপনি পালাবে সব,
সিংহনাদে যথা করিগণ।

পাপেই যমের ভয়, কিন্তু নামের বলে পাপ পলাইলে সে ভয় জয় অবহেলেই হয়। স্বয়ং যমরাজ বলিতেছেন,—

জিতং তেন জিতং তেন জিতং তেন যমাদ্ভয়ং।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষর দ্বয়ং।
জিত তার জিত তার জিত তার যম-ভয়।
জিহ্বাগ্রে বিরাজে যার হরি এ অক্ষরদ্বয়।

নিখিল-ধর্ম্মতত্ত্ব-কল্প-ভাণ্ডার, বেদের সার সর্ব্বস্বধন হরিনাম তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভারত-ভাগবত-ভূষণ ভীষ্মদেব বলিয়াছেন। "জীবন-বনপাথেয় ভবরোগহর। দুঃখ শোকহারী "হরি" নাম দ্বি-অক্ষর।" বিবিধ-বিপদ-সঙ্কুল মানব-জীবন ভীষণ অরণ্যই বটে। সে বিষম বনপথে পাথেয় একমাত্র হরিনাম। দুরারোগ্য ভবরোগের হরিনামই একমাত্র ঔষধ।

শোকদুঃখের নিত্য-ক্রীড়া ভূমি এই মানব-জীবনের পক্ষে হরিনামই একমাত্র সান্ত্বনা। শ্রীহরির চরণ-সরোজ ধ্যান করিতে করিতে যে ভক্ত কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্ববিধ কামকর্ম্ম হইতে মুক্ত হন। মুক্তি-পথই ভক্তি-মন্দিরের পথ। বাসনা-বন্ধযুক্ত জীবের সে ভক্ত হবার অধিকার কোথায়? সুতরাং জন্মজন্মান্তর-সেবিত সংসার-দাসত্ব বিসর্জ্জন দিয়া চিরবাঞ্ছিত কৃষ্ণ-দাসত্ব লাভ করিতে হইবে। প্রথমতঃ নামে পাপনাশ, পরে পাপপুণ্য উভয় কর্ম্মের বীজ বাসনার বিনাশ, অর্থাৎ মুক্তি। পরে প্রকৃত ভক্তি লাভ এবং সর্ব্বশক্তিময়ী সেই কৃষ্ণ-ভক্তির প্রভাবে কৃষ্ণদাসত্ব-লাভ। তাহাই জীবের পরমপদ, চরম সম্পদ। ভক্তচূড়ামণি ভৃগু মুনি বলিয়াছেন,—

নামৈব তব গোবিন্দ কলৌ ত্বত্তঃ শতাধিকং।
দদাত্যুচ্চরণান্মুক্তিং বিনৈবাষ্টাঙ্গ যোগতঃ।

হে গোবিন্দ! তব　নামের গৌরব
তোমা হতে শত গুণে।
উক্তি মাত্র ফলে,　মুক্তি কলিকালে,
অষ্টাঙ্গ যোগাদি বিনে।

নাম ভজে, নামীকে পাওয়া আর নামনামীতে মিলে যাওয়া, এই মহাভাব চিত্র মহাভাব-রূপিণী রাধাঠাকুরাণীর চারু-চরিত্রে বিচিত্র বর্ণে সুচিত্রিত। ইহা গোলকের গুপ্তরসতত্ত্ব, জীবের ভাগ্যে ব্রজলীলায় সুব্যক্ত। ততোধিক কলির জীবের ভাগ্যে গৌর-লীলার উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে জগৎ ব্যাপ্ত। আহা! এই

মহাভাব-রসের কণিকা ঘ্রাণেও আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। কিন্তু, এমন কপাল! কর্ম্মদোষে গৌরপ্রেম-প্লাবিত দেশে প্রসূত, পরিবর্দ্ধিত হইয়া অচল পাষাণ তুল্য হইয়া আছি।

দান ব্রত তপো যজ্ঞ শ্রাদ্ধ বা পিতৃ-তর্পণ।
সকলি নিষ্ফল লোকে বিনা হরি-সংকীর্ত্তন।

কলির সাধন-শাস্ত্র তন্ত্র-কর্ত্তা স্বয়ং সদা শিব, বৈষ্ণব-তন্ত্র-নিচয়ে যত্রতত্র হরিনাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সেই স্থানে ভোলানাথ একেবারে ভাবে ভুলিয়া প্রেমে গলিয়া হৃদয়-ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। যৎকিঞ্চিৎ তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস লিখিত হইল।

যঃ পতত্যবনৌ গীত্বা হরের্ণামানিগদ্গদঃ।
ভাবেন তস্য গোবিন্দঃ ক্রীতো ভবতি নান্যথা॥

হরি-গানে রত, ভাবে গদগদ
ভূতলে লুণ্ঠিত যেই।
শ্রীগোবিন্দ হন, তাঁর কেনা ধন,
ইহাতে সংশয় নেই।

যে অকৈতব ভক্ত হরিনাম-গানে ভাব-গদগদ হইয়া দশা-প্রাপ্ত ও ভূপতিত হন তাহারই জন্ম সার্থক। কারণ জগচ্চিন্তামণি ধন তাহারই কেনা হন। কেনা বস্তুতে ক্রেতার পূর্ণাধিকার; অতএব নিরপরাধ নাম মাত্র মূল্যে ভগবানে ভক্তের পূর্ণাধিকার হয়। ফলিতার্থে যিনিই মূল্য তিনিই বস্তু। হরি মূল্য দিয়া হরিকে কেনাই হরির বিধান। দয়ার সীমা নাই। ভগবান তাঁহার এ হেন স্মরণাদি সাধনে কোন কালাদির নিয়মাপেক্ষা রাখেন নাই, শুচি-অশুচিত্ব বিচারাপেক্ষা রাখেন নাই, নামই স্বতই শুচি। নাম গ্রহণেই সর্ব্বদোষ নিরাকৃত হয়। যাহা যত প্রয়োজনীয়, তাহা তত সুলভ হওয়াই প্রার্থনীয়। দয়াময়ের রাজ্যে ব্যবস্থাও তদ্রূপ। জগজ্জীবন বায়ুতে সর্ব্বদা আমাদের প্রয়োজন, এই জন্য বায়ু সদাই সর্ব্বত্র সুলভ। স্থান সাপেক্ষতা না থাকায় এই ভৌতিক জগজ্জীবন যেমন সুলভ, কাল সাপেক্ষতা না থাকাতে আধ্যাত্মিক জগজ্জীবন নামও তদ্রূপ সুলভ।

পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন চেষ্টা, ভেলায় সাগর পার হবার চেষ্টার ন্যায় অনন্তের গুণ বর্ণনা ক্ষুদ্র কীটতুল্য মনুষ্য দ্বারা হওয়া নিতান্ত হাস্যাস্পদ। কিন্তু ভগবানের নিভৃত নির্ম্মিত সাধের ভক্তহৃদয় যখন ভগবৎ কৃপার ভার আর বহন করিতে

পারে না, তখন তাহা আপনি উচ্ছলিত হয়। ভক্ত তখন ভাবাবেগে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠ হইলেও নয়ন কোন বাধাই মানে না। সেই ভুবন-পাবন নীরব নয়ন-ধারা কবি-কোটি-কল্পিত স্তুতি-গীতিকেও পরাস্ত করে। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এমন পাবন ভয়ভঞ্জন নামামৃত রসায়ন পানে রুচি হইল না। সবই আমাদের ভাগ্যের দোষ, আর দোষ দিব কার? সাধক কবি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "দোষ কারো নয় গো মা! আমি স্বখাদ সলিলে ডুবি মরি শ্যামা।" ঠিক কথা। গীতায় কথিত আছে, আত্মাই আত্মার শত্রু ও আত্মাই আত্মার মিত্র। কলম যদি সিঁদকাঠি হয়, তবে সে দোষ কাহার? ভগবৎ বিমুখতার ন্যায় দুর্দ্দৈব আর নাই, হইতেও পারে না। হায়! কৃষ্ণ! সেই ভগবৎ বিমুখতাই আমাদের সহজভাব হইয়া উঠিয়াছে।

মানব জন্মেই ভগবদ্ অনুরাগ জাগে, ভগবৎ বিরহ লাগে; তাই সাধন ভজনের ব্যবস্থা। তাই বেদ পুরাণ তন্ত্র—স্তুতি গীতি মন্ত্র। তাই যাগ যজ্ঞ তীর্থ-ধর্ম্ম, জ্ঞান-ভক্তি-যোগ কর্ম্ম। তাই যুগে যুগে অবতার। কলিযুগে মহা-প্রভুর নাম প্রেম প্রচার। নাম-নামীর সাধ্য-সাধন তত্ত্বের বিকাশ।

নামানুরাগশূন্য যে নাম করা, তাহা "নামাভাস" মাত্র হইলেও, তাহারও যে অসাধারণ শক্তি, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক যুক্তি বিজ্ঞান-প্রিয় অনেকের তাহাতে হয়ত আস্থা নাই। এইজন্য তাঁহারা সানুরাগ—নিরনুরাগ উভয়বিধ নাম সাধন ছাড়িয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। ইহা কেবল কলি-কুহকের ক্রিয়াফল মাত্র।

নিরনুরাগ নামে বা নামাভাসে পাপ যায়, সানুরাগ নামসাধনে পুণ্যও যায়। অর্থাৎ পাপ পুণ্য দ্বন্দ্বাত্মিকা বাসনাই যায়। "ন পাপং ন পুণ্যং ন সৌখ্যং ন দুঃখং" অবস্থা অর্থাৎ মুক্তাবস্থা লাভ হয়, কিন্তু সাধককে নৈষ্কর্ম্ম্য বা মুক্তি দিয়াই নামের কার্য্য শেষ হয় না। কামপাশ হইতে মুক্তি দিয়া নাম স্বীয় সাধককে আবার প্রেমপাশে বন্ধনের আয়োজন করেন। কিন্তু সে বন্ধন প্রকৃত বন্ধন নহে; তাহা মুক্তিরও মুক্তি! তাহা প্রেমানন্দময়ী পরাভক্তি! সে পাশ নহে! সে পরমার্থ-পরিমলময় হরি-প্রেম-পুষ্প হার! সে হার পরিতে ব্রহ্মলোক ব্যগ্র। শিবলোক পাগল! নরলোকের আর কথা কি?

মুক্তির পর যে বাঁধন—যেমন গৃহিণীর বাঁধন; তাহার একটা কথঞ্চিৎ পার্থিব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা আমরা কিছু আভাস লইলে পাইতে পারি।

মনে করুন, সমস্ত দিনের সর্ববিধ গৃহকার্য্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, নিভৃত নিশীথে সতী কুলবতীর পতি-প্রেমালিঙ্গন-পাশ কেমন? সেও ত বন্ধন বটে, কিন্তু কি স্পৃহণীয়, প্রাণারাম ও পরমানন্দময়! সেইরূপ সিদ্ধ ভক্ত সাধুগণ সংসার-মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া, সেই গোপীকান্তের করুণকটাক্ষে গোপী-কৃপাশ্রয় ও প্রকৃতি-ভাবাশ্রয় লাভ করিয়া, সেই পরম পুরুষ প্রাণপতি কৃষ্ণধনের পাদপদ্মের প্রেমালিঙ্গনে পরম কৃতার্থ ও চরম চরিতার্থ হইতে পারেন। এ যদি বাঁধন হয়, তবে এ বাঁধনের জন্যই সকল সাধন। এই বাঁধনের জন্যই সাধকের মুক্তি বা বিষয়-বাঁধন-বিমোচন। এ বন্ধনে যে ধন নাই; এ পীযূষ-প্রলেপ! এ যে কৃষ্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকার রজত-রশ্মি-রজ্জুর-বন্ধন! "যে বাঁধনে রাধা বাঁধা রাস-কেলি-কুঞ্জে; রাধাপদ-রেণু হয়ে ভক্ত তাহা ভুঞ্জে॥" কিন্তু জীব মুক্তিলাভে শিব না হলে সে ভক্ত হতে শক্ত হয় না।

"সংসার সন্ন্যাসী শিব নিত্যমুক্ত তত্ত্ব।
হরি-প্রেমে বাঁধা পড়ে হরি-নামে মত্ত॥"

নামে রুচি না হইলে কিছুই হইবে না। ভজনপথে একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না। টিকী-বাঁধা, নামাবলী ছাঁদা, কণ্ঠী আঁটা, তিলক কাটা, ছেঁড়া কাঁথা, নেড়া মাথা, গেরুয়া, করোয়া কিছুতেই কিছু কুলাইবে না। একমাত্র নামে রুচির অভাবে অপর কোটী উপকরণে কোটী কল্পেও কৃষ্ণপূজা হইবে না।

"নামাভাসে অপরাধ এড়ি পাপ যায়।
রুচিযোগে অনুরাগে নামে প্রেম পায়॥"

এই শিক্ষা ভুলিয়া আমরা নামাভাস শক্তির সাহায্য লাভে অনেক সময়েই বঞ্চিত হইতেছি। একদিকে যেমন সে শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, অপরদিকে অমনি অপরাধে তাহা অপব্যয়িত হইতেছে। তবে আর আশা কোথায়?

আশা আছে। আমাদেরই রুচির অভাব; অমৃতের ত অভাব নাই। হরিনামের ত আর লোপ হয় নাই। যখন নাম আছে তখন সব আছে; সুতরাং আশাও আছে। আমরা সদাই সাপরাধ হইলেও এবং নাম না পাইলেও, নামাভাসেই আমাদের নির্ভর করিতে হইবে। জলনিমগ্ন ব্যক্তির ভগ্ন-কাষ্ঠ-খণ্ডও আশা-স্থল। এই অধমাধিকারে নামাভাসও আমাদের আরাধ্য ধন। গুরু-কৃপা সার করিয়া এই নামাভাস নিয়াই আমাদের পড়িয়া থাকিতে হইবে। নামাপরাধীকে নামই নিস্তার করিবেন। মাটিতে পড়িলে লোকে আবার সেই মাটি ধরিয়াই উঠে। নামাপরাধীর নামাশ্রয়-প্রপন্নতাও এই প্রকার। নামে

রুচি আসিলে আর নামাপরাধের ভয় থাকে না। ফলে ভজন সাধনের এমন উপযুক্ত নরদেহ লাভ করিয়া অমৃত ছাড়িয়া বিষ পান করার মত আর দুরদৃষ্ট কি হইতে পারে? আমাদের প্রতি ভগবান বিমুখ নহেন, আমরাই তাঁহার প্রতি বিমুখ, সুতরাং কাহার আর দোষ দিব? এ জীবন ভগবানেরই যন্ত্র, ইহাই আত্মসমর্পণ। এ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ সবই তিনি। ফলে তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ। এই ভাব সিদ্ধ হইলেই জীবন উপাসনাময় হয়। জীবের যাবতীয় দুঃখই অজ্ঞানমূলক, জীব ভগবানের শরণাপন্ন হইলে তিনি অজ্ঞান তিরোহিত করেন। তখন জীবের সমস্ত দুঃখ নিবৃত্ত হয়। সংসারের সকল সুখই সেই প্রেমসিন্ধুর বিন্দু মাত্র। যে সিন্ধু পায় সে বিন্দু চাহিবে কেন? ভক্তের ব্যবসাদারী নাই। ভক্ত, ভগবানের বিনিময়ে কিছুই চাহেন না। ভক্ত-কুলতিলক প্রহ্লাদ ভগবানকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন, যথা—"যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।" ভক্তপ্রবর ধ্রুবও বলিয়াছিলেন, যথা,—নাথঃ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে।" নব জলধরের বারি বিনা চাতকিনীর পিপাসা-নিবৃত্তি হয় না। ভক্ত মুক্তি পর্য্যন্তও তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি, সেবানন্দ ভিন্ন আর কিছুই চাহেন না। সিন্ধু ছাড়িয়া গোষ্পদে যার আসক্তি জন্মে, সে নিতান্ত মূঢ়। প্রেমসিন্ধু ছাড়িয়া যে পানা পুকুরে অবগাহন করে, তদপেক্ষা মূর্খ আর কে আছে? কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! দুর্দ্দিন যায় না, সুদিন আসে না। ইহা জীবের কেবল ভগবৎ বিমুখতার ফল। সমস্ত শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে, সেই একজনকে না জানিলে কিছুতেই জীবের দুঃখ দুর্দ্দিন ঘুচিবে না। কিন্তু বিষয়-বিষ-পানে জীব চৈতন্যহীন। স্বয়ং ভগবান আসিয়া হাত ধরিয়া ভবপারে লইয়া যাইতে চান, তবুও জীব বিমুখ। সত্যই তিনি দয়াময়, কিন্তু আমরাই তাঁহার দয়া লইতে জানি না। জানিলে দুঃখ দুর্দ্দিন থাকিবে কেন? কলির জীব, ক্ষীণশক্তি স্বল্পায়ু সাধন-ভজনে অসমর্থ দেখে যিনি অতি সহজ নামকীর্ত্তন জগতে প্রচার করিলেন, তাঁহা অপেক্ষা কৃপাসিন্ধু আর কে আছে? যে নামের গুরুকরণ নাই, পুরশ্চরণ নাই, নাম গ্রহণে কালাকাল, শুচি অশুচি বিচার নাই, যাহার হেলায় উচ্চারণেও পাপবীজ নাশ হয়, এমন সহজ নিস্তারের উপায় আর কি হইতে পারে? অর্থের অপেক্ষা নাই, সামর্থ্যের অপেক্ষা নাই, দ্রব্য-সম্ভারের আবশ্যকতা নাই, সমর্থ বাগ্যন্ত্র আছে, তাহার সাহায্যে শুধু নাম গান করা, ইহা অপেক্ষা সুলভ পন্থা আর কি হইতে পারে?

একমাত্র ভগবচ্চরণাশ্রয় ভিন্ন এ ভবনীরধি-নিরাশ্রয়ে আর উপায় কি? উপায় কেবল সে পায়, সে পায়ে স্থান না পেলেই নিরুপায়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রশ্নোত্তর সন্দর্ভে লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

ডুবে মরি হায়! কি আছে আশ্রয়
অপার সংসার-সমুদ্র মধ্য।
কহ কৃপা করি, গুরো! কৃপাময়
মহা তরী হরি-চরণ-পদ্ম।

হরির পদ-তরি একথা দুটা আমাদের খুব জানা শুনা আছে, কিন্তু উক্ত বাক্যদ্বয়ের লক্ষ্য বস্তু দুটি যে কি তাহা আমাদের বুঝিবারও আবশ্যকতা নাই। ভবসিন্ধু-তুফানে আমরা সবাই হাবুডুবু খাইতেছি। ডুবিতেছি আর ভাসিতেছি, কিন্তু বাহ্যসংজ্ঞা-বিহীনতায় তাহার কিছুই অনুভব হয় না। এই ভাসা ডোবাই জীবের জন্মজন্মান্তর। ঐ সমুদ্রে অনন্ত কর্ম্মাবর্ত্তের পাকে পড়িয়া এইরূপ শত-কোটি কল্পও এইরূপ ডোবা ভাসা চলিতে পারে। তারপর ভগবৎ কৃপায় যে বারের ভাসায় সংজ্ঞার উন্মেষ হয় সেইবারেই পারে যাইতে ও সেই পদতরি পাইতে যথার্থ ব্যাকুলতা জন্মে। এবং গুরু-কৃপায় আলম্বলাভও হয়। আলম্ব-লাভ হইলে উদ্ধারের আর বিলম্ব থাকে না। ভগবদ্ভজনই সেই আলম্ব। উহা প্রাণপণে ভক্তি-ভুজলতা-বন্ধনে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিলে ডুবিবার ভয় থাকে না। ভক্ত তখন আশানন্দে ভাসিতে ভাসিতে ত্রাণ-তরণির দিকে আসিতে থাকে। আমরা মোহাভিভূত বলিয়া এহেন বিপদেও ব্যাকুলতা নাই। ব্যাকুলতা জন্মিলেই পথ খোলসা হইয়া যায়। অনন্ত বিস্তীর্ণ ভীম ভবার্ণব তুমুল-তরঙ্গ-রঙ্গের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে উথলিতেছে, আর কোটি কোটি নিরাশ্রয় নর-কীটাণু সেই অকূলে আকুল ও অচেতন প্রায় হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে। অদূরে—অথচ দূরাতিদূরে মূর্ত্তিমান পরিত্রাণ ভবতারণ ভগবান্ সেই সংক্ষুব্ধ সিন্ধু-হৃদয়ে দীনবন্ধুরূপে দণ্ডায়মান। তাঁহার রাতুল চরণ-পদ্ম তাহাতে অতুল শোভায় ফুটিয়াছে। তদ্দর্শনে স্পর্শনে সিন্ধু-হৃদয়ে প্রেমানন্দোদয়ে তুমুল তুফান উঠিয়াছে! আর তাহাই ভেদ করিয়া সে দুস্তরে নিস্তারপ্রার্থী নরকীট-নিকর নিরন্তর সেইদিকে ছুটিয়াছে। সকলেরই আশা, প্রযত্ন ও প্রার্থনা সেই ভক্ত-হৃদ্-কমল-বিলাসী হরির মরণ-হরণ-চরণ-কমলে শরণ-লাভ। জীবের জন্য চির-শরণ চরণ-তরি, সে তরি ছাড়িয়া আর তীর কে চায়? সিন্ধু তরিতে তরির প্রয়োজন, আবার তরি হইতে অবতরিতে তীরের প্রয়োজন। এ তরিতে সিন্ধু

হইতে উত্তরণই জীবের স্বার্থ। • তরি হইতে অবতরণ অপ্রার্থিত। যেহেতু ভগবচ্চরণই ভবত্রাণার্থীর চরম আশ্রয়, অবতরণ প্রার্থিত নহে। তাহাই জীবের স্বার্থসারাৎসার। চরণাশ্রয় ভিন্ন ভক্তের আর প্রাণের কামনা কি? উহাই একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং পারে যাবার জন্য চরণ-তরির প্রয়োজন নহে, চরণাশ্রয় জন্যই চরণ-তরি আবশ্যক। ইহাই ভক্তের প্রাণের কামনা। পার হয়ে জীব যাবে কোথা? সর্ব্বত্রই বিপদ মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। সুতরাং যাবারও স্থান নাই, কাজেই চরণাশ্রয়ের জন্যই চরণের আবশ্যক। নির্ভয়, নিঃশঙ্ক স্থির হইবার অমন স্থান আর নাই। সে চরণ-তরি পাইলে জীব আর তীরে উঠিতে চাহিবে কেন? তখন আর তাহার মোহান্ধকার থাকে না, সে দিব্য দৃষ্টিতে শেষ আশ্রয় স্থান, শান্তিধাম দেখিতে পায় এবং তাহাই আশ্রয় করিয়া পরিতৃপ্ত, কৃত-কৃতার্থ হয়। ইহাই শ্রুতির শেষ সিদ্ধান্ত এবং প্রকৃত হিতোপদেশ।

ভব-পারাবার হইতে উদ্ধার পাইয়া চরণ ছাড়া না হইলেই জীব চরিতার্থ কিন্তু সেই অচ্যুতের চিরচরণাচ্যুতি তাঁহারই চরণানুগ্রহ-সাপেক্ষ। ভবতরঙ্গ-বেগ-বাধ্য অবশ জীবের নিজের সাধ্য কি? সেই কৃপাময় নিজ কৃপায় পায় না রাখিলে আর উপায় নাই। ভক্ত চিরদিন সেবানন্দ-ভিখারী, তাই সে প্রভুর চরণ-রেণু হইয়া থাকিতে চায়। "শ্রীভগবানের পাদপদ্মের রেণুত্ব, অর্থাৎ তাঁহার চির-চরণ-সেবকত্ব ভক্তের প্রাণময়ী প্রার্থনায় প্রার্থিত হইলে তাহা ভগবচ্চরণে স্থান পায়। চরণে স্থান পাওয়ায় প্রার্থনাটি চরণে স্থান পাওয়া এবং প্রার্থকের চরণে স্থান পাওয়া, ফলিতার্থে একই কথা। মূল ভগবদিচ্ছা। জীবের যে পুরুষকার, ফলিতার্থে তাহাও ভগবদিচ্ছা। সুতরাং জীব স্বতই ভগবদিচ্ছায় পরিচালিত। ভক্ত বুঝেন জীবের পুরুষকারের অহঙ্কার কেবল অবিদ্যার উদগার। তাই তিনি আপনার ভগবৎপদধূলিত্ব-পরিণতি কৃপাপূর্ব্বক চিন্তা করিতে ভগবানকে অনুরোধ করেন। অহঙ্কারে জীব কর্ত্তা, অহংকারে জীব ভোক্তা; ভগবান কেবল ফলদাতা। ভক্ত কিন্তু ফল চান্ না বরং অফলই চান। ভগবানের পদধূলিত্ব প্রার্থনা, আর অহংকার বিসর্জ্জন দেওয়া একই কথা। এখন বুঝা বেশ গেল ভগবচ্চরণাশ্রয়ই জীবের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব তাহা ভুলিয়া বিষয়রসে বিভোর জ্ঞানশূন্য হইয়া আছে। সংসার-সাগরের তুমুল তরঙ্গাবর্ত্তে অবিশ্রান্ত ডুবিতেছে ও ভাসিতেছে। জীবের এই শোচনীয় দুরবস্থা, দর্শনে, করুণাসিন্ধু ভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে জীবের উদ্ধারের

উপায় বিধান করেন। কিন্তু বিষয়ের নেশা এতই প্রবল যে, তিনি ধরাধামের লীলাসাঙ্গ করিতে না করিতেই নরকীট পুনরায় নরকাভিমুখী হয়। এই জন্যই অনাদি অবিদ্যা নাশের নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, সর্ব্বদা নাম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নামের পাপনাশিনী শক্তি আছে। পাপনাশ হইলে চিত্তশুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে হৃদয়ে সত্যজ্ঞানের আলোক পতিত হয়। সত্যজ্ঞান উদিত হইলে, তখন অবিদ্যা পলায়ন করে। তখন বেশ বুঝা যায় এক ভগবানই সত্য আর সমস্তই স্বপ্নতুল্য মিথ্যা। তিনি জীবের অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল নহেন। মানব নিজের কর্ম্মদোষে ত্রিবিধ যাতনায় কষ্ট পায় এবং না বুঝিয়া ভগবানকে পক্ষপাতী বা নিষ্ঠুর মনে করে। বস্তুতঃ তিনি কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব বিধান করেন না। এ জগতে এমন কোন বিলাস-ভোগ নাই যাহাতে একদিন অবসাদ বা বীতস্পৃহ না জন্মে। আমরা যে, মন দিয়া সুখ অনুভব করি, সেই মন আত্মার যন্ত্র-স্বরূপ। সুতরাং সে কদাচিৎ প্রেমসিন্ধুর বিন্দুকণা আস্বাদ করিতে পায়। সুতরাং সে কোটিকল্প ভোগেও পার্থিব বস্তুতে সুখ পায় না। তখন সে অন্তর্মুখী হয়। তখন সে নিভৃতকক্ষে প্রেমনিধি প্রাণবল্লভ হরিকে খুঁজিতে থাকে। খুঁজিতে খুঁজিতে যে কোন জন্মে যখন সে প্রাণনাথের দেখা পায়, তখন তাঁহার চির সেবক, চরণ-রেণু হইয়া থাকে। তখন সে বুঝিতে পারে যে, ইহাই জীবন জনমের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ইহাই মুখ্য চরিতার্থতা। ভোজনের উদ্দেশ্য যেমন তুষ্টি ও পুষ্টি, জীবনের উদ্দেশ্যই তেমনি ভগবচ্চরণাশ্রয়! সেখানে কোন ভয় নাই, বাধা নাই, অশান্তি নাই, কামনা নাই, আছে শুধু সান্দ্রানন্দ। জীব যাহা চাহে তাহাই সেখানে আছে। বেশ, এক কথায় এক নিঃশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ সারা হইল। কিন্তু কথাগুলি যত সহজে বলা হইল, তত সহজে জীবের তাদৃশাবস্থা একজন্মে ঘটে না। এজন্য সাধনের অঙ্গ আর একটি শিক্ষা আছে, সহিষ্ণুতা। সেও তুচ্ছ সহিষ্ণুতায় হইবে না। তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক; তরু যেমন কত যুগ যুগান্তর অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া যেন বিশ্বপতির ধ্যান করিতেছে। ত্বকছেদে, পত্র-ভঙ্গে, শাখাচ্ছেদেও ভ্রুক্ষেপ নাই। ঐরূপ সহিষ্ণু হইয়া একমনে প্রাণধনের ধ্যান করিতে হইবে।

তাহা হইলে অবশ্যই অন্তর্য্যামী অন্তরে এসে মোহনবেশে দেখা দিবেন। বনেদী চাষার মত চাষ করা চাই, একবার চাষ করিয়া ফল হল না বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, “দেখি মা হারে কি পুত্র হারে,

আয় মা সাধন-সমরে।" খুব খাঁটি কথা। বীরের মত প্রতিজ্ঞা চাই, ভগবান সুপ্রসন্ন হয়ে দেখা না দিলে কখনও আমি ছাড়িব না, এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। তাঁকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে হয় না, তিনি ভক্তিপাশে আপনিই বাঁধা পড়েন। একটি গানে আছে, "যে ধরতে পারে, ধরা দিই তারে, নাহলে প্রেমিক সুজন সহজে কে ধরতে পারে।" বড় সুন্দর ভাব! অতল জলে না ডুবলে কি সাগরতলে রতন মিলে? একবার তাঁরে পেলে আর হারাবে না। তখন হার করে গলায় পরিতে পার। তখন যখন চাবে, তখনই পাবে, অপরূপ রূপ হেরে পাগল হবে। তাই হিতৈষী শাস্ত্র বলেন, সকল ত্যজি সার কর সেই প্রাণধনে। হৃদয়-সিংহাসনে বসায়ে ভক্তি-চন্দনে শ্রদ্ধাপ্রসূনে, প্রেমাশ্রু-বারি-সিঞ্চনে জীবনের জীবন প্রাণধনের রাতুল চরণযুগল নির্নিমেষ-নয়নে দর্শন কর, ধ্যান কর, পূজা কর। ভক্তি-ভুজলতা-বন্ধনে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখ। সাবধান থাক, জেগে থাক, যেন সাধের সাধে বাদ না পড়ে। আহা! এমন সৌভাগ্য কি জীবের হবে? স্মরণ করিলেও পুলকে শরীর শিহরিয়া উঠে। হা গোবিন্দ প্রাণ-বল্লভ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

•

জীবকে আপন করিয়া লইতে করুণানিধি ভগবান, সদাই প্রস্তুত। যেহেতু, জীব তাহা হইতে এসেছে, আবার তাঁহার নিকটই যাবে। কেবল ভাগ্যদোষে পথভ্রান্ত হয়ে জীব কষ্ট পায়। সেই কষ্ট বিমোচনের জন্য, তিনি এ জগতে নানারূপে নানাভাবে দেখা দেন। বিনা বলপ্রয়োগে মাত্র হৃদয়ের প্রেমে ও দয়ায় জগৎ জয়, বুদ্ধাবতারে ও শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গই পৃথিবীতে প্রেমভক্তি প্রদর্শন ও প্রচার করেন। উহা মধুর ভাবের অন্তর্গত এবং উহাই শ্রেষ্ঠভাব। ভগবানকে আমরা দেখিতে পাই না কিন্তু তাঁহাকে যে কোনও ভাবে ভালবাসিতে পারি। আমরা যখন সগুণ ঈশ্বরের উপাসক, তখন আমরা যে কোন ভাবেই তাঁকে ভাবিতে পারি। ভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন, যে আমায় যে ভাবে ডাকে, তাহাকে আমি সেইভাবেই দেখা দিয়া থাকি। ভগবানকে পাই না বলিয়া মানবের মনে চিরদিন যে আক্ষেপ ছিল, সেই আক্ষেপ দূর করিবার জন্য ভগবান নবদ্বীপ-ধামে শচী দেবীর গর্ভে জন্ম করিয়া জগতে অনন্তশক্তি হরিনাম প্রচার করিলেন। এবং ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, নামে ও নামীতে কোনও ভেদ নাই। নামের ভিতরেই নামী বিদ্যমান আছেন। নাম নামীর অভিন্নতা ব্যতীত কখনই নামের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি হইতে পারে না। নামযজ্ঞই কলির প্রধান যজ্ঞ ইহাও শ্রীগৌরাঙ্গ

মহাপ্রভু প্রচার করিলেন। সুদীন কলির মানবের সাধন ভজনের ইহা অপেক্ষা সহজ পন্থা আর হইতে পারে না।

নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক দিবানিশি হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারিলে সর্ব্ব পাপক্ষয় হইবে, পাপক্ষয় হইলে শ্রদ্ধা রতি জন্মিবে। তাহা হতে অনুরাগ, ভক্তি, প্রেম জন্মিবে। হরিতে প্রেমোদয় হইলে জীবনের প্রয়োজন সমাধা হইবে। ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে, আর কিছুই বাকী থাকিবে না। আমরা কোটিকল্প সুখ অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই আশা, বাসনা পূর্ণ হইতেছে না। যে হেতু সে সব বস্তুর হয় আদিতে বা মধ্যে বা অন্তে ঘোর দুঃখ। সুতরাং সুখের পরিবর্ত্তে তাহাতে দুঃখই পর্য্যাপ্ত। এজন্য মন তাদৃশ সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। মন অবিচ্ছিন্ন অবিমিশ্র সুখপ্রবাহ অন্বেষণ করে। মন কখনও তাদৃশ সুখের কিঞ্চিৎ অস্বাদ পাইয়াছে, তাই যেন সে পার্থিব দুঃখমিশ্র ক্ষণিক সুখে বিতৃষ্ণ। নিত্য আনন্দ স্বরূপ শ্রীহরি, তাঁহার চরণ-সরোজ মকরন্দ-নিঃস্যন্দ-বিন্দু যে পান করিতে সমর্থ হয়, সে চিরদিনের মত পরিতৃপ্ত হয়। যদিও আমরা সাক্ষাৎ স্বরূপে তাঁহাকে পাই না বটে, কিন্তু তাঁহার নামটি পাই। তাঁহার নামাশ্রয় করা আর তাঁহার চরণাশ্রয় করা একই কথা। অতএব সন্দেহশূন্য হইয়া শ্রীহরির নামে সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর করা কর্ত্তব্য। হরের্ণামৈব কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" এই কথাটি অণুমাত্র মিথ্যা নহে, খাঁটি সত্য।

লোকেও দেখা যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নাম করিয়া মানব অনেক স্থলে বিপদ হইতে নিস্তার পায়। সুতরাং নামের যে শক্তি আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ধনীর নামের, রাজার নামের শক্তি প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয়, আর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতির নামে শক্তি নাই, ইহা ভাবাই অনুচিত। বৈষ্ণব শাস্ত্রে দেখা যায় কত শত কঠিন রোগগ্রস্ত নর ভক্ত-কৃপায় নাম-মাহাত্ম্যে রোগমুক্ত হইয়া গিয়াছে। হরি-নাম-মাহাত্ম্য যিনি প্রশংসাবাদ মাত্র মনে করেন তাহার কোটি কল্পান্তেও নরক-নিবৃত্তি হয় না। মহাপুরাণ ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে লিখিত আছে যন্নাম বিবশো গৃণন্, অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়সমূহ অবশ হইয়া যায়, সেই সময়ও যদি কোন সংসারী জীব ভগবান শ্রীহরির নাম মুখে উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও সে সদ্য ভববন্ধন-মুক্ত হয়। আর যে, যম-ভয়ে, মৃত্যু-ভয়ে জীব সদা ভীত, সেই যমও সে নাম হইতে ভয় পান। সুতরাং হরিনামই যে কলির মানবের একমাত্র আরাধ্য, উপাস্য, আশ্রয়ণীয় এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। তপস্যা, ধ্যান, যোগ, যজ্ঞ, এ সমস্ত ক্ষীণশক্তি স্বল্পায়ু কলির মানবের

সাধ্যায়ত্ত নহে। এ জন্যই ভগবান গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া গোলোকস্থ গুহ্য মহামন্ত্র হরিনাম আনিয়া দয়া করিয়া পৃথিবীতে প্রতিগৃহে প্রচার করিলেন। এমন মাহেন্দ্র যোগ, শুভ মুহূর্ত্ত আর হইবে না। এমন সহজপথ পেয়েও যদি মানব, অলসে অবিশ্বাসে অমূল্য জীবন-রতন কাল-সলিলতলে বিসর্জ্জন দিতে চায়, তদপেক্ষা দুর্দ্দৈব আর কি?

যে মহাপ্রভু অনন্ত শক্তি হরিনাম ও প্রেমভক্তি জগতে প্রচার করিয়াছেন, সমগ্র জগৎ তাঁহার চরণে চিরঋণী থাকিবে। যিনি কৃপা প্রকাশে পাদরজ-স্পর্শে বঙ্গদেশকে পবিত্র করিয়াছেন, তাঁহার মহা মহিমার উচ্চসৌধ নির্ম্মাণ পক্ষে বাঙ্গালী জাতি যাহা করিয়াছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর। অন্য দেশ হইলে তাঁহার জীবনচরিত নব নব ভাবে রাশি রাশি গ্রন্থ প্রচার, তাঁহার লীলাস্থানের স্মৃতি-চিহ্ন অক্ষুণ্ণ রাখিবার কত প্রকার চেষ্টা হইত। যদিও তিনি মানবকুলের হৃদয়রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন, তথাপি তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের চিহ্ন প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের অবতার, সিদ্ধ মহাত্মাদিগের, আচার, ব্যবহার, কার্য্যকলাপ, উপদেশ, প্রতিনিয়ত বৈদেশিকেরা গ্রহণ করে, আর আমরা সে বিষয়ে পরাঙ্মুখ থাকি। শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ে এদেশে এ পর্য্যন্ত যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট বলা যায় না। তবে শিক্ষিত সম্প্রদায এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। এবং তাঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বর্ণনা, উৎপত্তি স্থান নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট প্রযত্ন প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। উপাসনামার্গে প্রেমভক্তি-প্রয়োজনীয়তা-শিক্ষার যিনি আদর্শ শিক্ষক, সেই মহাপ্রভুর মূর্ত্তি প্রতিগৃহে সমাদরে পূজিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, শিক্ষা সমস্তই মানবের আদর্শ স্থল। শতজন্ম গান করিয়াও আমরা তাঁহার গুণাবলী ব্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইতে পারি না। ব্রাহ্মণ জাতি ও বাঙ্গালী, তাঁহার জন্মে কৃতকৃতার্থ হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহার উপযুক্ত সময়েই আবির্ভাব হইয়াছিল। যে সময় তান্ত্রিক ও তার্কিকদিগের হাতে পড়িয়া ভগবদুন্মুখ প্রাণ পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল এবং প্রাণের সহিত ভগবানকে ডাকিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই নবদ্বীপ-উদয়াচলে শ্রীগৌরাঙ্গ-চন্দ্র উদিত হইলেন।

পরিত্রাণায় সাধূনাং এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রতিপালনার্থ আবার প্রেমভক্তির উজ্জ্বল মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ভক্তের সম্মুখে দেখা দিলেন। তাঁহার উদয় মাত্রেই নিপুণ ভক্তেরা নিজ প্রাণধনে চিনিয়াছিলেন। অনেকে লীলা-বিলাসকালে চিনিয়া লইলেন। যিনি নিজে নিজে কাঁদিয়া জগতের পশুপক্ষী পর্য্যন্তও কাঁদাইয়া গিয়াছেন, যাঁহার স্মৃতি এখনও মানবের হৃদয়ে উজ্জ্বলভাবে

বিরাজ করিতেছে, এখনও যাঁহার প্রচারিত জগন্মঙ্গল মধুর হরিনাম মৃদঙ্গবাদ্য যোগে প্রতি গৃহে কীর্ত্তিত হইতেছে, তাঁহার এ অক্ষয় কীর্ত্তি কখনও ধ্বংস হইবে না। যদিও তিনি সন্ন্যাসাশ্রয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি প্রকৃত আদর্শ বৈষ্ণব। সর্ব্বশাস্ত্র যাঁহাকে জানিতে বলে, যিনি জীবের জীবন, যিনি পতিতপাবন, তিনিই সেই শচীনন্দন। শুধু ফুলচন্দন দিয়া পূজা করিলেই পূজা হয় না। যিনি আরাধ্য দেবতা, তাঁহাকে পবিত্র হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া মানস-সরস-কুসুমে দিবা-বিভাবরী পূজা করিতে হইবে। তাঁহার উপকারের আমরা কি প্রত্যুপকার দেখাইতে পারি? আমরা কৃতঘ্ন! আমরা তাঁহার কৃত মহদুপকারও একবার স্মরণ করি না। কি আক্ষেপের কথা! আমরা চক্ষুহীন, তাই বস্তু দেখিতে পাই না, জ্ঞানহীন, তাই স্বর্ণ, কাচ চিনিতে পারি না, প্রকৃত দয়াল বন্ধু চিনিতে পারি না। তিনি স্বয়ং যেচে যেচে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, নাম বিতরণ করিলেন, তবুও লোকের নামে রুচি জন্মিল না! হায়! কি দুর্দ্দৈব! পারের তরি গৃহদ্বারে বাঁধা রইলো তবুও কেহ পার হইল না, ইহার চেয়ে দুরদৃষ্ট আর কি?

জীবের এমনই দুরদৃষ্ট যে, সে সতত ভগবৎ-বিমুখ। স্বয়ং ভগবান এসে হাত ধরে পারে লইয়া যাইতে চাহিলেও সে বিষয়-বিষ-পানে বিচেতন হইয়া থাকে। জীবের এই দুরদৃষ্ট-ক্ষয়ের জন্য সতত হরিনাম-মহামন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। নাম লইতে লইতে দুর্দ্দৈব বিভাবরীর প্রথম যামে প্রবোধ-চন্দ্র উদিত হইবেন। তখন সমস্ত বিষয়-তৃষ্ণার শান্তি হইবে। সমস্ত শ্রেয়ো বিধানার্থ হরিনামই প্রধান অস্ত্র। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, নাম স্মরণ, শ্রবণ, কীর্ত্তন কলির হতভাগ্য মানবের একমাত্র মঙ্গলসাধন। নামে গাঢ়ানুরাগ জন্মিলে, তখন বর্ণাশ্রয়োচিত বিধি-বিধান লঙ্ঘন করিলেও প্রত্যবায় হইবে না। সমস্ত কার্য্যের প্রতিনিধি নাম, "হরের্ণামৈব কেবলং" একমাত্র হরিনামই এ যুগে সারাৎসার ও আরাধ্য। প্রেমে বিভোর হয়ে, নেচে নেচে ঐ নাম গান কর, যেন "হ" বলিতে নয়ন বিগলিত হয়। প্রেমাবতার গৌর গুণনিধির কীর্ত্তনানন্দে, জগন্নাথ উচ্চারণ করিতে জ, গ, গ, এইরূপ প্রেমে গদ গদ স্বর উচ্চারিত হইত। নাম করিতে যাহার নয়ন বিগলিত হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, ধরণীভূষণ সেই মহাজনই ধন্য। হে শচীনন্দন! ভক্তবৎসল! পতিতপাবন! এ অধমের প্রতি দয়া কর, যেন এ দীনাতিদীনের নামে উৎকট রুচি জন্মে।

(ক্রমশঃ)

কৃত্তিবাস-প্রসঙ্গ।

লেখক—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(হিতবাদী হইতে উদ্ধৃত)

("কৃত্তিবাসের বার্ষিক স্মৃতিসভায় পঠিত।")

আমাদের পূজ্য কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত, তাঁহার জন্মভূমি এই ফুলিয়াকে "গ্রাম-রত্ন" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ উক্তি বাস্তবিকই কবির কল্পিত বর্ণনামাত্র নহে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্যের সমুজ্জ্বল বর্ণনা। মহাকবি কৃত্তিবাস যে সময়ে এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তখন হিন্দুসমাজ জ্ঞান ও ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠরত্ন বিবেচনা করিতেন; তাই জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকের নিকেতন ফুলিয়াও "গ্রামরত্ন" বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-বংশের সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা প্রকাশক কৌলীন্যের কেন্দ্রভূমি স্বরূপ এই ফুলিয়া আজ জনশূন্য জঙ্গলাবৃত বটে; কিন্তু এই ফুলিয়াই একদিন শ্রেষ্ঠ সমাজের মধ্যে এমন বিখ্যাত ছিল যে, ছত্রিশ মেলের শ্রেষ্ঠতম মেলের নামকরণ এই গ্রামের নামেই হইয়াছিল। ঘটকচূড়ামণি দেবীবর এই বিখ্যাত গ্রামরত্নকে অমর করিয়া গিয়াছেন, আজ বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরে এই ফুলিয়ার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। আর একজন মহাপুরুষ এই ফুলিয়াকে চিরস্মরণীয় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বরণীয় করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার পবিত্রতাপূর্ণ বৈষ্ণব সাহিত্য গৌরবান্বিত ও সমুজ্জ্বল সেই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়ভক্ত সাধক হরিদাসের সাধন-পীঠ এই ফুলিয়ার মহাকবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাস্তুভিটার অদূরবর্ত্তী পূর্ব্বভাগেই অবস্থিত। সুতরাং আজ আমরা এই ফুলিয়াকে সাহিত্য-তীর্থের ত্রিবেণীর সহিত তুলনা করিতে পারি। পণ্ডিত-সমাজের আদৃত জ্ঞানগঙ্গা, ভক্তসমাজের আকাঙ্ক্ষিত ভক্তি-যমুনা এবং বিদ্বান্-বাঞ্ছিত কবিত্ব-সরস্বতী এই পুণ্যক্ষেত্রে সম্মানিত হইয়াছেন। প্রথম প্রবাহের তীরে শাণ্ডিল্য গোত্রোদ্ভব ঘটকরাজ দেবীবর; দ্বিতীয় প্রবাহের তীরে মোসলেম বংশজ সাধক হরিদাস, আর তৃতীয় প্রবাহের তীরে ভরদ্বাজ গোত্রজাত আমাদের পূজনীয় মহাকবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত দণ্ডায়মান হইয়া এই "গ্রামরত্ন ফুলিয়া"কে চিরস্মরণীয়, ত্রিধারার মিলিত ক্ষেত্র ত্রিবেণীরূপে

বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। আমরাও এই পুণ্যভূমিকে প্রণাম করিয়া এবং ত্রিবেণীর তীর্থদেবতাদিগের চরণ বন্দনা করিয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতেছি।

আমাদের এই পূজনীয় কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত কোন্ বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনিও লেখেন নাই, অপরেও লেখে নাই। তবে আমাদিগের সৌভাগ্যবশতঃ কবি এইমাত্র লিখিয়াছেন যে,—

"আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥"

কৃত্তিবাস-স্মৃতি-স্তম্ভের প্রস্তরফলকে যে বিদেশী অব্দ কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ বলিয়া ক্ষোদিত হইয়াছে, দুঃখের বিষয় ঐ বৎসর "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস" এই যোগ ঘটে নাই। শকাব্দ ১৩৫৪, বঙ্গাব্দ ৮৩৯ এবং খ্রীষ্টাব্দ ১৪৩৩, ২৯শে মাঘ রবিবারে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কবির লিখিত বিষয় সম্পূর্ণ মিলন হয়।

আমরা আজ যে মহাকবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার জন্মভূমির পবিত্র প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছি, সেই মহাকবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের বিখ্যাত মুখোপাধ্যায়-বংশ। পঞ্চগৌড়েশ্বর মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ঋষিপ্রতিম যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন, ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষ তাঁহাদেরই অন্যতম। কবি কৃত্তিবাস এই শ্রীহর্ষের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই বিখ্যাত বংশকে উজ্জ্বল ও স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহর্ষ হইতে ১৭শ পুরুষ নৃসিংহ ওঝা। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে দেবানুজ রাজার সভাসদ্ ছিলেন। পরে তথা হইতে পতিতপাবনী সুরধুনীর তীরে এই ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। নৃসিংহ ওঝার পুত্র গর্ভেশ্বর, গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি। মুরারির আট পুত্র। তন্মধ্যে মদন ও বনমালীর বংশেই বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই বিখ্যাত কবি জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদিগের সাহিত্যের সৌন্দর্য্যসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি কৃত্তিবাসের পিতা বনমালীর সহোদর মদনের পুত্র রাঘব, তৎপুত্র দেবানন্দ, তৎপুত্র প্রয়াগ, তৎপুত্র জগদীশ, তৎপুত্র গোপাল, তৎপুত্র রামনারায়ণ, তৎপুত্র রমাকান্ত, তৎপুত্র নরেন্দ্র রায়, তৎপুত্র বিখ্যাত "অন্নদামঙ্গল" রচয়িতা কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। যে বিখ্যাত বংশে কবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কবি ভারতচন্দ্রও সেই বিখ্যাত বংশেরই সন্তান। পূর্ব্বকালে যে মহাবংশের কৃতী পুত্র কৃত্তিবাস পণ্ডিত গৌড়েশ্বরের আদেশে "রামায়ণ" রচনা করিয়া রাজকবির সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে সেই মুখবংশেরই আর এক কৃতী সন্তান নবদ্বীপাধিপতি

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে "অন্নদামঙ্গল" রচনা করিয়া রাজকবির সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। উভয়েই অতুল যশঃ-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া বঙ্গে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" হইতে প্রকাশিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ" পাঠ করিয়া আমরা একটি নূতন সংবাদ এই পাইলাম যে, কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের আর এক সহোদর শ্রীকর বা শ্রীধরও কবি ছিলেন এবং তিনিও এই আঙিনায় বসিয়াই বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন! এই অপ্রকাশিত গ্রন্থের নাম "সীতার দশ মাস।" এই গ্রন্থের ভণিতায় লিখিত হইয়াছে :—

"দশ মাসের দশ ঘোষা লওরে গণিয়া।
এই গীত জোড়াইছে শ্রীধর বাণিয়া॥
শ্রীধর বাণিয়া হয়, মুরারি ওঝার নাতি।
রাধণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিলা রঘুপতি॥"

এই শ্রীধর "মুরারি ওঝার নাতি" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করায় বোধ হইতেছে, ইনিও মুরারি ওঝার পৌত্র, বনমালীর পুত্র এবং মহাকবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতেরই সহোদর। কেন না রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাস পণ্ডিতও "মুরারি ওঝার নাতি।"

এই অনুমানের আরও পোষক প্রমাণ এই যে, কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে আত্মবিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই—

"মাতার পবিত্র যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে আনন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি, মাধব, সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীকর, ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র, চতুর্ভুজ, নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই-উদর॥"

"সতাই" অর্থাৎ বিমাতা সরল ভাষায় যাহাকে সৎমা বলে। মহাকবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বিমাতা ছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে বনমালীর পুত্র কন্যাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই জন্যই পণ্ডিত কৃত্তিবাস "ছয় সহোদর" বলিয়া আট ভ্রাতার

নাম লিখিয়াছিলেন। কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের আত্মবিবরণে বনমালীর যে আট পুত্রের নাম প্রাপ্ত হই, তাহা এই :—

১ম কৃত্তিবাস, ২য় মৃত্যুঞ্জয়, ৩য় শান্তি, ৪র্থ মাধব, ৫ম শ্রীকর, ৬ষ্ঠ বলভদ্র, ৭ম চতুর্ভুজ, ৮ম ভাস্কর। স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা" ৪র্থ ভাগ ২ সংখ্যায় বনমালীর পুত্রগণের যে নামের তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে "শ্রীকর" নাম নাই; কিন্তু "শ্রীকণ্ঠ" নাম আছে। এ নাম কিন্তু কৃত্তিবাস লেখেন নাই। পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত "সীতার দশ মাস" পুঁথির লেখক "শ্রীধর," এ নাম কৃত্তিবাস ও প্রফুল্ল বাবু কেহই লেখেন নাই। অথচ "শ্রীধর" আপনাকে "মুরারি ওঝার নাতি" বলিয়া পরিচিত করিতেছেন! এই কারণে বোধ হয় কৃত্তিবাস-কথিত শ্রীকর ও প্রফুল্ল বাবুর লিখিত "শ্রীকণ্ঠ" এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের পুঁথিলিপিকরের লিখিত "শ্রীধর" একই ব্যক্তি। লিপিকরের অসাবধানতায় শ্রীকর কোথাও শ্রীকণ্ঠ কোথাও বা শ্রীধররূপে লিখিত হইয়াছে। সেকালের "আকুড়ে ক" এবং "কাঁধেবেড়ী ধ" কতকটা একই রকমের, সুতরাং শ্রীকর শ্রীধররূপে পঠিত হওয়া বা শ্রীধর শ্রীকররূপে লিখিত হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান হওয়া উচিত। বাস্তবিকই যদি শ্রীকর বা শ্রীধর "সীতার দশ মাস" রচয়িতা হ'ন, তাহা হইলে কে জানে যে তাঁহার রচিত আরও কোন গ্রন্থ আছে কি না?. সম্ভবতঃ থাকিতেও পারে। না থাকিলেও এখন আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা লইয়াই বলিতে পারি যে, সেই সুদূর অতীতে এই সাহিত্য-তীর্থের প্রাঙ্গণে বসিয়া কেবল মহাকবি কৃত্তিবাস নহেন, তাঁহার সহোদর ভ্রাতাও বাগ্দেবীর সেবা করিয়া গিয়াছেন!

আমরা কবি-লিখিত "আত্ম-বিবরণ" হইতে জানিতে পারি, তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় গমন করিয়াছিলেন, এবং গৌড়েশ্বরকে স্বরচিত পাঁচটি শ্লোক উপহার দিয়াছিলেন। কিন্তু কবি তাহার পুরস্কার স্বরূপ একমাত্র আত্মগৌরব ব্যতীত অন্য কোন ধনরত্নের প্রত্যাশী ছিলেন না। কবি লিখিয়াছেন,—

"কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥"

গৌড়েশ্বর এই নির্লোভ, তেজস্বী ও প্রতিভাবান "ফুলিয়ার পণ্ডিত" কৃত্তি-বাসের কবিতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কবি লিখিয়াছেন, কৃত্তিবাসের কবিত্বমুগ্ধ গৌড়েশ্বর "রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ।" কবিও গৌড়েশ্বরের আজ্ঞায় "রামায়ণ" রচনা করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের এই রামায়ণ আদিকবি

বাল্মীকির অবিকল অনুবাদ নহে। বাল্মীকিকে অবলম্বন করিয়া দেশ কালের অনুরূপ ও সমাজের উপযোগী এক অভিনব রামায়ণ, কবি কৃত্তিবাস কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। ভক্ত কৃত্তিবাস সমাজের সম্মুখে যে অভিনব উপহার উপস্থিত করিয়াছিলেন, সমাজ কৃতজ্ঞচিত্তে ভক্তিভরে ও আগ্রহ সহকারে দেবনির্ম্মাল্যের মত তাহা মস্তকে ধারণ করিয়াছিল। বাঙ্গালায় বাল্মীকির অপেক্ষা কৃত্তিবাসের আদর বাড়িয়া গেল। তাঁহার ভাষা-রামায়ণ গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে গীত হইতে লাগিল—গৃহে গৃহে পঠিত হইতে লাগিল। ফলে এই বাঙ্গালা দেশে "রামায়ণ" বলিতে কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণকেই সকলে বুঝিতে আরম্ভ করিল, বাল্মীকিকে ভুলিয়া গেল। এরূপ প্রতিষ্ঠা সকলের ভাগ্যে হয় না! পূর্ব্বে সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য কথকতার সৃষ্টি হইয়াছিল। কথকদিগের পৌরাণিক উপাখ্যানাদির ব্যাখ্যা-বিবৃতিতে বাঙ্গালার নরনারী ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হইবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিল এবং উহা সুকণ্ঠ গায়কগণ কর্তৃক গীত হইয়া সমাজ মধ্যে একটা নূতন ভাবের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। এই নূতন ভাবের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণ ধর্ম্মের কথা রামচরিতের পুণ্য কাহিনী প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করিতে লাগিল। সতীশিরোমণি সীতার পুণ্যোজ্জ্বল চিত্র, পিতৃভক্ত লোকোত্তর-চরিত শ্রীরামচন্দ্রের গৌরব-রঞ্জিত মূর্ত্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃবৎসলতা ও সেবাধর্ম্ম, ত্যাগী ভরতের ব্রহ্মচর্য্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্মৃতিপূজায় আত্মনিয়োগ, ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয় প্রভৃতি মহান্ ও উচ্চ আদর্শের মনোজ্ঞ চিত্র, কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতই বাঙ্গালার সমাজে সরল ও শোভাশালিনী প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় প্রকাশ করিয়া লোকশিক্ষার পন্থা সুগম করিয়া গিয়াছেন। তাই, প্রকৃত পক্ষে জানিতে হইলে ইহা বলা অসঙ্গত হয় না যে, কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত কেবল কবি বলিয়াই সমাজে বরণীয় নহেন, লোকশিক্ষায়, সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব-প্রচারে, তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া সকলেরই নমস্য।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ যখন সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিল, তখন শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় আপন আপন সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক নূতন নূতন রচনা রামায়ণের মধ্যে সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন, অনেকে এইরূপই অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী রায় বাহাদুর শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধনে নানারূপ সাহায্য করিয়াছে।

বৈষ্ণবগণ রাক্ষসদিগের দ্বারা শ্রীরামের স্তব গান করাইয়াছেন, খেদ মিটাইতে শাক্তগণ শ্রীরামকে দিয়া চণ্ডীপূজা করাইয়াছেন; এই দুই দলের চেষ্টায় মূল অনুবাদ বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে।" দীনেশ বাবুর এই উক্তির আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের ফলে কোন কোন স্থলে দু'দশ পঙ্ক্তির পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিলেও, একেবারে এক একটা অধ্যায় নূতন সংযোজিত হইতে পারে, তাহা বোধ হয় না। আর যদি তাহাই সম্ভবপর হয়, তবে তাহা কি কেবল পশ্চিম বঙ্গেই হইয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গে হয় নাই? কারণ দীনেশ বাবুর মতে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারিত পুঁথি অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে প্রচারিত পুঁথিতেই এইরূপ নূতন নূতন বিষয়ের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় দীনেশ বাবুর এরূপ অনুমান সঙ্গত হয় নাই। যদি শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের ফলে, কৃত্তিবাসের রচনায় এইরূপে অন্যের রচনা সংযুক্ত হইত, তাহা হইলে উভয় বঙ্গের পুঁথিতেই তাহা দেখা যাইত। কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল পশ্চিম বঙ্গের পুঁথিতে এইরূপ নূতন নূতন বিষয় সংযুক্ত হওয়ার কারণ এইরূপই বোধ হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গে পুঁথি প্রচারের পর কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত নিজেই ক্রমে ক্রমে এইরূপ নূতন নূতন রচনা পূর্ব্ব লিখিত রামায়ণের অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যেমন রাজ-আজ্ঞায় রামায়ণ রচনা করেন, পরে সেইরূপ রামায়ণ গায়কদিগের অভিপ্রায় ও প্রার্থনা অনুসারে এই সকল নূতন নূতন রচনা তিনিই তাঁহার রামায়ণে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। সমাজের প্রকৃতি বুঝিয়া লোক-রঞ্জনের জন্য গায়কেরা কবির কাছে যেরূপ বর্ণনা চাহিতেন, কবি নিজেই সেইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া, অর্থাৎ "রাক্ষসদিগের দ্বারা শ্রীরামের স্তব করাইয়া" অথবা "খেদ মিটাইতে শ্রীরামকে দিয়া চণ্ডীপূজা" করাইয়া রামায়ণের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। নতুবা যদি অপর কোন শাক্ত বা বৈষ্ণবের দ্বারা এইরূপ পরিবর্ত্তন হইত, তাহা হইলে সে পরিবর্ত্তন পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গেও দেখিতে পাইতাম। পশ্চিম বঙ্গের অর্থাৎ কবির বাসস্থান "গ্রামরত্ন ফুলিয়া"র নিকটবর্ত্তী স্থানের পুঁথিতে এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ হইতেই আমাদের অনুমানের সত্যতা সপ্রমাণ হয়।

আজকাল অনেকেরই বিশ্বাস, "ফুলিয়ার পণ্ডিত" কবি কৃত্তিবাস রাজ-আজ্ঞায় যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, আমরা এখন ঠিক সেই রামায়ণ অর্থাৎ মহাকবির খাঁটি রচনা প্রাপ্ত হই নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যখন ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার এই রামায়ণের অনেক-

পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসের বশেই অনেকে মৃত পণ্ডিত মহাশয়ের উপর অযথা কটূক্তি করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আমাদের বিবেচনায়, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্লেষ বিদ্রূপের ভাষা প্রয়োগ করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ যখন স্বর্গীয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না যে, কৃত্তিবাসকে খর্ব্ব করিয়া, কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিমন্দিরে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কৃত্তিবাসকে রক্ষা করা—কৃত্তিবাসেরই প্রতিষ্ঠা করা। এই সাধু উদ্দেশ্য লইয়া তিনি যখন মূর্খ নকলনবিশদিগের লিখিত পুঁথির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন দেখিলেন, তাহাতে রাশি রাশি ভুল। তিনি সেই ভুল সংশোধন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, আপনাকে প্রচার করিতে যত্ন করেন নাই। সে সময়ে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য।

পণ্ডিত শ্রীযুত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, "শ্রীরামপুরের সুনামখ্যাত পাদ্রি অধ্যাপক কেরি সাহেবের অনুরোধে স্বর্গীয় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাষা অনেকস্থলে পরিবর্ত্তন করিয়া সরল বাঙ্গালা ভাষায় তাহার ভাব ব্যক্ত করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সুপণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। * * * অধুনা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাভূষণের সংস্করণই প্রচলিত। বটতলার সংস্করণ সেই সংশোধিত সংস্করণেরই অনুলিপি।" এই ভূমিকার পর "অধ্যাপক কেরি ও ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাভূষণ" মহাশয়দ্বয়ের চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য, কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রচার উদ্দেশ্যে মূর্খ নকলনবিশদিগের লেখার উপর কলম চালাইয়াছিলেন কে, ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কি ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাভূষণ? আমাদের বিবেচনায় এই উভয় পণ্ডিতের দ্বারাই এই সংশোধন কার্য্য হইয়াছিল। ১৮০২ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুর হইতে যে রামায়ণ বাহির হয়, তাহা ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাভূষণের সংশোধিত, তারপর অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইলে বটতলা হইতে যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহা শ্রীরামপুরের ঐ সংশোধিত সংস্করণেরই পুনঃ সংশোধিত সংস্করণ। এবার সংশোধন করেন ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। সুতরাং কৃত্তিবাসের প্রচার জন্য, আজ এই কৃত্তিবাসের আঙিনায় দাঁড়াইয়া উভয় পণ্ডিতকেই অভিবাদন করিতেছি।

কেহ কেহ কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতকে রামোপাসক বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন। আমরা কিন্তু এরূপ যুক্তিহীন উক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ করি না, এবং মহাকবি ফুলিয়ার পণ্ডিতকে রামোপাসক বলিয়া বিশ্বাস করি না।

কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত হিন্দু ও ব্রাহ্মণ ছিলেন, বিদ্বান ও কবি ছিলেন, ধার্ম্মিক ও ভক্ত ছিলেন, ইহাই তাঁহার পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি কোন্ মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন, অথবা আদৌ তিনি মূর্ত্তিপূজা করিতেন কি না, এ কথা কল্পনা-বলে আবিষ্কার করিতে যাওয়া, আমাদিগের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চাও বটে, ধৃষ্টতার পরিচয়ও বটে! সাধারণ হিন্দুই পঞ্চোপাসকের একতম শ্রেণীভুক্ত। কৃত্তিবাসও হিন্দু, সুতরাং তিনি এই পাঁচ শ্রেণীর যে কোন এক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তিনি শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব অথবা গাণপত্য যাহাই থাকুন, তাহা লইয়া মস্তিষ্ক-সঞ্চালনের অবসর উপযোগী প্রমাণ কিছুই নাই। বিনা প্রমাণে কোন মত প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। তাসের ঘর যত বড় প্রতিভা-বানের হস্তনির্ম্মিতই হউক, ফুৎকারেই পড়িয়া যায়। কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত—স্বেচ্ছায় নহে,—"রাজাজ্ঞায়" রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া যদি তাঁহাকে রামোপাসক বলিতে হয়, তাহা হইলে অপরের ইচ্ছায় নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় যে মহাকবি "বৃত্রসংহার" রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে কি ইন্দ্রোপাসক বলিতে হইবে? বোধ হয় এরূপ হাস্যাস্পদ যুক্তির উপর কেহই নির্ভর করিবেন না। বরং কৃত্তিবাস পণ্ডিতকে শক্তি-উপাসক বলিয়া বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সে কারণ এই। আমাদের এই মহাকবি কৃত্তিবাস রচিত আর একখানি পুঁথি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই পুঁথির নাম "শিবরামের যুদ্ধ।" এই পুঁথির নামেই বর্ণনীয় বিষয়ের পরিচয় পরিস্ফুট। এই শিবরামের যুদ্ধে দেবী ভগবতীকে মধ্যস্থা হইয়া শিবরামের বিবাদ মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। ইহাতেই বোধ হয়, কবি বৈষ্ণবও ছিলেন না শৈবও ছিলেন না, তিনি ছিলেন শাক্ত অর্থাৎ শক্তি-উপাসক। যদি তিনি "রামোপাসক" হইতেন, তাহা হইলে স্বীয় ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রকে অবশ্যই শিব অপেক্ষা বড় করিতেন এবং এই যুদ্ধে শিবকে শ্রীরামের নিকট পরাজয় স্বীকার করাইতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি উভয়কেই সমান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বিবাদ-নিবৃত্তির জন্য আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীর সাহায্য লইয়াছেন। তিনি যে শক্তি-উপাসক ছিলেন, ইহাই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। তথাপি আমরা তাঁহাকে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে চাহি না। তিনি হিন্দু ছিলেন. হিন্দুর উপাস্য দেবতাই তাঁহার উপাস্য দেবতা ছিল, বর্ত্তমান সময়ে ইহাই তাঁহার ধর্ম্মপরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

সমাধি।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

লেখক—শ্রীরাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বা সর্ব্বার্থতা পরিত্যক্ত হইলে, বা তিরোহিত হইলে, একাগ্রতা ধর্ম্মটীর উদয় হয়। ইহাকে চিত্তের সমাধি পরিণাম বলিয়া অভিহিত করা হয়। এইটী সমাধির আরম্ভ। ইহা ক্রমে স্থিরতা লাভ করিয়া কিয়ৎকাল স্থায়ী হইলেই চিত্তের একাগ্রতা পরিণাম উপচিত হয়। তৎপর পরবৈরাগ্যোদয়ে চিত্তের একাগ্রতা পরিণাম ক্ষীণ হইয়া নিরোধ সংস্কার আহিত হইলে, চিত্তের নিরোধ পরিণাম সঞ্জাত হয়। ইহাই প্রকৃত সমাধি—নিরোধ সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। এই সময়ে চিত্তের সর্ব্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। চিত্তের নিদ্রা বৃত্তিটিও তখন নিরুদ্ধ। তখন দ্রষ্টার (যোগীর আত্মার) স্বরূপে অবস্থানম্: অন্যথা, অন্য সময়ে পুরুষের (আত্মার) চিত্তবৃত্তিসহ একরূপতা হয়: বৃত্তি সারূপ্যমিতরত্র। আত্মা তখন মনোময়। চিত্তে যে বৃত্তি উদিত হয়, আত্মাও তখন তন্ময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" বলিয়া শ্রুতি তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন। চিত্তে সুখবৃত্তি উদিত হইল, পুরুষ মনে করিলেন আমি সুখী। দুঃখবৃত্তি উদিত হইল, পুরুষ মনে করিলেন আমি দুঃখী। কাজেই পুরুষের সুদৃঢ় নিগড়স্বরূপ এই মনোবন্ধনই প্রকৃত বন্ধন। পুরুষ বা আত্মাকে ইহা হইতে উদ্ধার করিলে, মন বা চিত্তকে সমূলে উৎপাটিত করাই মুমুক্ষুর প্রধান কর্ত্তব্য। তাই পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে মনোনাশই মোক্ষ। যোগাচার্য্যগণ সেই মনোনাশের যে ক্রমনির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারই নাম যোগমার্গ বা যোগপথ। তাহা ক্রম পরম্পরায় বিধিপুর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে, একাগ্রতাভূমি হইতে চরম নিরোধভূমিতে আরোহণ করিয়া, যোগী মোক্ষধামে উপনীত হন। অতএব দেখা যায় সমাধির স্বরূপ হচ্চে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থিত। সমাধির উদ্দেশ্য দুঃখনিবৃত্তি। সমাধির ফল মোক্ষ। তাহার সাধন অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

মুখ্য সমাধির কিঞ্চিৎ আভাসপ্রদও হইল। তাহার উদ্দেশ্য এবং ফলও কিয়ৎ পরিমাণে বিবৃত হইয়াছে। সূক্ষ্ম বিষয়ের বোধসৌকর্য্যার্থে পুনঃ পুনঃ

উল্লেখের প্রয়োজন। তাই মধ্যে মধ্যে পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। এখন সাধন সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

সাধন না থাকিলে সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সমাধির সাধন অভ্যাস ও বৈরাগ্য। অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। ভগবান্ পতঞ্জলি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন— অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তিনিরোধ নামক সমাধি উৎপন্ন হয়। সমাধিতে মন চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরতা লাভ করে। মনঃস্থৈর্য্যের স্বরূপ বিচার করা প্রয়োজন। মন যে নিরতিশয় চঞ্চল তাহা ব্যাখ্যা করা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে—বায়োরিব সুদুষ্করম্॥
ভগবদ্গীতা। ৬ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক।

যে অর্জ্জুন স্বর্গধামে ইন্দ্রপ্রেরিত উর্বশীকে নির্জ্জন নিশীথে হেলায় উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়জয়ের সামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর মিতাচারী বিক্ষোভ বিরহিত মহাধীর মধ্যম পাণ্ডবও মনোনিগ্রহের সুদুষ্করতা অনুভব করিয়াছিলেন। এবং তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। ভগবান্ প্রত্যুত্তরে অর্জ্জুনের বাক্য অনুমোদন করিয়া বলিয়াছিলেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেনচ কৌন্তেয় বৈরাগ্যেনচ গৃহ্যতে॥
ভঃ ৬ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক।

মহাযোগী, মহাজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণও মনোনিগ্রহ বা নিরোধ যে অতি সুকঠিন তাহা বলিয়া গিয়াছেন, এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য ব্যতীত মন যে নিগৃহীত হয় না তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। উপরি উক্ত শ্লোকই তাহার সপষ্ট প্রমাণ।

বিষয়টী বড়ই গুরুতর। যদি দুঃখক্ষয় করিতে চাও যদি অভয়পদ লাভ করিতে চাও, ভীষণ সংসার দহন হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাও, যদি পরম তৃপ্তি সাগরে অবগাহন করিতে চাও, মনোনিরোধ করিতে হইবে, নতুবা অন্য উপায় নাই। অর্জ্জুনের কথা শুনিয়াছ। তিনি বলিয়াছেন বায়ুকে নিগ্রহ করাও যেরূপ সুকঠিন, মনের নিগ্রহও তদ্রূপ। ভগবান্ গৌড় পাদাচার্য্য ও তার স্বরে জগতে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন—

মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্ব্বযোগিনাম্।
দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিরেবচ॥
মাণ্ডুক্যকারিকা, অদ্বৈত প্রকরণম্, ৪০ শ্লোকঃ।

ভাবার্থ—অভয়, দুঃখক্ষয়ঃ, তত্ত্ববোধ, অক্ষয়া শান্তি—সমস্তই মনোনিরোধ সাপেক্ষ। কিন্তু যোগপথে সেই মনোনিগ্রহ কত দুষ্কর, তাহাও তিনি বলিতেছেন—

উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদ পরিখেদতঃ॥

মাঃ কাঃ অদ্বৈত প্রকরণম্, ৪১ শ্লোকঃ।

ভাবার্থ—কুশাগ্র ভিজাইয়া একবিন্দু করিয়া জল তুলিতে তুলিতে সমুদ্রের জলরাশি উত্তোলিত করতঃ তাহা নিঃশেষিত করিতে যেরূপ ধৈর্য্যের প্রয়োজন যোগপথে মনোনিগ্রহেও সেইরূপ অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের আবশ্যক।

উক্তরূপ ধৈর্য্যে রত প্রয়োজনই, অন্যান্য উপায়ও অবলম্বনীয়। তাহা আচার্য্য দেব পরবর্ত্তী শ্লোকনিচয়ে পরিস্ফুট করিয়াছেন। নিরোধ যদি অতি সুলভই হইত, তবে পথে ঘাটে মুক্তপুরুষ কিংবা সিদ্ধ মহাত্মা পরিদৃষ্ট হইত। ধর্ম্মোম্মদনায়, পূর্ব্বাপর বিচারহীন সরলবিশ্বাসী কত লোক, যোগসিদ্ধ মহাপুরুষদের অলৌকিক ক্ষমতার কিংবাদন্তী অবলম্বন করিয়া, অস্থানে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ, কত সময়ে প্রবঞ্চিত ও দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? বিষয়টীর গুরুত্ববোধ থাকিলেও আত্ম প্রতারণার অবকাশ থাকে না।

এখন জিজ্ঞাস্য—মনের এই চাঞ্চল্য কেন উৎপন্ন হয়? যোগাচার্য্যগণ বলেন—চলং গুণবৃত্তম্। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক। কাজেই চিত্তও অপরিণত ভাবে ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। একাগ্রতা পরিণাম, সমাধি পরিণাম ও নিরোধ পরিণাম ব্যাখ্যাকালে চিত্তের এই স্বভাব যোগাচার্য্যগণ পরিস্ফুট ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বিশেষাকাঙ্ক্ষিৎসু পাঠকগণ তাহা যোগগ্রন্থে অনুসন্ধান করিবেন। আমরা কেবল চিত্তের বিক্ষেপ কারণ বলিব।

বাসনাই চিত্তবিক্ষেপের প্রধান কারণ। বাসনা চিত্তকে বিক্ষোভিত করিয়া থাকে। এই বাসনা হইতে রাগ দ্বেষ উৎপন্ন হইয়া জীবকে বিষম সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া দেয়। এই বাসনা যেমন ক্ষীণ হইতে থাকে, চিত্তও সেই পরিমাণে স্থিরতা অবলম্বন করিয়া থাকে। বাসনা রাশি পরিক্ষীণ হওয়ায় নামই বৈরাগ্য। চিত্তের চাঞ্চল্যনাশ হইলে সমাধিলাভের অন্তরায় দূরীভূত হইয়া যায়। অভ্যাস দ্বারা বিবেকস্রোতঃ উদ্‌ঘাটিত এবং বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমে চিত্তের বিষয় প্রবণতা পরিক্ষীণ হয়। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যরূপ পাথেয় গ্রহণ করিয়া যোগিগণ দুর্গম যোগমার্গ অতিক্রম করতঃ সমাধিধামে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

বৈরাগ্যলাভ বহুপুণ্য সাপেক্ষ। বৈরাগ্য আর বিরক্তি এক নহে। সামর্থ্য হীনতাজনিত দরিদ্রের বিষয়বৈতৃষ্ণ্য, সৌভাগ্যবলে ভোগসমাযোগে, সূর্য্যোদয়ে কুহেলিকানাশের ন্যায়, অতি সহজেই অপসারিত হইয়া যায়। এরূপ বিষয় বৈতৃষ্ণ্যকে বৈরাগ্যনামে অভিহিত করা যাইতে পারে না। অথবা ভোগে আকণ্ঠ নিমগ্ন ভোগীর সাময়িক অতি তৃপ্তিজনিত বিষয়বিরতি ও বৈরাগ্য-পদ-বাচ্য নহে। বৈরাগ্য তবে কি? যোগপথে কিরূপ বৈরাগ্যের প্রয়োজন? যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিধ বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে। যথা যতমান-সংজ্ঞা, ব্যতিরেক-সংজ্ঞা, একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা, বশীকার-সংজ্ঞা। এই চারিটীকে অপর বৈরাগ্য বলা হয়। আর একটীর নাম পরবৈরাগ্য। পরবৈরাগ্যের কথা জ্ঞান প্রকরণে বলিবার ইচ্ছা রহিল। অপর বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠস্তরে আরোহণ করিতে না পারিলে, সমাধি লাভের আশা সুদূর পরাহত। যোগশাস্ত্রে বর্ণিত সমাধি-সাধন বৈরাগ্য সম্বন্ধীয় সূত্রটী নিম্নে উল্লিখিত হইল—

দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।

পাঃ দঃ সমাধিপাদ ১৫ সূত্র।

ভাবার্থ—স্ত্রী, অন্নপান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লৌকিক বিষয়ে অথবা স্বর্গ বৈদেহ্য প্রভৃতি অলৌকিক বিষয়ে বাসনা রহিত চিত্তে, তত্তৎ ভোগাদি সমুপস্থিত হইলেও, সে হেয়োপাদেয় শূন্য উপেক্ষা সমুদ্রিত হয়, তাহার নাম বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্য।

ভোগ্যবস্তু সমুপস্থিত হইলে, তাহা ভোগ করিবার জন্য, বৈরাগ্যহীন চিত্তে যে লোলতা সঞ্জাত হয়, তাহাই সুখ দুঃখের মূল। বাসনাবৃক্ষে সুখ দুঃখরূপ দু'টী ফল উৎপন্ন হয়। বাসনার প্রবর্দ্ধিত রূপই এই লোলতার স্বরূপ। বাসনা পরিতৃপ্ত হইলেই সুখ, আর তাহা না হইলেই দুঃখ। সুখ হইতে রাগ বা আসক্তি, দুঃখ হইতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। একবার ভোগ সঞ্জাত সুখই, চিত্তকে পুনরায় স্মৃতি সহযোগে বিষয়-ধ্যানে, আহরণে ও পুনর্ভোগে উন্মুখ করিয়া তোলে। তখন ভোগের অনধিগমে চিত্ত পুটপাকে দগ্ধ হইতে থাকে, ভোগ আহরণে অবর্ণনীয় ক্লেশ রাশি সহ্য করে, এবং দেহপাত হইলেও চিত্ত নবীন ভাবে, নবদেহ ধারণ করিয়া, পুনরায় বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে। সুনিপুণ ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় সুখ দুঃখেরই বীজস্বরূপ। জীব ঘুরিতে ঘুরিতে বিষয়াবর্ত্তে উত্থিত নিমজ্জিত হইয়া, সুখ দুঃখে আলোড়িত বিক্ষোভিত হয়; কদাচিৎ কাহারও বহু পুণ্য পরিপাকে মনে বিচার সম্ভূত বিষয়ে দোষদৃষ্টি

সমুদ্ভূত হয়। এই দোষদৃষ্টি হইতেই বৈরাগ্য সঞ্জাত হয়। পরিণামে বিষয়ে বিষবৎ বোধ আসিয়া সমুদিত হয়। পঞ্চদশীকার বৈরাগ্যের হেতু স্বরূপাদি নির্ণয়কালে বলিয়াছেন—

দোষদৃষ্টির্জিহাসা চ পুনর্ভোগেম্বদীনতা।
অসাধারণ হেত্বাদ্যা বৈরাগ্যস্য ত্রয়োঽপামী॥

পঃ দঃ চিত্রদীপঃ, ২৭৮ শ্লোকঃ।

ভাবার্থ—বৈরাগ্যের হেতু (উৎপত্তি কারণ) বিষয়ে দোষদৃষ্টি; বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা বৈরাগ্যের স্বরূপ বা স্বভাব; পরিত্যক্ত বিষয়ে ভোগেচ্ছা-রাহিত্য বৈরাগ্যের কার্য্য।

বৈরাগ্যের পূর্ণতা ও পঞ্চদশীকার বিবৃত করিয়াছেন—

ব্রহ্মলোক তৃণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধির্মতঃ।

* * * *

ঐ ঐ ঐ ২৮৫ শ্লোকঃ।

ভাবার্থ—অশেষ সুখাকর ব্রহ্মলোক লাভেও যখন তৃণ-জ্ঞান হইবে, তখন বৈরাগ্য পূর্ণতা বা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে।

এই বৈরাগ্য পরিনিষ্ঠিত হইলেই উপরতি নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়। উপরতিই নিম্ন-স্তরে নিম্ন অঙ্গের সমাধি। ইহা হইতেই "ভবপ্রত্যয়" অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত আত্মবোধ না হইলে কিছুতেই নিরোধ সমাধি উৎপন্ন হইতে পারে না।

যাহা হউক, বৈরাগ্যকণা হৃদয়ে আহিত হইলেই জীব মহাভাগ বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে। সমাধি বলুন, মোক্ষ বলুন, কৃতকৃত্যতা বলুন, অমৃতত্বই বলুন, সকলেরই সোপান এই বৈরাগ্য! চিত্তে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেই, চিত্ত পরমাপ্যায়িত হয়। এই বৈরাগ্যকণা চিত্তে উদিত হইয়াছিল বলিয়াই, সুলভা নাম্নী বারবণিতাও আর্ষ-গ্রন্থে প্রশংসিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। ঋষি রত্নের আদর জানেন বলিয়াই হীন-স্থানস্থিত হইলেও উপেক্ষা না করিয়া স্বীয় শাস্ত্র পেটিকায় আবদ্ধ করতঃ জগৎকে দেখাইয়াছেন বৈরাগ্য কিরূপ মহার্ঘ ও পরমপাবন।

এক হিসাবে এই বৈরাগ্য যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন উৎকৃষ্ট সমাধি-লাভ করিতে অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না। ভগবৎপাদ সোঽহং স্বামী ও স্বীয় সোঽহং গীতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন—

বৈরাগ্য অনলে যার দগ্ধ চিত্তমল
অন্য সাধনের তার নাহি প্রয়োজন।
ত্যজি দেহেন্দ্রিয় আর বিষয় সকল
অনায়াসে আত্মসংস্থ হয় তার মন ॥
সোহংগীতা। যোগ।

যোগ।

যোগ কাহাকে বলে? মহর্ষি পাতঞ্জলি বলেন ;—যোগ-শ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ (অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি সমূহের নিরোধকে যোগ বলে।) সুতরাং চিত্ত কি, চিত্তের বৃত্তি কি, ও তাহার নিরোধই বা কি, তাহা জানা আবশ্যক। চিত্ত বা অন্তঃকরণের চারিটী ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে যথা মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। মনের দ্বারা সাধারণ জ্ঞান হয়, যাহা দ্বারা সেই জ্ঞান কোন এক বস্তুতে কেন্দ্রীভূত হয় তাহাকে চিত্ত বলা যায়। এই চিত্ত চিত্ত বা অন্তঃকরণের একটি স্তর যাহা দ্বারা ব্যক্তিগত জ্ঞান জীবাত্মার সহিত সম্বন্ধ করা যায় তাহাকে অহঙ্কার বলে এবং যাহা দ্বারা সংশয় পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের স্থিরতা স্থাপিত হয় তাহাকে বুদ্ধি বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত চারিটীর কোন না কোনটীর সাহায্যে অন্তঃকরণ কোন বস্তুকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করাকে চিত্তের বৃত্তি বলা যায়। সমস্ত জ্ঞানই চিত্তের বৃত্তি। আমাদের ইচ্ছাশক্তিও এইরূপ একটী বৃত্তি। অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল সকল সময়ে কোন না কোন বস্তু বা চিন্তার দিকে অল্প বিস্তর ধাবিত হয়। যখন অন্তঃকরণ কোন বস্তু বা চিন্তার দিকে না যাইয়া স্থির হইয়া থাকে তখনই যোগের অবস্থা হয়। এই যে অন্তঃকরণ ইহা জীবাত্মাও নয় পরমাত্মাও নয়, সুতরাং অন্তঃকরণের বৃত্তি নিরোধ বলিলে বুঝিতে হইবে না যে কিছুই থাকিল না। ইহা দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না। এই অন্তঃকরণের তিনটী গুণ আছে, সত্ত্ব, রজ, তম্ অর্থাৎ এই তিনটী গুণ অন্তঃকরণের প্রত্যেক স্তরের গুণ। সাত্ত্বিক মন চিত্ত অহঙ্কার বুদ্ধি, রাজসিক মন চিত্ত, অহঙ্কার বুদ্ধি এবং তামসিক মন চিত্ত অহঙ্কার বুদ্ধি। যাহাই বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মক তাহাই সাত্ত্বিক, যাহাই রঞ্জিত জ্ঞানাত্মক অথচ ক্রিয়াশীল তাহাই রাজসিক, যাহা জ্ঞানশূন্য তাহাই তামসিক। যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যখন তামসিক

ও তামসিক ভাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তখন চিত্ত বায়ুশূন্য স্থানের দীপের ন্যায় স্থিরভাবে থাকে। এইরূপ অবস্থায় জীবাত্মা সপ্রতিষ্ঠ হয় অর্থাৎ জীবাত্মা তাহার স্বরূপে অবস্থান করে। সাত্বিক অবস্থা হইলেই জীবাত্মা তাহার স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। এবং জীবাত্মার স্বরূপে অবস্থান হইলে পরমাত্মার সহিত তাহার মিলন হয়। এই মিলনকেই যোগ বলা হয় অর্থাৎ জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় যোগ। চিত্তবৃত্তি নিরোধেই এই যোগ বা মিলন হয় বলিয়াই উহাকে যোগ বলা যায়। চিত্তবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। ঐ চিত্তবৃত্তি পঞ্চপ্রকার ও ঐ পাঁচটীকেই ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। চিত্তবৃত্তি—পঞ্চ প্রকার প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। যথার্থ জ্ঞানকেই প্রমাণ বলা যায়। অর্থাৎ যাহাদ্বারা নিঃসন্দেহরূপে সত্য বা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া জানা যায় তাহাই প্রমাণ। এই প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমাণ ও আগমমূলক। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায়। পূর্বজ্ঞান হইতে যুক্তি দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাকে অনুমান মূলক জ্ঞান বলা যায়। প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত, বেদাদি আগম হইতে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি তাহাকেই আগমমূলক জ্ঞান বলা যায়। বিপর্য্যয় (অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান) যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রৌপ্য জ্ঞান। বিকল্প বলিতে কল্পনামাত্র বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ উহার কোন বস্তু নাই কেবল কথা মাত্র, যেমন শশক-শৃঙ্গ, অশ্ব-ডিম্ব। চিত্তের চতুর্থ বৃত্তি নিদ্রা—এখানে নিদ্রা বলিতে স্বপ্নশূন্য নিদ্রা বুঝিতে হইবে। যখন চিত্তের বৃত্তির কোন অবলম্বন থাকে না সেই অবস্থাকে নিদ্রা বলে। এ যোগের অবস্থা নহে। যোগ হইতে ইহা স্বতন্ত্র। সুষুপ্তি বা স্বপ্নশূন্য নিদ্রা চিত্তবৃত্তির একেবারে অভাব হয় না কারণ জাগরিত হইবা মাত্রই আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম এই জ্ঞান থাকাতেই বুঝা গেল যে সুষুপ্তির সময়ে জ্ঞানের অভাব হয় নাই। চিত্তের পঞ্চম বৃত্তি স্মৃতি—যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে উহা যাহা দ্বারা চিত্ত হইতে সরিয়া যায় না তাহাকেই স্মৃতি বলা যায়। এই যে চিত্তের পঞ্চবৃত্তি ইহা জাগরিত বা নিদ্রিত এ দুই অবস্থায় প্রযোজ্য। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইতে পারে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা অভ্যাস কাহাকে বলে? অর্থাৎ নিরোধ প্রাপ্তির জন্য যে প্রযত্ন আবশ্যক তাহাকেই অভ্যাস বলে। দীর্ঘকাল নিরন্তর তপস্যা ব্রহ্মবিদ্যার শ্রদ্ধা প্রভৃতি সম্পাদন করিলে চিত্তের দৃঢ় অবস্থা হয় তখন তাহার আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়। এই তপস্যা ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রযত্ন। আর ঐহিক পারলৌকিক বস্তু বিষয়ে

বিতৃষ্ণাই বৈরাগ্য। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা/যখন চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় তখনই বিশুদ্ধ সত্বগুণ উপস্থিত হয় তখন আর তম ও রজ বীজের অধিকার থাকে না। এই অবস্থা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় বিতর্ক বিচার আনন্দ ও অস্মিতা থাকে, অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় উহা থাকে না।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

কবিরাজ—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

আমি আনন্দের সহিত সকলকে জানাইতেছি যে নিম্নলিখিত ঔষধটী মহামারী প্লেগের মহৌষধ। আমি যে যে ক্ষেত্রে এই ঔষধটী প্রয়োগ করিয়াছি, সর্ব্বত্রই সফলতা লাভ করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ঔষধ ব্যবহার করিলে সকলেই আশানুরূপ ফল পাইবেন। ঔষধটী এই—

পূর্ণ বয়স্কের জন্য—

১। উৎকৃষ্ট মকরধ্বজ ১ রতি উত্তম মধুসহ মাড়িয়া কাঁচা হলুদের রসসহ সেবনীয়। প্রাতে, বৈকালে এবং রাত্রি দশটা ঔষধের সেবনকাল।

ছোট ছেলেদের জন্য এবং বৃদ্ধাদির জন্য রোগীর বলাবল বিচার করিয়া ঔষধের মাত্রা-ব্যবস্থা করণীয়।

২। ফণী মনসা গাছের ভিতরের শাঁস বাটিয়া অগ্নিতে গরমকরতঃ ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় গলার, কুচকীর, বগলের ও অন্যান্য ফোলা গ্রন্থির উপর প্রলেপ দিয়া ভালরূপে বাঁধিয়া দিবেন। ২। ৩ বার প্রলেপ ব্যবস্থা।

৩। পুরাতন গব্য ঘৃতসহ কর্পূর মিশাইয়া মস্তকে ও কপালে মালিস করিবেন।

৪। পিপাসায় বাইবিড়ঙ্গের সহ জল সিদ্ধ করিয়া উক্ত ঈষৎ উষ্ণ জল পান করিতে দিবেন।

কবিরাজ—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।
Specialist in Insanity
Malda, (Bengal)